সংকলন

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১

২০-২৬ জুলাই

নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ
বদলে দেব বাংলাদেশ

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সংকলন

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১

২০-২৬ জুলাই

নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ
বদলে দেব বাংলাদেশ

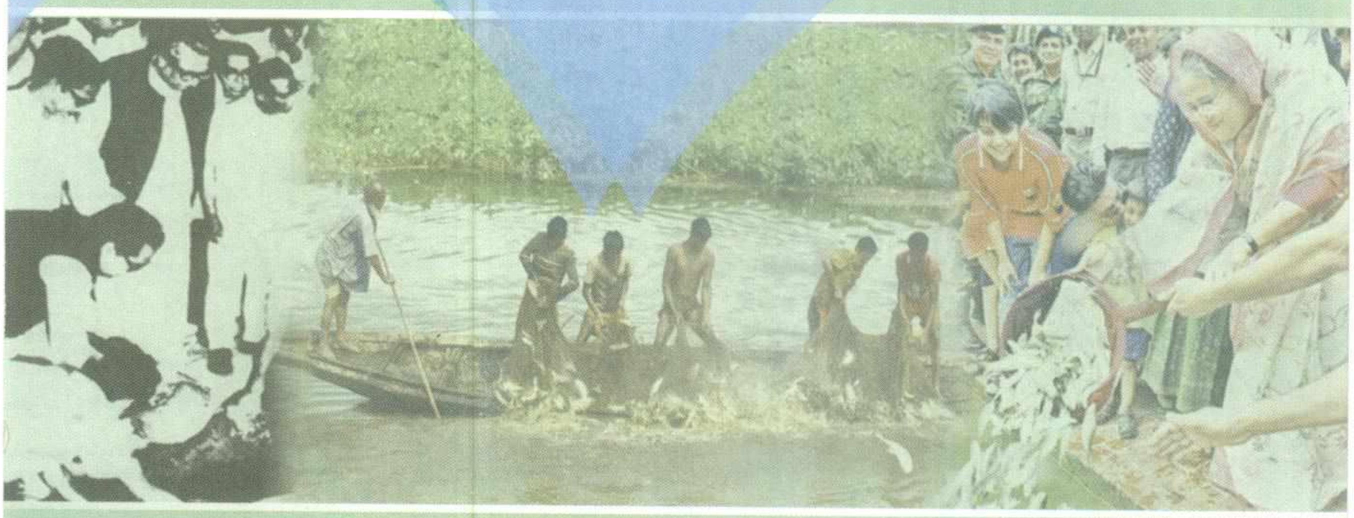

মাছ হবে দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

দৈনিক বাংলা, ৭ জুলাই ১৯৭২

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১
২০-২৬ জুলাই

সম্পাদনা পরিষদ

নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস, উপপরিচালক	সভাপতি
সৈয়দ আরিফ আজাদ, উপপরিচালক	সদস্য
মোহাম্মদ রেজাউল করিম, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
এ বি এম জাহিদ হাবিব, প্রকল্প পরিচালক	সদস্য
মোঃ আবুল হাশেম, প্রকল্প পরিচালক	সদস্য
ড. সৈয়দ আলী আজহার, সহকারী পরিচালক	সদস্য
মোঃ ইউসুফ খান, প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	সদস্য
মোঃ মজিবুর রহমান, সহকারী পরিচালক	সদস্য
এ কে এম লুৎফুর রহমান সিদ্দীক, সহকারী পরিচালক	সদস্য
ড. মোহাঃ সাইনার আলম, সহকারী পরিচালক	সদস্য
ড. আলী মুহাম্মদ ওমর ফারুক, সহকারী পরিচালক	সদস্য
ড. মোঃ আবু সাঈদ, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
মোঃ মুখলেসুর রহমান, উপসহকারী পরিচালক	সদস্য
কায়সার মুহাম্মদ মঈনুল হাসান, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
এম এম মাহবুব আলম, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
আয়েশা সিদ্দিকা, গবেষণা কর্মকর্তা	সদস্য
মোঃ আলমগীর কবীর, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
মোহাম্মদ শরিফুল আজম, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
মোহাম্মদ কামরুজ্জামান হোসাইন, মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	সদস্য
রমেশ চন্দ্র মণ্ডল, উপপ্রধান	সদস্যসচিব

প্রকাশনায়
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

প্রকাশকাল
জুলাই ২০১১

প্রচ্ছদ
সৈয়দ রাকীবুল মইন রুমী

প্রচার সংখ্যা
১০,০০০ (সৌজন্যমূলক বিতরণের জন্য)

মুদ্রণ
স্কেল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৯ পুরানা পল্টন (১ম তলা), ঢাকা-১০০০

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

০৫ শ্রাবণ ১৪১৮
২০ জুলাই ২০১১

বাণী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর উদ্যোগে 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। এ উপলক্ষে আমি দেশের সকল মৎস্যজীবীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের অবদান ও গুরুত্ব অপরিসীম। খাদ্য নিরাপত্তায়ও জলজ জীবসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেশের আপামর জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচনসহ রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও মৎস্য খাতের অবদান অনস্বীকার্য। দেশের মৎস্য সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন সাধন, সমন্বিত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উন্নততর পদ্ধতিতে পরিকল্পিত উপায়ে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। দেশীয় মৎস্য সম্পদ রক্ষায় মাছের অভয়ারণ্য সৃষ্টি, পোনা উৎপাদন ও সংরক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ বছরের প্রতিপাদ্য, 'নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বদলে দেব বাংলাদেশ' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সেই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে মৎস্যখাতের উন্নয়ন জরুরি বলে আমি মনে করি। আমি সম্ভাবনাময় এ খাতের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে অধিকতর দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ- ২০১১'এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জি. রহমান

মোঃ জিল্লুর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৫ শ্রাবণ ১৪১৮
২০ জুলাই ২০১১

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও দেশে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১১ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এ দিবস উপলক্ষে এ বছরের প্রতিপাদ্য 'নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বদলে দেব বাংলাদেশ' মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি।

প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় মাছ আবহমান বাঙালির সংস্কৃতির একটি অংশ। মাছ প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তাছাড়া মাছ শরীরের পুষ্টি যোগানের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় যা সুস্থ ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে অপরিহার্য।

প্রাকৃতিক জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, জলজ জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মৎস্যচাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। যুগোপযোগী, পরিবেশ-বান্ধব, বিজ্ঞান ভিত্তিক ও উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর মৎস্যচাষ পদ্ধতি অনুসরণ করে এর অপরিকল্পিত আহরণ বন্ধ ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১১ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

০৫ শ্রাবণ ১৪১৮
২০ জুলাই ২০১১

বাণী

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আত্মকর্মসংস্থান এবং আমিষের চাহিদা পূরণে এ খাত আবহমানকাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। উন্নত ও সহজপাচ্য আমিষ, অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড, ভিটামিন ও খনিজ লবণে সমৃদ্ধ হওয়ায় জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে ও সুস্থ জাতি গঠনে মাছ অত্যন্ত উপযোগী একটি খাদ্য। সে কারণে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা বিধান এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ মৎস্য খাতের সার্বিক উন্নয়ন সাধন জরুরি।

বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার মৎস্য খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির ভিত আরও মজবুত করার জন্য এ খাতের প্রবৃদ্ধি উত্তরোত্তর বাড়াতে হবে। এ জন্য ব্যাপক জনসচেতনতা ও জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহায়তায় মৎস্য অধিদপ্তর ২০-২৬ জুলাই, ২০১১ সপ্তাহব্যাপী **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১** উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১** এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ দেশের জলজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও অনুপ্রাণিত করবে বলে আমি আশা করি। পাশাপাশি এ কার্যক্রমসমূহ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়েও জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করবে বলে আমার বিশ্বাস।

এবারের মৎস্য সপ্তাহের শ্লোগান **'নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বদলে দেব বাংলাদেশ'**। এ শ্লোগানটি দেশের আপামর জনসাধারণকে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ক হবে। **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১** এর সকল প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হোক এ কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুল **লতিফ বিশ্বাস**, এমপি

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

০৫ শ্রাবণ ১৪১৮
২০ জুলাই ২০১১

বাণী

সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা আমাদের বাংলাদেশ মূলত নদীমাতৃক গাঙ্গেয় বদ্বীপ। আমাদের দক্ষিণে বিশাল বঙ্গোপসাগর, পদ্মা- মেঘনা-যমুনাসহ অসংখ্য নদ-নদী, হাওর-বাঁওড়, খাল-বিল, পুকুর-দীঘি ও বিচিত্র জলাশয়ে পরিপূর্ণ এ দেশ মৎস্যসম্পদের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার।

'মাছে-ভাতে বাঙালি' আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। দেশের প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৬০ ভাগ যোগান আসে মাছ থেকে। মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ৩.৭৪ শতাংশ মৎস্য উপ-খাতের অবদান। রপ্তানি আয়ের প্রায় ৩ শতাংশ আসে এ উপ-খাত থেকে। দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় ১০ শতাংশ এ খাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত একটি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ের ধারাবাহিকতায় মৎস্য খাতও বিজ্ঞান ও গবেষণায় নব নব প্রযুক্তিও উদ্ভাবনায় সমৃদ্ধ হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে উন্নত মাছের ব্রুড সংরক্ষণ, মৎস্য হ্যাচারি ও নার্সারিজাত দ্রুত বর্ধনশীল মাছের রেণু ও পোনা উৎপাদন আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। মৎস্য চাষের নব নব উদ্ভাবনা ও প্রযুক্তি স্থানান্তর কার্যক্রম তৃনমূল পর্যায়ের মৎস্যচাষি ও খামারিদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ফলে সারাদেশে মৎস্য উৎপাদন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গ্রামীণ দরিদ্র কৃষক ও মৎস্যচাষিগণ এর সুফল পেতে শুরু করেছেন। গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়নে তাই এ উপ-খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আমাদের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে অপার সম্ভাবনাময় মৎস্য উপ-খাতের সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বর্তমান সরকার বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

আমাদের দেশে বর্তমানে জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব, নগরায়ণ, শিল্পায়ন, মনুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ কারণে আমাদের জলাশয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে আসছে। কৃষিতে ক্ষতিকর কীটনাশকের যথেচ্ছ অপপ্রয়োগ ও কারখানার দূষিত বর্জে আমাদের প্রাকৃতিক ও মুক্ত জলাশয় ক্রমাগত দূষিত হচ্ছে। আর এ দূষণের অন্যতম শিকার হচ্ছে আমাদে মৎস্যসম্পদ।

এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় বর্ণিত প্রেক্ষাপটে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের এ বছরের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বদলে দেব বাংলাদেশ' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে সারা দেশ জুড়ে জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, যুবক, মহিলা, বুদ্ধিজীবী, গবেষক, সাংবাদিক, সংস্কৃতিসেবী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, জেলে, মৎস্যজীবীসহ দেশের আপামর মানুষকে সম্পৃক্ত করে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন আন্দোলনকে বেগবান করে তুলতে হবে।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের এ মাহেন্দ্রক্ষণে আসুন, আমরা আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে নিরাপদ মৎস্যচাষের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে দেশের জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে স্বাস্থ্যবান, প্রাণবন্ত, উদ্যমী ও মেধাবী প্রজন্ম গড়ে তুলি যে নতুন প্রজন্ম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন করবে।

উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৫ শ্রাবণ ১৪১৮
২০ জুলাই ২০১১

মুখবন্ধ

স্মরণাতীতকাল থেকেই এ দেশের মানুষের খাদ্য তালিকায় মাছ অপরিহার্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আমাদের রয়েছে সুবিশাল মৎস্যসম্পদ। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পুষ্টির যোগান, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্যখাতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমাদের দেশের মৎস্যসম্পদগুলো এক সময় বৈচিত্র্যময় মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীতে পরিপূর্ণ ছিল। প্রাকৃতিক, মনুষ্যসৃষ্ট, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ নানাবিধ কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এ মৎস্যসম্পদ।

দেশের জনগোষ্ঠীর আমিষের চাহিদা পূরণে মৎস্যসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে আরও একটি বিষয়ভাবনা জরুরি হয়ে পড়ছে- তা হলো নিরাপদ মৎস্য। অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে জলাশয়ে বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান ও মৎস্যখাদ্য ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদন পর্যায়ে ব্যবহার বা প্রাকৃতিকভাবে সংশ্লেষিত হওয়া অথবা আহরণপরবর্তী ব্যবস্থাপনার ত্রুটি বা প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যায়ে ব্যবহার বা সংক্রমণ ইত্যাদি কারণে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যে বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি ঘটতে পারে। এছাড়াও পরিবেশ দূষণের ফলে প্রাকৃতিক জলাশয়ে উৎপাদিত মৎস্য রাসায়নিক দূষণের শিকার হচ্ছে যা মৎস্যভোক্তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ। তাই জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মৎস্য ও চিংড়ির গুণগতমান বজায় রাখার নিমিত্ত বাংলাদেশে যুগোপযোগী একাধিক আইন, বিধিমালা ও পলিসি গাইডলাইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তাছাড়া দেশের মৎস্য ও চিংড়ির রাসায়নিক দূষণ প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটি ২০০৯ সাল থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বরাবরের ন্যায় এ বছরেও আগামী ২০-২৬ জুলাই ২০১১ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন প্রচেষ্টাকে গতিশীল করতে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে- ‘নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বদলে দেব বাংলাদেশ’। এ সপ্তাহ উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের ফলে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও গ্রহণে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১ উপলক্ষে এবারও মৎস্য বিষয়ক সংকলন প্রকাশ করা হচ্ছে। সংকলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহ মাছ ও চিংড়ি চাষি, মৎস্যজীবী, মৎস্য রপ্তানিকারক, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নকর্মী, পরিবেশবিদ, পরিকল্পনাবিদ, নীতিনির্ধারক, গবেষক, ছাত্র-শিক্ষক এবং সর্বস্তরের জনগণের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। সংকলনটি প্রকাশের ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয় তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ, দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা দিয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ সংকলনটি প্রকাশে অর্থায়নকারী সকল প্রকল্প পরিচালকগণকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ। সংকলন সম্পাদনা একটি দুরূহ ও শ্রমসাধ্য কাজ। যাদের মেধা ও অকান্ত শ্রমে স্বল্প সময়ে বৈচিত্র্যময় এ সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে তাদের সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১ এর ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করছি।

মোঃ মাহবুবুর রহমান খান

সংকলন প্রকাশনায় অর্থায়নে

১. **ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রকল্প (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)**
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

২. **জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প**
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

৩. **ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প**
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

৪. **অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প,** মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

৫. **হাওর অঞ্চলে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প**
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

৬. **ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প**
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

৭. **বাগদা চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)**
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, বয়রা, খুলনা

৮. **বৃহত্তর পাবনা জেলায় মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্প**
জেলা মৎস্য ভবন, পাবনা

৯. **বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্প**
জেলা মৎস্য ভবন, গোপালগঞ্জ

১০. **যশোর জেলার ভবদহ অঞ্চলে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প**
মৎস্য ভবন, আরবপুর, যশোর

১১. **হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র পুনরুদ্ধার প্রকল্প**
জেলা মৎস্য ভবন, মুরাদপুর, চট্টগ্রাম

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ সংকলন ২০১১

সূচিপত্র

মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কৌশল ও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ১৩
মোঃ মাহবুবুর রহমান খান

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত মাছের উন্নত জাত ও সম্প্রসারণ কৌশল ২১
ড. এম জি হোসেন, ড. এ এইচ এম কোহিনুর ও মোঃ শাহিদুল ইসলাম

বঙ্গোপসাগর ও উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশের ভূমিকা ২৪
প্রফেসর ড. এম. নিয়ামুল নাসের

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও ফিসিং লাইসেন্স গ্রহণের আবশ্যকতা ২৭
নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ূন

মাছ সংরক্ষণ ও পরিবহনে নতুন বরফ বাক্সের প্রবর্তন: পচন রোধ ও গুণগত মান উন্নয়নে প্রভূত উন্নতি ৩০
ড. এ কে এম নওশাদ আলম

গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিসেস বা উত্তম মাৎস্যচাষ অনুশীলন ৩৩
হাবিবুর রহমান খোন্দকার

বাগদা চিংড়িতে হোয়াইট স্পট (ভাইরাস) রোগের প্রাদুর্ভাব ও এর প্রতিরোধ ৩৭
ড. নিত্যানন্দ দাস, আ ক ম শফিক-উজ-জামান ও সরোজ কুমার মিস্ত্রী

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে আদিবাসী সমাজের অংশগ্রহণে কুচিয়া চাষের এক সফল গবেষণা ৪০
সৈয়দ আরিফ আজাদ ও ড. বিনয় চক্রবর্ত্তী

পার্ল গ্রাফটিং ৪৩
শেখ মুস্তাফিজুর রহমান

মৎস্যচাষ সম্প্রসারণে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা : জলমহাল হস্তান্তর প্রসঙ্গ ৪৬
ড. মোঃ মফিজুর রহমান

জলাভূমিতে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ৫০
মোঃ আবুল হাশেম ও মোঃ তৌহিদুর রহমান

উপকূলীয় অঞ্চলে জৈব পদ্ধতিতে মাছ ও চিংড়ি চাষ ৫৩
ডা. আফতাবুজ্জামান

মৎস্য ও মৎস্যপণ্যে রাসায়নিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ: বাংলাদেশের অগ্রগতি ৫৬
নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস ও মোঃ সিরাজুল ইসলাম

সুন্দরবনে স্থায়িত্বশীল মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশল ও কার্যক্রম ৬০
মোঃ সিরাজুল করিম

সহনশীল ইলিশ উৎপাদন : বর্তমান অবস্থা ও করণীয় ৬৩
এ বি এম জাহিদ হাবিব ও ড. নির্মল চন্দ্র রায়

দারিদ্র্য দূরীকরণে নিমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্প : সম্ভাবনা ও করণীয় ৬৭
এম আই গোলদার, মোঃ আরিফ হোসেন ও মোঃ জুবায়দুল আলম

পাঙ্গাসের পুকুরের তলানি ব্যবহার করে ব্যাগ গার্ডেনিং ৬৯
ড. মুহাম্মদ মাহফুজুল হক (রিপন)

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ব্যবস্থাপনায় ভিটিএমএস প্রযুক্তির ব্যবহার ৭২

মৎস্যখাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ৭৪
মনিষ কুমার মণ্ডল

মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণে এনএটিপি কার্যক্রম ও ফলাফল ৭৫
মোঃ গোলজার হোসেন, খ. মাহবুবুল হক ও এ কে এম আমিনুল্লাহ ভূঞা

কার্প জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদনে হ্যাচারি ও খামারের জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা ৭৯
এস এম রাশেদুল হক

অণুপুষ্টিজনিত অপুষ্টি পূরণে ছোটমাছের গুরুত্ব ও উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল ৮২
ড. বিনয় কুমার বর্ম্মন, মোঃ মোকারম হোসেন ও ড. মনজুরুল করিম

গ্রামীণ মৎস্যখাতের উন্নয়ন : পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পবিপ্রবি) এর ভূমিকা ৮৫
ড. সুলতান মাহমুদ

হিমায়িত চিংড়ি শিল্পে শ্রম আইন ২০০৬ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি ৮৮
এস এম ইসতিয়াক

মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি এবং দূষণ প্রতিরোধে মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, ঢাকা ল্যাবরেটরির ভূমিকা ৯০
মোঃ মানিক মিয়া, মোঃ বেলাল হোসেন ও মোহাম্মদ মাকসুদুল হক ভূঁইয়া

বঙ্গোপসাগরে হাঙ্গরের বর্তমান অবস্থা এবং এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব ৯৩
বিক্রম জীৎ রায়

হাওর ও উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন এবং এদের সংরক্ষণ ৯৬
ড. সৈয়দ আলী আজহার

মৎস্যসেক্টর ও নারীর ক্ষমতায়ন ১০১
ড. মোহাঃ সাইনার আলম

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ : নিরাপদ মাছের অমিত সম্ভাবনা ১০৪
ফরিদা বেগম

দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ : গুরুত্ব, হ্রাস পাওয়ার কারণ, বৃদ্ধির উপায় এবং করণীয় ১০৬
কাজী ইকবাল আজম ও মোঃ সামছুজ্জামান খান

মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে আরএফএলডিসি-বরিশাল এর ভূমিকা ১০৯
মোঃ মনোয়ার হোসেন, কেনেথ হ্যান্স অটো গুগ ও মোহাম্মদ আলী রেজা

অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র্য বিমোচনে মৎস্য অধিদপ্তরের ভূমিকা ১১১
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ও মোঃ শফিক উদ্দিন

বাংলাদেশে টেকসই মৎস্য উৎপাদনে উন্নত ব্রুডের গুরুত্ব ১১৩
মোঃ অহিদুজ্জামান, মোঃ মহসিন উজ জামান ও মোঃ গোলাম কিবরিয়া

জলমহাল, মৎস্যজীবী ও মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ১১৫
আনোয়ার হোসেন সিকদার

জাতীয় মৎস্য পুরস্কার ২০১১ ১১৬

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ (২০০৯-২০১০ সালের তথ্যানুযায়ী) ১১৭

প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর ১২৫

মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কৌশল ও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ

মোঃ মাহবুবুর রহমান খান

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। জাতীয় অর্থনীতিতে এ সম্ভাবনাময় সেক্টরের ভূমিকা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলছে। বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তর প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। ২০০৯-১০ আর্থিক সালে ২৮.৯৯ মে.টন মৎস্য উৎপাদন হয়েছে, যা চলতি মূল্যমান (প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা)-এর হিসেবে মোট জিডিপি'র ৩.৭৪ শতাংশ, কৃষিখাতে অবদান ২২.২৩ শতাংশ এবং রপ্তানি আয়ে অবদান ২.৭০ শতাংশ। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের ৫৮ শতাংশ যোগান দেয় মাছ। দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় ১০ শতাংশ তথা প্রায় ১.৪৫ কোটি লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। মৎস্য খাতের সার্বিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষতা সাধনের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর নিয়মিত রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বিগত ২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০ সালে মৎস্য উপখাতে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.৯ শতাংশ।

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)-য় ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জিতব্য নির্দিষ্ট আটটি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা আনয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন অন্যতম। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সরকার প্রণীত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে মৎস্য উপখাতকে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দরিদ্রবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মৎস্য উপখাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে বর্ণিত কৌশলগত লক্ষ্যগুলো হলো: ক. অভ্যন্তরীণ মাছ চাষে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি; খ. অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি; গ. দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধি; ঘ. ধানক্ষেতে ও মৌসুমি জলাশয়ে মাছ চাষ অধিকতর সম্প্রসারণ; ঙ. সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় জলাশয়ে মৎস্যসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি; চ. অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ; ছ. মৎস্য গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ ইত্যাদি।

বর্তমান সরকারের 'উন্নয়ন প্রচেষ্টা ভিশন ২০২১, বাংলাদেশ: সমৃদ্ধ আগামী' প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ২০১৩ সালের মধ্যে দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, গ্রামীণ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়ন ও ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বর্তমানের ২.৮০ কোটি বেকারের সংখ্যা ২০১৩ সালে ২.৪০ কোটি এবং ২০২১ সালে ১.৫০ কোটিতে হ্রাস করা, দারিদ্র্য সীমা ও চরম দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ২৫ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা, হতদরিদ্রের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিস্তৃতি ইত্যাদি উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। মৎস্য উপখাত সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। ভিশন ২০২১, বাংলাদেশ: সমৃদ্ধ আগামী প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বিবেচনায় রেখে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০০৯-২০২১) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ হলো-

- অধিক পরিমাণ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করার জন্য পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ এবং মাছ চাষে উত্তম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তন।
- সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা সংশোধন করে খাস জলাশয় ও জলমহাল প্রকৃত মৎস্যজীবীদের নিকট বন্দোবস্ত ও জৈবিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের মাধ্যমে জলাশয়ের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
- মুক্ত জলাশয়ে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং মাছ ও চিংড়ি চাষ কার্যক্রমে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও নারীদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা।
- মৎস্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বর্তমান দরিদ্রের সংখ্যা ৬.৫ কোটি হতে ২০১৩ সালে ৪.৫ কোটিতে এবং ২০২১ সালে ২.২০ কোটিতে হ্রাস করার ক্ষেত্রে অবদান রাখা।
- আয়তন নির্বিশেষে গৃহস্থালী সংলগ্ন পুকুরডোবা মাছ চাষের আওতায় এনে একটি বাড়ি একটি খামার শীর্ষক কৃষি উন্নয়ন মডেল বাস্তবায়নে কার্যকর অংশগ্রহণ।
- হতদরিদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃত করা, বিশ্বায়ন ও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি মোকাবেলায় কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার।
- বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য আগামী ২০১৩ সালের মধ্যে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন।

এছাড়া বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ এবং নির্বাচনী ইস্তেহার-এ উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত ২০১৫ সালের মধ্যে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং Bangladesh Country Investment Plan বাস্তবায়নের মাধ্যমে মৎস্য সেক্টরে অর্জিতব্য প্রধান লক্ষ্যসমূহ হলো- উপখাত সরকারের

উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। 'ভিশন ২০২১, বাংলাদেশ: সমৃদ্ধ আগামী' প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বিবেচনায় রেখে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০০৯-২০২১) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ হলো-

- মাছের উৎপাদন বর্তমানের চেয়ে ২৫% বৃদ্ধিকরণ,
- জনপ্রতি ৫৬ গ্রাম আমিষের চাহিদা পূরণ,
- চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক আয় সাত হাজার কোটি টাকায় উন্নীতকরণ
- বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ও মৎস্যচাষে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ
- মৎস্যচাষি/মৎস্যজীবীদের আয় ২০% বৃদ্ধিকরণ, এবং
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ।

মৎস্যসম্পদের উৎস ও মৎস্য উৎপাদন

বাংলাদেশের জলসম্পদ জীববৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এদেশের মূল ভূখণ্ডের প্রায় সর্বত্রই নদীনালা, খালবিল জালের মত ছড়িয়ে রয়েছে। দেশব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য পুকুরদীঘি, ডোবানালা, হাওর, বাঁওড় ও প্লাবনভূমি। এছাড়াও রয়েছে বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশি। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের আয়তন ৪০.২৫ লক্ষ হেক্টর (৮৬.৫%) এবং অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ের আয়তন ৬.২৮ লক্ষ হেক্টর (১৩.৫%) (চিত্র ১)। মৎস্য অধিদপ্তরের প্রধানতম কাজ হলো মাছ ও চিংড়িসহ জলজসম্পদের দায়িত্বশীল উৎপাদন বাড়িয়ে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্মুক্ত জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করত প্রাপ্ত সুফলের মাধ্যমে দরিদ্র মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষি, তথা দেশের কাঙ্ক্ষিত আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন। এক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তর দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

বিগত ১০ বছরের মৎস্য উৎপাদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০০০-২০০১ অর্থবছরে মাছের মোট উৎপাদন ছিল প্রায় ১৭.৮১ লক্ষ মে.টন। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় ২৯ লক্ষ মে.টন। উন্নততর প্রযুক্তির সাথে সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত সম্প্রসারণ কর্মীগণের চাহিদা মাফিক ও সার্বক্ষণিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ফলে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন প্রবৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন ৩১.০০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনায় উৎপাদন প্রক্ষেপণ ও মাছের চাহিদা

২০০৯-১০ সালে দেশে মোট ২৮.৯৯ মে.টন মাছ ও চিংড়ি উৎপাদিত হয়েছে। চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন বাড়াতে হলে অধিক হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। বিদ্যমান প্রবৃদ্ধির হার বাড়িয়ে ২০১০-১১ সালে ৩১.০ লক্ষ মে.টন, ২০১৪-১৫ সাল নাগাদ ৩৬.৬৫ লক্ষ মে.টন এবং ২০২০-২১ সাল নাগাদ ৪১.৩৯ লক্ষ মে.টন মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হলে দেশের অভ্যন্তরীণ মাছের চাহিদা পূরণ করেও ২০১৪-১৫ ও ২০২০-২১ সাল নাগাদ যথাক্রমে ১.২৫ লক্ষ মে.টন ও ২.২৯ লক্ষ মে.টন উদ্বৃত্ত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে একজন মানুষের আমিষ চাহিদা পূরণের জন্য দৈনিক ৫৬ গ্রাম মাছ খাওয়া প্রয়োজন। এ হিসেবে বাংলাদেশে ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ সালে দেশের জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ এবং রপ্তানি আয় কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে উন্নীত করতে যথাক্রমে মোট ৩৩.২৪ ও ৩৩.৮০ লক্ষ মে.টন মাছ উৎপাদন করতে হবে। দেশে মাছের মোট চাহিদা নির্ণয়ে খাদ্য হিসেবে গৃহীত মাছ, রপ্তানিযোগ্য মাছ, মৎস্য ও পশু খাদ্যে ব্যবহৃত মাছ এবং বিপণনে সম্ভাব্য অপচয় হিসাব করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আগামী ২০১৪-১৫ ও ২০২০-২১ সালে দেশে মোট মাছের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে যথাক্রমে ৩৫.৪০ ও ৩৯.১০ লক্ষ মে.টন (চিত্র ২)।

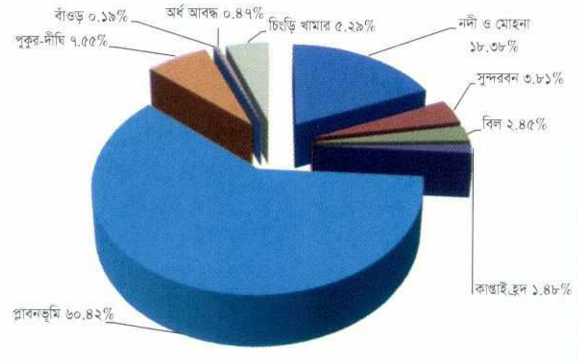

চিত্র ১: মৎস্য উৎপাদনের খাতসমূহ

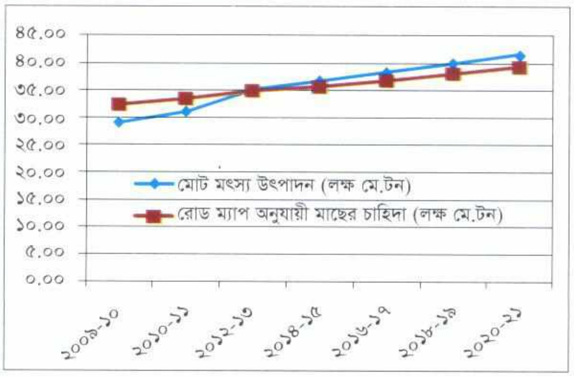

চিত্র ২: মাছের উৎপাদন ও চাহিদা প্রক্ষেপণ

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির অগ্রাধিকারভিত্তিক ক্ষেত্রসমূহ
নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত মৎস্যসম্পদের উৎসভিত্তিক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম জোরদার করার পাশাপাশি নতুন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ২০১৪-১৫ সাল নাগাদ নির্ধারিত মৎস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনার আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রমসহ তথ্য প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মুক্ত জলাশয়ে উৎপাদন পরিকল্পনাভিত্তিক জৈবিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, প্রদর্শনী খামার স্থাপন এবং চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পুকুরদীঘিতে উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে মাছ ও চিংড়ি চাষ নিবিড়করণ এবং বিশাল প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ অব্যাহত রয়েছে।

ক. প্রবাহমান নদী ও জলমহালে জৈবিক ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন
অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় তথা নদনদী, খালবিল, হাওর, বাঁওড় ও প্লাবনভূমি মূলত সরকারি খাস জলাশয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং এসব উৎস হতে প্রাকৃতিকভাবে আহরিত মৎস্যসম্পদের ওপর মৎস্যজীবীদের জীবনজীবিকা বহুলাংশে নির্ভরশীল। কিন্তু বাস্তবতা হলো বিগত তিন দশকে এসব উৎস হতে মাছের উৎপাদন আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পায়নি। জৈবিক ব্যবস্থাপনায় মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের কোনো পদক্ষেপ না থাকা, মাছের অতিআহরণ, পরিবেশ দূষণ, প্রজনন ও চারণভূমি হ্রাসের কারণে প্রাকৃতিক প্রজনন বিঘ্নিত হওয়ায় মাছের প্রবেশন (recruitment) হ্রাস পাওয়া; নির্বিচারে সবধরনের মৎস্য আহরণ; কীটনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ও যথেচ্ছা ব্যবহার; প্রকৃত মৎস্যজীবীদের খাস জলাশয় ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকা ইত্যাদি কারণে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে স্বাভাবিক উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেয়েছে। মুক্ত জলাশয়ের সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক বলেই বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন।

- রাজস্বভিত্তিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে উৎপাদন পরিকল্পনাভিত্তিক জৈবিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন এবং সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে জলমহালে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ;
- অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলমহালে জৈবিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট জলমহাল মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্তকরণ;
- প্রাকৃতিক প্রজনন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নদনদীর উপযোগী স্থানে অভয়াশ্রম স্থাপন এবং তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা;
- মাছের প্রজননক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণ ও ভরাট হয়ে যাওয়া জলাশয় পুনঃখনন করে মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার;
- প্রবাহমান নদীর মৎস্য আহরণ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে মৎস্যজীবীদের অধিকারপত্র প্রদান;
- বিল নার্সারি ও পোনা মজুদ কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- পেন ও খাঁচায় মাছ চাষ সম্প্রসারণ; ইত্যাদি।

পোনা মাছ অবমুক্ত ও বিল নার্সারি কার্যক্রম: অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত প্রায় এক দশক থেকে নির্বাচিত জলমহাল এবং বন্যাপ্লাবিত ধানক্ষেত ও প্লাবনভূমিতে রুই জাতীয় মাছের পোনা মজুদের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পোনামাছ অবমুক্তির ফলে জলমহালের উপর নির্ভরশীল মৎস্যজীবী/সুফলভোগীগণের আয় বৃদ্ধিসহ স্থানীয় পর্যায়ে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ বেড়েছে। পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে গত ২০১০-১১ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্প হতে প্রায় ৮.০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। তাছাড়া পোনা অবমুক্ত কার্যক্রমকে আরও অধিক স্থায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে সম্প্রতি এ কার্যক্রমের আওতায় নির্বাচিত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জলাশয় সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীগণের মাধ্যমে বিল নার্সারি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে পোনা উৎপাদন ও অবমুক্ত করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যেই বিল নার্সারি নীতিমালা ২০০৯ প্রণীত হয়েছে। গত অর্থবছরে বিল নার্সারি স্থাপনের জন্য রাজস্ব খাতে প্রায় ৬১.০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় দেশের ৮০টি বিলে ৩৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিল নার্সারি স্থাপনের ফলে উন্মুক্ত জলাশয়ে অতিরিক্ত ২০০০ মে.টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে।

মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন: মৎস্য সংরক্ষণ আইনের যথাযথ ও কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে দেশীয় কার্প ও অন্যান্য ছোট ছোট প্রজাতির মাছের প্রজনন ও বর্ধন নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যকর উদ্যোগের সাথে সাথে অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতায় মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে পোনা মাছ ও জাটকা রক্ষা, কারেন্ট জালের অবৈধ ব্যবহার রোধ, ডিমওয়ালা মাছ ধরা রোধ, ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, সচেতনতা সভা ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে।

সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা: আমাদের অভ্যন্তরীণ জলসম্পদের প্রায় ৬২ শতাংশ প্লাবনভূমি, যেখানে ৪ থেকে ৬ মাস মাছ চাষোপযোগী পানি থাকে। ষাটের দশকে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৮০ শতাংশ আসতো উন্মুক্ত জলাশয় হতে, বর্তমানে যা ৩৫ শতাংশে নেমে এসেছে। এ অবস্থার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের অনুকূলে হস্তান্তরিত উন্মুক্ত জলাশয় সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী/মৎস্যজীবীদের সমন্বয়ে সমাজভিত্তিক সংগঠন

গড়ে তোলা হয়। ফলে জলাশয়ে মৎসজীবীদের অধিকার অনেকাংশেই নিশ্চিত হয়েছে এবং তারা মুক্ত জলাশয়ে জৈবিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় উদ্যোগী হয়েছে। সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে অংশীদারিত্বের একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তোলার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে দেশের প্রায় ৪৫০টি জলাশয়ে পাঁচ শতাধিক সমাজভিত্তিক সংগঠন তৈরি করে স্থানীয় মৎস্যজীবী ও জলাশয় তীরবর্তী অন্যান্য সুফলভোগীদের সম্পৃক্ততায় মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কার্যক্রমভুক্ত জলাশয়সমূহের জীববৈচিত্র্য লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ৬৫০ কেজি পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে, যেখানে প্লাবনভূমিতে হেক্টর প্রতি গড় মৎস্য উৎপাদন বর্তমানে প্রায় ২৫৫ কেজি। এছাড়া গত ২০০৯-১০ অর্থবছরে দেশের ২৭৩৪ হেক্টর প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ করে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ২.৭০ মে.টন অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। অর্জিত এ ফলাফল ও কার্যক্রমের শিক্ষণকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতায় দেশের বিভিন্ন এলাকার প্লাবনভূমিতে পর্যায়ক্রমে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রম হিসেবে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০১৪-১৫ সালের মধ্যে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে প্রায় ১.০ লক্ষ হেক্টর প্লাবনভূমি উন্নততর ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হবে। আগামী ২০২০-২১ সালের মধ্যে প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে চাষ এলাকা ১.৭০ লক্ষ হেক্টরে উন্নীত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে দেশের মোট প্লাবনভূমির হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২০২১ সাল নাগাদ ৫০০ কেজিতে উন্নীত হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন: বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন একটি অন্যতম কারিগরি কৌশল হিসেবে ইতোমধ্যেই সুফলভোগীদের নিকট পরিচিতি লাভ করেছে। গত দশকের প্রথম দিকে দেশের বিভিন্ন নদনদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে প্রায় ৩৮০টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়। অভয়াশ্রম পরিচালনার কাঙ্ক্ষিত সাফল্য দেখা যাওয়ায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী অন্যান্য উপযুক্ত জলাশয়ে অভয়াশ্রম স্থাপনের উদ্যোগ নেয় হয়। এসব অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে ঐসব জলাশয়ে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতি, যথা- চিতল, ফলি, কালিবাউস, আইড়, টেংরা, মেনি, রাণী, সরপুঁটি, মধু পাবদা, কাজলি, চাকা, গজার, তারা বাইম ইত্যাদি মাছের বংশবৃদ্ধি ঘটেছে। এতে মৎস্য তথা জলজ জীববৈচিত্র্যে ভারসাম্য ফিরে আসতে শুরু করেছে বলে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়। মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের পাশাপাশি মাছের স্বাভাবিক চলাচল, বিশেষ করে প্রজনন মৌসুমে মাছের অবাধ অভিপ্রয়াণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন নদীর সংযোগ খাল, মরা নদী ও বিল খনন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায়, বাংলাদেশে স্বাদুপানির মোট ২৬০ প্রজাতির মাছ আছে। কিন্তু আবাসস্থল ও প্রজনন ক্ষেত্রের অবক্ষয়, অধিক হারে মৎস্য আহরণ, কৃষি জমিতে মাত্রাতিরিক্ত অবৈধ কীটনাশকের ব্যবহারসহ মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক নানা কারণে বর্তমানে প্রায় ৫৪টি প্রজাতি বিলুপ্তির পথে।

খ. পুকুর-দীঘিতে মৎস্যচাষ নিবিড়করণ

বর্তমানে দেশের ৩.৫ লক্ষ হেক্টর পুকুরদীঘিতে বার্ষিক হেক্টর প্রতি গড় মৎস্য উৎপাদন প্রায় ৩.৫ মে.টন। প্রশিক্ষিত ও দক্ষ সম্প্রসারণ কর্মীর মাধ্যমে মাছ চাষের আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে চাষি প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর, লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের সব পুকুরদীঘি লাগসই মাছ চাষের আওতায় আনা সম্ভব হলে পুকুরদীঘির ক্ষেত্রে এ উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৫.০ থেকে ৬.০ মে.টনে উন্নীত করা সম্ভব। আগামী ২০১৪-১৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৪.০ মে.টনে উন্নীত করে মাছের চাহিদা পূরণে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

গ. জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। দেশে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৩.১৩ লক্ষ মে.টন ইলিশ উৎপাদিত হয়েছে, যা মোট উৎপাদনের প্রায় ১২ শতাংশ। একক প্রজাতি হিসেবে দেশের মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। ইলিশ আহরণ করা হয় প্রধানত নদী, উপকূলীয় মোহনা ও সমুদ্র থেকে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় স্থিরকৃত মৎস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এজন্য মৎস্য সংরক্ষণ আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, ইলিশ অভয়াশ্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ আহরণ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা এবং জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও ভিজিএফ কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি করে আপদকালীন খাদ্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উল্লিখিত কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইলিশের প্রজননক্ষেত্রসমূহ রক্ষা এবং জাটকা

সংরক্ষণ কার্যক্রমের ফলে ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন যথাক্রমে ৩.৪০, ৩.৬০ ও ৪.০০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

জাটকা আহরণ থেকে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের বিরত রাখার লক্ষ্যে রাজস্ব খাত হতে বিকল্প কর্মসংস্থান এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। গত ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১০টি জেলার প্রায় ১.৪৩ লক্ষ পরিবারের মধ্যে ফেব্রুয়ারি হতে মে পর্যন্ত ৪ মাসের জন্য পরিবার প্রতি ১০ কেজি হারে ৫,৭৩০ মে.টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়। গত ২০০৯-১০ অর্থবছরে জাটকা মৎস্যজীবীদের বিশেষ ভিজিএফ ৩ গুণ বৃদ্ধি করে পরিবার প্রতি মাসিক চাউলের পরিমাণ ৩০ কেজিতে উন্নীত এবং পুনর্বাসনের আওতা সম্প্রসারিত করে মৎস্যজীবী পরিবারের সংখ্যা প্রায় ১.৬৫ লক্ষে উন্নীত করা হয়।

এছাড়া জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান টেকসই ভিত্তিতে পরিচালনার নিমিত্ত ইলিশ অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট ৪টি জেলায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মাধ্যমে জাটকা আহরণকারী অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। গত দু'বছরে জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ২০০৯ সালে ৪,৩৮৮ জেলে পরিবারকে ৩.০০ কোটি টাকা এবং ২০১০ সালে ৬,৮২৫ জেলে পরিবারকে ৫.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে উপকরণ সহায়তা ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ইলিশ সমৃদ্ধ এলাকায় মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নসহ ঘোষিত ৪টি ইলিশ অভয়াশ্রম সংরক্ষণের নিমিত্ত বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারপ্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া শরীয়তপুর জেলায় নতুন একটি ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ভরা প্রজনন মৌসুমে চিহ্নিত প্রজননক্ষেত্রে প্রজননক্ষম ইলিশ সংরক্ষণ ও অবাধ প্রজনন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এবং বিএফআরআই-এর অংশগ্রহণে বিশেষ সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ঘ. পরিবেশ বান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ

চিংড়ি বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি খামারের সংখ্যাও দ্রুতগতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ফলে কয়েক বছরের ব্যবধানে চিংড়ি খামারের আয়তন ৬৪ হাজার হেক্টর হতে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার হেক্টরে উন্নীত হয়েছে। এ সমস্ত চিংড়ি খামারের উৎপাদন ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে ০.৯২ লক্ষ মে.টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১.৫৭ লক্ষ মে.টনে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, চাষি প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা ২০১১ (অনুমোদনের অপেক্ষাধীন) মোতাবক বাস্তবায়ন করা হলে ২০২০-২১ সালে চিংড়ি খামার থেকে মোট উৎপাদন প্রায় ২.১০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

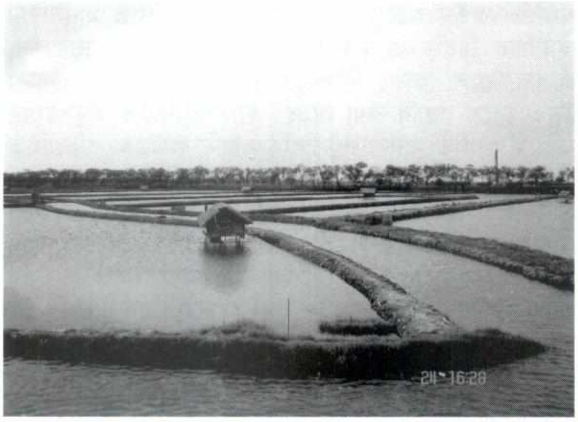

ঙ. সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন মূলত আহরণ নির্ভর। উপকূলব্যাপী ৭১০ কিমি দীর্ঘ তটরেখা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত ১.৬৬ লক্ষ বর্গ কিমি বিস্তৃত একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের বিশাল সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসম্পদে ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি এবং ৪৭৫ প্রজাতির মাছ রয়েছে। গত ২০০৯-১০ অর্থ বছরে বঙ্গোপসাগর হতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রল ফিসিং-এর আওতায় ০.৪০ লক্ষ মে.টন এবং আর্টিসেনাল মৎস্য আহরণের মাধ্যমে ৪.৭৯ লক্ষ মে.টনসহ মোট ৫.২৮ লক্ষ মে.টন মৎস্য আহরণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদের ন্যায় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মৎস্যজীবীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযানে মৎস্য আহরণে

নিয়োজিত প্রায় ২.৭০ লক্ষ মৎস্যজীবীর পরিবারের ন্যূনতম ১৩.৫০ লক্ষ মানুষের জীবিকা নির্বাহ উপকূলীয় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মাধ্যমে হচ্ছে।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় জরিপ কার্যক্রম সম্পাদন করে ফিসিং গ্রাউন্ড চিহ্নিতকরণ, মৎস্যসম্পদের প্রজাতিভিত্তিক মজুদ নিরূপণ এবং সর্বোচ্চ সহনশীল মৎস্য আহরণ মাত্রা (Maximum Sustainable Yield-MSY) নির্ণয় করার নিমিত্ত অতিশীঘ্রই জরিপ কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে একটি গবেষণা ও জরিপ জাহাজ ক্রয় প্রক্রিয়া অগ্রসরমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্প হতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থপনার ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি (Monitoring, Control and Survellance-MCS) কার্যক্রম জোরদারকরণের নিমিত্ত স্যাটেলাইট প্রযুক্তি নির্ভর Vessel Tracking Monitoring System (VTMS) স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্যখাত ইতোমধ্যেই ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ হতে গুণগত মানসম্পন্ন হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স, হংকং, সিঙ্গাপুর ও সৌদি আরবসহ অন্যান্য উন্নত দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। হ্যাসাপ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন চিংড়ি রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় এ খাতে আশাতীত সাফল্যও অর্জিত হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের নির্ধারিত মাননিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় চিংড়ি উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সকল স্তরে হ্যাসাপ ও ট্রেসিবিলিটি রেগুলেশনও কার্যকর করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২০০৯-১০ সালে ৭৭,৬৪৩ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে আয় হয়েছে ৩,৪০৮.৫২ কোটি টাকা। তাছাড়া ২০১০-১১ অর্থবছরের মে ২০১১ পর্যন্ত ৯০,৮৯০ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছে ৪,১৭৫.৩০ কোটি টাকা। পরিবেশবান্ধব চিংড়ি উৎপাদন ও রপ্তানির এ ক্রমধারা ধরে রাখতে পারলে ভবিষ্যতে এ সেক্টর হতেই কয়েক হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীর ক্ষমতায়ন

সমাজের সুবিধা বঞ্চিত, বিশেষ করে দরিদ্র ও দুঃস্থ নারী, যাঁদের পুকুর/ডোবা আছে বা মাছ চাষ করার জন্য অনুরূপ কোনো উৎসে অংশগ্রহণের সুযোগ আছে, তাঁদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নির্বাচন করা হয়ে থাকে। উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূল স্রোতধারায় নারীদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ২৫-৩০ শতাংশ সুফলভোগী নারীদের মাঝ থেকে নির্বাচন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় নিয়োজিত কর্মীর প্রায় শত ভাগই নারী।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন কার্যক্রম

দেশের মৎস্যসম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সদ্য সমাপ্ত ২০১০-১১ অর্থবছরে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২৩টি উন্নয়ন প্রকল্প ও ২টি কর্মসূচির জন্য প্রায় ১৩০.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। চলতি ২০১১-১২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য মোট ২২টি উন্নয়ন প্রকল্প ও ২টি কর্মসূচির জন্য মোট ১৮৪.০০ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে। এছাড়াও ২০১১-১২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য ২৫টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত পশ্চাদপদ এলাকার মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে এসকল বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে অবক্ষয়িত জলাশয় সংস্কার, মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পোনা অবমুক্তি ও বিল নার্সারি স্থাপন, বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

মৎস্য অধিদপ্তরের অধিকাংশ কার্যক্রম দারিদ্র্য বিমোচনকে কেন্দ্র করে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মৎস্যচাষ কার্যক্রম জোরদার করার জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির অধীনে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রায় ৪.৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়। এছাড়া সমন্বিত মৎস্যচাষের নিমিত্ত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প ও অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ২৫.৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী তথা মৎস্যচাষি/মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্বখাত হতে ঋণ প্রাপ্ত সুফলভোগীর সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষ ৬০ হাজারে উন্নীত হয়েছে। সুফলভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত ঋণের আদায়ের হারও বেশ ফলপ্রসূ।

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

মৎস্য অধিদপ্তর পরিবেশবান্ধব মৎস্যচাষের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। সেলক্ষ্যে বিপন্নপ্রায় মাছের কৃত্রিম প্রজনন, নিরাপদ প্রাকৃতিক প্রজনন ও এদের চাষের জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর দেশব্যাপী কিছু নির্বাচিত জলাশয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করেছে। এর ফলে জীববৈচিত্র্যের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতি নিরাপদে প্রজনন করতে পারছে। মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের

আওতায় পতিত ও মজা পুকুর পুনঃখনন করে মাছ চাষ কার্যক্রম চালু করেছে। এছাড়া, মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আর্থিক সাহায্য ও প্রকল্প এলাকার স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম চালু রয়েছে, যা পরিবেশ উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও মৎস্য সেক্টর

জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থসামাজিক অবকাঠামো ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীলতাই এর মূল কারণ বলা যায়। আর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- অতিবৃষ্টি, খরা, বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি ঘটার সম্ভাবনা ও ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে ফলে দিতে হচ্ছে চরম মূল্য। এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নাজুক অর্থনীতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিক নির্ভরতা এ বিপন্নতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। মৎস্য, কৃষি, জীববৈচিত্র্য, স্বাস্থ্য, পানি সম্পদ, জীবিকা, খাদ্য নিরাপত্তা, অবকাঠামো ইত্যাদি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আশঙ্কাজনক।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মৎস্যখাতও আজ হুমকির মুখে। এর প্রভাবে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পানি শুকিয়ে গিয়ে মাছের আবাসস্থল কমে যাচ্ছে, সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ছে মাছের বংশবিস্তার। নদী ও সাগরের মাছের উপর নির্ভরশীল জেলেদের বেশির ভাগ ভূমিহীন ও হতদরিদ্র। নদী ও সাগরের অতি নিকটে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বাস করার কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সাগর এখন দীর্ঘ সময় ধরে উত্তাল থাকে, ফলে জেলেদের মাছ ধরার সুযোগ ও সময় কমে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণসহ ধরনও পরিবর্তিত হচ্ছে এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে মৎস্য প্রজনন ও উৎপাদনে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ সকল পদক্ষেপের মধ্যে বাংলাদেশের বিপন্ন মানুষকে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবেলায় অভিযোজনের প্রচেষ্টা অগ্রাধিকার পেয়েছে। সর্বোপরি জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে উপযুক্ত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে এগিয়ে যেতে হবে।

মৎস্য সেক্টরে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ, তথ্যের আদান-প্রদান ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.fisheries.gov.bd) পরিচালনার সাথে সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে Personnel Information Management System (PIMS) নামে একটি সফটওয়ার প্রস্তুতির কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে সম্পাদিত কার্যক্রমের প্রতিবেদন তাৎক্ষণিকভাবে সংগ্রহ এবং কার্যকরভাবে একীভূত ও প্রক্রিয়াজাত করার লক্ষ্যে MIS of DOF নামে একটি সফটওয়ার চালুর অপেক্ষায় রয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধা কাজে লাগিয়ে মাছ ও চিংড়ি চাষিদের চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি সেবা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদানের লক্ষ্যে ইউএনডিপি'র আর্থিক সহায়তায় দেশের ১০টি জেলার ১০টি উপজেলা ও ১০টি গ্রামে e-Extension Service for Need based Aquaculture Extension শীর্ষক পরীক্ষামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচি দেশে আরো ছড়িয়ে দিয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখার পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে অধিকতর সামর্থ্যবান করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন প্রচার প্রচরণামূলক কার্যক্রম

প্রতি বছর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক জাতীয়ভাবে মৎস্য সপ্তাহ ও জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। এ সকল জাতীয় অনুষ্ঠান আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মৎস্যসম্পদের সহনশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মৎস্য সেক্টর সংশ্লিষ্ট সকল সুফলভোগীদের মৎস্যসম্পদের উন্নয়নে সম্পৃক্ত করা। মাছ চাষের আধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশল ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে সম্পৃক্ত করে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনাকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার জন্য মূলত প্রতি বছর এ জাতীয় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

নিরাপদ মাছ ও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ

খাদ্য নিরাপত্তার (food security) পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য সুরার জন্য নিরাপদ খাদ্যের (safe food) বিষয়টি এখন বিশ্বব্যাপী সময়ের দাবি। বিশেষত বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস মাছ হওয়ার ফলে নিরাপদ খাবার হিসেবে মাছ ও মাছজাত পণ্যের প্রাপ্যতা অতীব গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। দেশে মাছের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে জলাশয়ের পরিবেশ, মাটি ও পানির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান এবং মাছের খাদ্যের ব্যবহারমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদন পর্যায়ে ব্যবহার বা প্রাকৃতিকভাবে সংশ্লেষিত হওয়া অথবা আহরণপরবর্তী ব্যবস্থাপনার ক্রটি বা প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যায়ে ব্যবহার বা সংক্রমণ ইত্যাদি কারণে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যে বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি ঘটতে পারে। এছাড়াও বিভিন্নভাবে পরিবেশ দূষণের ফলে প্রাকৃতিক জলাশয়ে উৎপাদিত মাছ রাসায়নিক দূষণের স্বীকার হচ্ছে, যা দেশের মৎস্যভোক্তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ। অভ্যন্তরীণ বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মাছ সংরক্ষণ এবং বিপণনের বিষয়ে সরকার বিশেষভাবে সচেষ্ট। এদেশের মৎস্যখাত ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডাসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানির মাধ্যমে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বৈদেশিক

মুদ্রা অর্জনকারী হিসেবে স্বীকৃত। বিদেশি ভোক্তারা জনস্বাস্থ্যের প্রশ্নে খাদ্যে রাসায়নিক দূষণের বিষয়কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। দেশি ও বিদেশি ভোক্তাদের জনস্বাস্থের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মৎস্য ও চিংড়ির গুণগতমান বজায় রাখার নিমিত্ত বাংলাদেশে যুগোপযোগী একাধিক আইন, বিধিমালা ও পলিসি গাইডলাইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তাছাড়া দেশের মৎস্য ও চিংড়ির রাসায়নিক দূষণ প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটি (NWC) ২০০৯ সাল থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যুগোপযোগী আইনী কাঠামোগুলো নিম্নরূপ-

- মৎস্য ও মৎসপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ প্রণীত হয়েছে।
- ২০০৮ সালে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৯৭ এর সংশোধনের মাধ্যমে মৎস্যচাষে বেশ কিছু রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয় এবং ব্যবহার উপযোগী রাসায়নিক দ্রব্যসমূহের সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এই বিধিমালাটি আরও যুগোপযোগী করে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০১১ প্রস্তাব করা হয়েছে যেখানে পূর্বের সম্ভাব্য সকল অসম্পূর্ণতা দূর করা হয়েছে।
- মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন ২০১১ প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- জাতীয় রেসিডিউ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পলিসি গাইডলাইন ২০০৮ সাল হতে প্রতিবছর প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এছাড়া দেশীয় পর্যায়ে কিছু অসাধু মৎস্য ব্যবসায়ী মাছ সংরক্ষণে অবৈধ রাসায়নিক দ্রব্য, যেমন-ফরমালিন ব্যবহার করে থাকে যা জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের প্রতি অত্যন্ত হুমকিস্বরূপ। এ বিষয়ে দেশের খুচরা ও পাইকারী মৎস্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্পও হাতে নেয়া হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

মৎস্য সেক্টরের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে জাতীয় মৎস্য নীতি প্রণীত ও অনুমোদিত হয়। জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮ মৎস্য সেক্টরের পরিকল্পিত উন্নয়নের একটি প্রথম ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পরবর্তীতে এ নীতিমালার আওতায় মৎস্য সেক্টরের সকল পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা করা হয়। জাতীয় মৎস্য নীতি এর উপর ভিত্তি করে সরকার ইতোমধ্যে জাতীয় মৎস্য কৌশলপত্র এর আওতায় আটটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে। উল্লিখিত কৌশলপত্রগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তাছাড়া ইতোমধ্যেই মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন ২০১০ এবং মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, এবং জাতীয় চিংড়ি নীতি ২০১১ সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন ২০১০ সঠিকভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে মৎস্য খাদ্যে কোন ভেজাল ও নিষিদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করা অনেকাংশেই সম্ভব হবে। মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০ বাস্তবায়নে অন্তঃপ্রজনন ও সঙ্করায়নসহ ক্ষতিকারক কার্যাদি বন্ধ করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আর এসব কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনের ফলে দেশের মৎস্য উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে তীব্র জনবল সঙ্কট। ১৯৮৩ সালে এনাম কমিটি কর্তৃক সর্বশেষ মৎস্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হয় এবং সে অনুযায়ী মৎস্য অধিদপ্তরে বর্তমানে জনবলের সংখ্যা মোট ৪৮৪১ জন। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বিপুল কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন, বিজ্ঞানমনস্ক ও দক্ষ ন্যূনতম জনবল সম্বলিত একটি জনপ্রশাসন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় ন্যূনতম জনবলের একটি সাংগঠনিক কাঠামো ইতোমধ্যেই প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দেশের সামগ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রসমূহের যথাযথ সংরক্ষণ, জৈবিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়ন, আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন চাষ পদ্ধতির নিবিড়করণ, সকল ধরনের জলজসম্পদ ও তথ্য প্রযুক্তি কার্যকরভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন আগামী ২০১৪-১৫ সাল নাগাদ ৩৬.৬৫ লক্ষ মে.টন এবং ২০২০-২১ সাল নাগাদ ৪১.৩৯ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করা সম্ভব হবে। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১ এর প্রতিপাদ্য নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বদলে দেব বাংলাদেশ শ্লোগানকে সামনে রেখে মৎস্য অধিদপ্তর সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতায় দেশের মৎস্য সম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য মাছে-ভাতে বাঙালি-এ গৌরব পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে বিপুল জনগোষ্ঠীর প্রোটিন চাহিদা মিটাতে সচেষ্ট থাকবো- এটিই সকলের প্রত্যাশা।

১. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত মাছের উন্নত জাত ও সম্প্রসারণ কৌশল

ড. এম জি হোসেন[১], ড. এ এইচ এম কোহিনুর[২] ও মোঃ শাহিদুল ইসলাম[৩]

মৎস্যচাষ বাংলাদেশে মৎস্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক ব্যাপক বিপ্লবের সূচনা করেছে। বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে মৎস্যচাষে বর্তমানে উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এক বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় মৎস্য উৎপাদন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং পুষ্টি যোগানে মৎস্যচাষের অবদান আজ সর্বজন স্বীকৃত। বর্তমানে মৎস্যচাষ সম্পূর্ণভাবে হ্যাচারি উৎপাদিত পোনার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু হ্যাচারিতে উৎপাদিত বিভিন্ন চাষযোগ্য মাছের পোনার কৌলিতাত্ত্বিক অবক্ষয় (genetic deterioration) ও অন্তঃপ্রজননজনিত সমস্যা (inbreeding depression) বাংলাদেশে মৎস্যচাষের এই উন্নয়নের ধারায় সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিদ্যমান মৎস্য হ্যাচারিসমূহে অন্তঃপ্রজনন সমস্যা নিরসন ও মৎস্যচাষে সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএফআরআই জেনেটিক গবেষণার মাধ্যমে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ মাছের ৫টি প্রজাতি যেমন রুই, রাজপুঁটি, গিফট তেলাপিয়া, লাল তেলাপিয়া ও কৈ মাছের উন্নত জেনেটিক জাত উদ্ভাবনে সফলতা লাভ করেছে। এই সব মাছের উন্নত জাতসমূহকে যথাক্রমে BFRI Rohu, BFRI Rajpunti, BFRI GIFT, BFRI Red Tilapia ও BFRI Koi নামে অভিহিত করা হয়েছে। নিম্নে এসব প্রজাতির বৈশিষ্ট্য ও মৎস্য উৎপাদনে এদের অবদান বর্ণনা করা হলো:

বিএফআরআই রুই মাছ

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে দীর্ঘ ৫ বছর জেনেটিক গবেষণার মাধ্যমে ২০০৯ সালে দেশীয় রুই মাছের নতুন উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে। প্রথম পর্যায়ে সংগৃহীত প্রাকৃতিক উৎসজাতসমূহের মধ্যে দ্বৈত এ্যালিল ক্রসিং (di-allele crossing) এর মাধ্যমে বেইজ পপুলেশন (base generation) উৎপাদন এবং পরবর্তীতে সিলেকটিভ ব্রিডিং (mass selection) এর মাধ্যমে এই উন্নত রুই মাছের জেনেটিক জাতের ১ম প্রজন্মের মাছ উদ্ভাবিত হয়েছে।

জাতের বৈশিষ্ট্য

স্থানীয় জাতের তুলনায় উদ্ভাবিত উন্নত রুই জাতের ১ম প্রজন্মের মাছ ১৫% অধিক উৎপাদনশীল এবং এদের গায়ের রং লালচে হওয়ায় দেখতে অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

পোনার প্রাপ্যতা

বিএফআরআই উন্নত রুই জাতের রেণু পোনা মে হতে জুলাই এবং আঙ্গুলি পোনা আগস্ট হতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি কেন্দ্রে পাওয়া যায়। প্রতি বছর হ্যাচারি মালিক/চাষিদের মাঝে ৭০ কেজি রেণু ও ৫০ হাজার পোনা বিতরণ করা হয়।

বিএফআরআই রাজপুঁটি

বিএফআরআই রাজপুঁটি জাত উন্নয়নের গবেষণা ১৯৯৭ সালে শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া থেকে সংগৃহীত প্রাকৃতিক উৎসজাত এবং বাংলাদেশের স্থানীয় জাতসমূহের মধ্যে দ্বৈত এ্যালিল ক্রসিং (di-allele crossing) এর মাধ্যমে বেইজ পপুলেশন (base generation) উৎপাদন এবং পরবর্তীতে নির্বাচিত প্রজনন পদ্ধতির মাধ্যমে ১০ম জেনারেশন উৎপাদন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এই জাত উন্নয়নে প্রাথমিকভাবে Mass Selection এবং পরবর্তীতে Family Selection পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

স্থানীয় জাতের তুলনায় উদ্ভাবিত উন্নত জাতের রাজপুঁটি ৩৫% অধিক উৎপাদনশীল। এই উন্নত জাতের মাছের গায়ের রং উজ্জ্বল রূপালী ও এদের পাখনাসমূহ লালচে বর্ণের এবং দেখতে অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

পোনার প্রাপ্যতা

বিএফআরআই উন্নত রাজপুঁটির রেণু পোনা মে হতে জুলাই এবং আঙ্গুলি পোনা আগস্ট হতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি কেন্দ্রে পাওয়া যায়। প্রতি বছর প্রায় ৬০-৭০ কেজি রেণু ও ১-২ লক্ষ পোনা হ্যাচারি মালিক/চাষিদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

বিএফআরআই গিফট তেলাপিয়া

তেলাপিয়া নাইলোটিকার গিফট জাত (GIFT) বাংলাদেশে ১৯৯৪ সালে আমদানি করার পর থেকেই বিএফআরআই এই মাছটির জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ এবং জেনেটিক সিলেকশন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে আরো উন্নত জাত উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই জাত উন্নয়ন গবেষণায় এই পর্যন্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, জেনেটিক সিলেকশন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ৬ষ্ঠ জেনারেশনে গিফট জাতকে ৩২.৬৬% অধিক উৎপাদনশীল জাতে উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে। ইনস্টিটিউটে GIFT জাতের বৃদ্ধির হার অধিক বাড়ানোর জন্য বর্তমানে Family Selection এর কলাকৌশল প্রয়োগের কর্মসূচি চলমান রয়েছে। এই তেলাপিয়া উন্নত জেনেটিক জাতটি স্থানীয় জাতের চেয়ে তুলনামূলকভাবে প্রাধান্য বিস্তারের প্রমাণ রেখেছে। গবেষকরা তাই এই উন্নত জেনেটিক জাতটিকে বিএফআরআই গিফট জাত (BFRI GIFT) হিসেবে অভিহিত করেছেন।

জাতের বৈশিষ্ট্য

সাধারণ স্থানীয় গিফট জাতের তেলাপিয়ার তুলনায় উদ্ভাবিত

উন্নত জাতের বিএফআরআই গিফট জাত ৩২.৬৬% অধিক উৎপাদনশীল, লবণাক্ত পানিতে এই জাত চাষে এর উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় না, বাঁচার হার স্থানীয় গিফট জাতের তেলাপিয়ার তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি এবং রোগ প্রতিরোধে অধিক সহনশীল।

পোনার প্রাপ্যতা

ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি কেন্দ্রে মার্চ হতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত উন্নত জাতের বিএফআরআই গিফট তেলাপিয়ার পোনা পাওয়া যায়। হ্যাচারি মালিক/চাষিদের মাঝে প্রতি বছর ৬-৮ লক্ষ পোনা বিতরণ করা হয়।

বিএফআরআই লাল তেলাপিয়া

ওয়ার্ল্ডফিস সেন্টারের সহযোগিতায় মালয়েশিয়া থেকে লাল তেলাপিয়া মাছের বিশুদ্ধ জাত আমাদের দেশে আমদানি করা হয়। মেনডেলিয়ান টেস্ট ক্রসিং পদ্ধতি অনুসরণে দেখা যায় যে, এই জাত ১০০% লাল তেলাপিয়া উৎপাদনে সক্ষম। রোটেশনাল ব্রিডিং পদ্ধতি অনুসরণ করে এই মাছের জাত উন্নয়ন গবেষণা চলমান রয়েছে।

জাতের বৈশিষ্ট্য

লাল তেলাপিয়া বিএফআরআই গিফট তেলাপিয়ার মতই দ্রুত বর্ধনশীল ও সুস্বাদু। যে কোন জলাশয়ে, খাঁচায় ও ট্যাংকে চাষ করা যায়। শহরের ক্রেতাদের কাছে লাল তেলাপিয়ার বিশেষ চাহিদা রয়েছে।

পোনার প্রাপ্যতা

ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি কেন্দ্রে মার্চ হতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত উন্নত জাতের লাল তেলাপিয়ার পোনা পাওয়া যায়। প্রতি বছর ১.০ লক্ষ পোনা হ্যাচারি মালিক/চাষিদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

উন্নত জাতের বিএফআরআই কৈ

থাই কৈ মাছ দ্রুত বর্ধনশীল এবং স্থানীয় কৈ মাছ অপেক্ষা বেশি উৎপাদনশীল হওয়ার কারণে অতি দ্রুত চাষিদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। অধিকন্তু কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এ মাছের পোনা উৎপাদন পদ্ধতি সহজতর বিধায় অনেক হ্যাচারিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কৈ মাছের পোনা উৎপাদনকারী হ্যাচারিসমূহ ব্রুডমাছ ব্যবস্থাপনার সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ না করায় পোনা উৎপাদনে সমস্যা দেখা দেয়। ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে থাইল্যান্ড থেকে কৈ মাছের উন্নত জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয়। আমদানিকৃত এই কৈ মাছ ব্রুড স্টক রিপ্লেসমেন্ট টেকনিক অবলম্বনে উন্নত জাতের পোনা উৎপাদিত হয়। পরবর্তী প্রজন্মে এই পদ্ধতি প্রয়োগে কৈ মাছের জাত উন্নয়ন গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

জাতের বৈশিষ্ট্য

জেনেটিক প্রযুক্তি প্রয়োগে উৎপাদিত এই বিএফআরআই কৈ মাছ বর্তমানে আমাদের দেশে চাষকৃত থাই কৈ এর চেয়ে প্রায় ৪০-৪৫% বেশি উৎপাদনশীল।

পোনার প্রাপ্যতা

মার্চ হতে জুলাই মাস পর্যন্ত উন্নত জাতের বিএফআরআই কৈ জাতের রেণু ও পোনা ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি কেন্দ্রে পাওয়া যায়। বিগত দুই বছরে বিভিন্ন হ্যাচারিতে ব্রুড হিসেবে ব্যবহারের জন্য ৬০-৭০ হাজার পোনা বিতরণ করা হয়।

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে উন্নত জাতের অবদান

- বাংলাদেশে চাষযোগ্য কার্পজাতীয় মাছসহ অন্যান্য মাছের মোট উৎপাদনের (৯.১২ লক্ষ মে.টন) ২৪.৮৪% (২.২৬ লক্ষ মে.টন) যোগান দিয়ে থাকে রুই মাছ। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত এই উন্নত রুইজাত অধিক উৎপাদনশীল হওয়ায় দেশব্যাপী ব্যাপক বিতরণ ও সম্প্রসারণ করা হলে দেশে প্রতি বছরে গড়ে আরো ৩৪ হাজার মে.টন বেশি রুই মাছ উৎপাদন সম্ভব হবে। বর্তমানে দেশে রাজপুঁটি মাছের উৎপাদন ৭.৩০ হাজার মে.টন, যা কার্পজাতীয় মাছের মোট উৎপাদনের ০.৮০%। জেনেটিক গবেষণায় উদ্ভাবিত উন্নত রাজপুঁটি জাত দেশব্যাপী বিতরণ ও সম্প্রসারণ করা হলে প্রতি বছর গড়ে আরো ২.৫০ হাজার মে.টন বেশি রাজপুঁটি মাছ উৎপাদন সম্ভব হবে।
- জেনেটিক জাতের গিফট তেলাপিয়া পোনা উৎপাদন, চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তারের ফলে ২০১০ সালে বাণিজ্যিক তেলাপিয়ার পোনা উৎপাদনকারী হ্যাচারির সংখ্যা ২৫০ এর অধিক এবং এই সমস্ত হ্যাচারি হতে বছরে প্রায় ৩০০ কোটি পোনা উৎপাদিত হয়ে থাকে। বাণিজ্যিকভাবে গিফট তেলাপিয়ার চাষ সম্প্রসারণের ফলে বর্তমানে তেলাপিয়ার উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১.০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে।
- বর্তমানে দেশে কৈ মাছের উৎপাদন ১.৮ হাজার মে.টন, যা মোট চাষযোগ্য মৎস্য উৎপাদনের ০.২০% মাত্র। জেনেটিক গবেষণায় উদ্ভাবিত উন্নত বিএফআরআই থাই কৈ দেশব্যাপী বিতরণ ও সম্প্রসারণ করা হলে গড়ে প্রতি বছর আরো ০.৭২ হাজার মে.টন বেশি কৈ মাছ উৎপাদন সম্ভব হবে।
- আমাদের দেশে বাণিজ্যিকভাবে লাল তেলাপিয়ার চাষ এখনও শুরু হয়নি, তা ছাড়া বর্তমানে এ মাছের গ্রহণযোগ্যতা ক্রেতাদের কাছে তেমন দেখা যায় না। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে এই মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণসহ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার

ক্ষেত্রে বিএফআরআই গিফট তেলাপিয়ার মতো লাল তেলাপিয়াও বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে বিজ্ঞানীরা আশাবাদী।

উন্নত জাতের মাছের প্রজনন ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনা

ব্রুডস্টকের জেনেটিক গুণাগুণের তারতম্যের হার হ্রাস পাওয়ার (loss of genetic variation) হাত থেকে রক্ষার জন্য কার্যকর ব্রুডস্টকের আকার (effective population size) নির্ধারণ করা সমীচীন। এ ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫০ জোড়া ব্রুড ব্যবহার করতে হবে। প্রতি জোড়া ব্রুড হতে উৎপাদিত পোনা থেকে সমান সংখ্যক পোনা নিয়ে ১ম প্রজন্মের একটি স্টক তৈরি করতে হবে। এই স্টকে প্রত্যেক ব্রুড ফ্যামিলি থেকে সমান অংশীদারিত্ব বজায় রাখা এবং প্রতি জেনারেশনে জেনেটিক গুণাগুণের মাত্রা বৃদ্ধির বিষয়টি নিশ্চিত হবে। এ ধরনের একটি প্রজনন কৌশল ও পরিকল্পনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো যত বেশি সংখ্যক ব্রুডস্টক প্রতি জেনারেশনে ব্যবহৃত হবে ঠিক সে অনুপাতে ক্রমান্বয়ে অন্তপ্রজননের মাত্রা কমে আসবে।

মাছের উন্নত জাত বিতরণ পরিকল্পনা

মাছের উন্নত জাত বিতরণের একটি কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের সহায়তা নেয়া সহায়তা নেয়া হবে যাতে করে অনেক যুগ ধরে উন্নতজাতের

সারণি ১. মাছের উন্নত জাত বিতরণ পরিকল্পনা

কার্যক্রম	দায়িত্ব ও কর্তব্য
প্রথম ধাপ * জার্মপ্লাজম উৎপাদন এবং জেনেটিক জাত উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পাদন। * স্যাটেলাইট স্টেশনসমূহে উন্নত জাতের জার্মপ্লাজম/ব্রিড বিতরণ।	* বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর রিজিওনাল স্টেশন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং মৎস্য অধিদপ্তরের পার্বতীপুর হ্যাচারি এসব দায়িত্ব পালনে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।
দ্বিতীয় ধাপ * স্যাটেলাইট স্টেশনসমূহ কর্তৃক উন্নত জাতের মাছের জার্মপ্লাজম/ব্রিড সংরক্ষণ ও নির্বাচিত ব্যক্তি মালিকানাধীন হ্যাচারিসমূহে বিতরণ। * মৎস্য বীজ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ কর্তৃক গবেষণা কেন্দ্রসমূহ থেকে কারিগরি সহায়তা গ্রহণ।	* প্রাথমিকভাবে মৎস্য অধিদপ্তরের ২০টি ব্রুড ব্যাংক স্যাটেলাইট ষ্টেশন হিসেবে কাজ করবে। * পরবর্তীতে মৎস্য অধিদপ্তরের ৯০টি মৎস্য বীজ উৎপাদন কেন্দ্র স্যাটেলাইট স্টেশন হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।
তৃতীয় ধাপ * মাল্টিপ্লাইয়ার হ্যাচারি কর্তৃক উন্নত জাতের মাছ বিতরণ। * মাছের প্রজনন পরিকল্পনা ও জেনেটিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি মাল্টিপ্লাইয়ারস হ্যাচারিসমূহ কর্তৃক গ্রহণ ও প্রয়োগ।	* নির্বাচিত ব্যক্তি মালিকানাধীন হ্যাচারিসমূহ মুখ্য পোনা উৎপাদনকারী হিসেবে মাল্টিপ্লাইয়ারসের ভূমিকা পালন করবে। * উক্ত মাল্টিপ্লাইয়ারস উন্নত মাছের জাত স্থানীয় বাণিজ্যিক হ্যাচারিতে বিতরণ করবে। * সরকার থেকে বেসরকারি হ্যাচারি সেক্টরে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হবে।

ব্রীড/ভ্যারাইটি চাষি পর্যায়ে প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যায়। টেকসই মৎস্যচাষ উন্নয়নের ক্ষেত্রেও কৃষি ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের ধারাবাহিকতায় মৎস্যচাষিদের কাছে জাত উন্নয়নের ফলাফল পৌঁছানোর জন্য ক্রমান্বয়ে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিকে মাছের পোনা উৎপাদন, পোনা সরবরাহ এবং জেনেটিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে গুণগতমান সম্পন্ন উন্নত পোনা উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সারণি-১ এবং চিত্র-১ এ উন্নত জাত উদ্ভাবন ও বিতরণ পরিকল্পনা প্রদর্শিত হলো ঃ

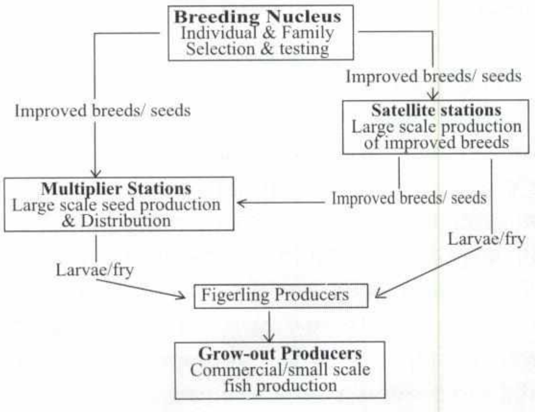

চিত্র ১: মাছের উন্নত জার্মপ্লাজম উৎপাদন ও বিতরণের লেখচিত্র

দেশে মৎস্যচাষের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি তথা গ্রামীণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য বিমোচনের স্বার্থেই প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশে মাছের ব্রুডস্টক ব্যবস্থাপনা ও উন্নত জাত বিতরণের জাতীয় প্রজনন পরিকল্পনা' বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি। এই পরিকল্পনা দেশে বিদ্যমান হ্যাচারিতে ব্রুডস্টকের জেনেটিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গুণগতমান সম্পন্ন ব্রুডজাত ও পোনা উৎপাদন এবং দেশব্যাপী প্রকৃত ব্যবহারকারীদের মধ্যে উন্নত জাত বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশে মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ
২. উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশে মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ
৩. উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশে মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ

বঙ্গোপসাগর ও উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশের ভূমিকা

প্রফেসর ড. এম. নিয়ামুল নাসের

বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ ৭১০ কিলোমিটার উপকূলীয় অঞ্চল রয়েছে। দেশের মহীসোপান (continental shelves) ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর এবং সর্বমোট ৩,৭০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে গঠিত। বঙ্গোপসাগরের নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক এলাকা (Exclusive Economic Zone) প্রায় ১,৬৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে গঠিত যা দেশের রাজনৈতিক ভূভাগ থেকে বড়। বঙ্গোপসাগরের প্রজাতিগত বৈচিত্র্য এবং মৎস্যসম্পদ আহরণ ও উৎপাদন কমে যাবার ব্যাপারটি কারো অজানা নয়। নানা ধরনের প্রভাবক (factor) এর জন্যে দায়ী। তবে জলজপ্রাণীর প্রজননক্ষেত্র (spawning ground), প্রজনন পরে নিবাস (nursing ground) ও চারণভূমির (grazing area) ধ্বংসের কারণে এ উৎপাদন কমে যাওয়ার ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত। এছাড়া পরিবেশগত পরিবর্তন ও ভূমিজ বিদূষণে অনেক জলজপ্রাণী ও মৎস্যের আবাসস্থল ধ্বংস হয়েছে। বঙ্গোপসাগর ও উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশ রক্ষা করলে প্রজাতিগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মৎস্যসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারবে।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লোনাপানির জলাশয় সংলগ্ন এক বিশেষ ধরনের প্রতিবেশ দেখা যায়, যাদের ম্যানগ্রোভ বলে। ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল সুন্দরবন। একটু লক্ষ্য করলেই সুন্দরবনের নিম্নের প্রকৃতিগত ভূমিকাগুলো দেখা যাবে:

- ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশে সৃষ্ট বনাঞ্চল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঝড় থেকে উপকূলকে রক্ষা করে।
- সুন্দরবন অনেক সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জলজ ও স্থলজ প্রাণীর আবাসস্থল।

ছবি: সুন্দরবনের উপুকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় ম্যানগ্রোভ বনায়ন

- সুন্দরবন ছাড়াও দেশের অন্যান্য অনেক ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশে সামুদ্রিক ও অন্তঃদেশীয় জলজ ও স্থলজ প্রাণী প্রজনন করে ।
- সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশে সৃষ্ট বনাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকৃতির সম্পদ যেমন: কাঠ, মধু, মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি পাওয়া যায়, যার আহরণ মানব সমাজ প্রাচীনকাল থেকে করে আসছে।
- ইকো-ট্যুরিজমের মাধ্যমে জনগণ এদের ব্যবহার করে আসছে।
- সবচেয়ে অজানা বিষয়টি হলো ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশ মানব সৃষ্ট দূষণ ও বর্জ্যের বিশুদ্ধকরণে সাহায্য করতে প্রাকৃতিক বাফার এলাকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ছবি: সুন্দরবনের ভিতরের খাঁড়িতে মাছের ডিম ছাড়ার উপযুক্ত জায়গা

ম্যানগ্রোভের প্রয়োজনীয়তা

ম্যানগ্রোভের প্রয়োজনীয়তা আজ স্বীকৃত। ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড-এ ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। নানা কারণে আজ পৃথিবীর ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এশিয়া ও আফ্রিকার কঙ্গো ব্যতীত ২৫টি দেশের উপকূলীয় এলাকায় এক সমীক্ষায় দেখা যায় দেশগুলোর ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ধ্বংসের হার প্রায় ৫৫- ৬১%, (সারণি ১)। বাংলাদেশের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ধ্বংসের হার ৭৩%। গবেষকদের মতে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণে ম্যানগ্রোভ পার্শ্ববর্তী সমুদ্রে মৎস্য উৎপাদন ২৫ থেকে ৪০% কমে যায়। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ধ্বংসে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হলো থাইল্যান্ড, ভারত ও পাকিস্তান (সারণি ১)। ফলে দেশগুলোর সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ ভীষণভাবে কমে গেছে।

সারণি ১: বাংলাদেশসহ এশিয়া ও আফ্রিকার ২৫টি দেশের উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ধ্বংসের হার (সূত্রঃ WRI, ১৯৯৬)

এশিয়া	ম্যানগ্রোভ সৃষ্ট বনাঞ্চল ধ্বংসের হার (%)	আফ্রিকা	ম্যানগ্রোভ সৃষ্ট বনাঞ্চল ধ্বংসের হার (%)
বাংলাদেশ	৭৩	এঙ্গোলা	৫০
ভারত	৮৫	ইকুইটোরিয়াল গিনি	৬০
পাকিস্তান	৭৮	কঙ্গো	০
মায়ানমার	৫৮	কেনিয়া	৭০
থাইল্যান্ড	৮৭	গ্যাবন	৫০
ভিয়েতনাম	৬২	গিনি	৬০
মালয়েশিয়া	৩২	গিনি বিসাও	৭০
ইন্দোনেশিয়া	৪৫	জিবুতি	৭০
ব্রুনাই	১৭	জায়ার	৫০
সিঙ্গাপুর	৭৬	তানজানিয়া	৬০
		দক্ষিণ আফ্রিকা	৫০
		মোজাম্বিক	৬০
		মাদাগাস্কার	৪০
		সোমালিয়া	৭০
		লাইবেরিয়া	৭০
গড় ধ্বংসের হার	এশিয়া : ৬১%		আফ্রিকা : ৫৫ %

ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশ

বিখ্যাত প্রতিবেশবিদ Odum (১৯৭১) এর মতে পৃথিবীর জলজ পরিবেশের সবচেয়ে উৎপাদনশীল এলাকায় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল জীববৈচিত্র্যের বড় উদাহরণ। ম্যানগ্রোভ এলাকা চিংড়ির প্রজননক্ষেত্র। বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য বাগদা চিংড়ি (*Penaeus monodon*)সহ বেশ কয়েকটি সামুদ্রিক চিংড়ির লার্ভার প্রাকৃতিক লালনক্ষেত্র হলো সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ এলাকা। অন্যদিকে গলদা চিংড়ি (*Macrobrachium rosenbergii*)সহ বেশ কয়টি নদীর চিংড়ির প্রাকৃতিক প্রজননত্রে হলো সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ এলাকা। বিভিন্ন সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মাছ, কাঁকড়া, কাছিম ইত্যাদি প্রাণীর প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হলো সুন্দরবন। পরিচর্যা ও চারণ এলাকা হিসেবে সুন্দরবনে লইট্টা, ইলিশ, তপসে, পাঙ্গাস, পোয়া, ভেটকি, খরসুলা, সামুদ্রিক কাছিম, লোনাপানির কুমির,

ছক ১: বাংলাদেশের কয়েকটি বাণিজ্যিক মাৎস্য প্রজাতির উপকূলীয় লোনাপানির প্রতিবেশ ব্যবহারের ধরন

ইরাবতী ডলফিন, শুশুক ইত্যাদি অনেক বাণিজ্যিক মাছ ও IUCN (২০০০) কর্তৃক ঘোষিত সঙ্কটাপন্ন প্রাণীগুলো দেখা যায়। উপকূলীয় জলাশয়ে কয়েকটি ব্যণিজ্যিক মৎস্য প্রজাতির ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশ ব্যবহারের এক ধারণা চিত্র ছক-১ এ দেয়া হল।

ম্যানগ্রোভ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ

বাংলাদেশের সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশের একটি ভাল উদাহরণ। বাংলাদেশের সুন্দরবন বিপুল জীববৈচিত্র্যের আধার। পাশাপাশি তিন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ সুন্দরবন থেকে আহরিত হয় যেমন উদ্ভিদজাত- কাঠ ও ফলমূল, বেতগাছের ছাউনি ইত্যাদি, মৎস্যজাত- মাছ, বাগদা পোনা, কাছিম, কাঁকড়া, শামুক ইত্যাদি ও মধুজাত- মধু, মোম ইত্যাদি। ২০০১ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, একজন সুন্দরবন ম্যানগ্রোভে প্রবেশকারী বিভিন্ন রকমের প্রাকৃতিক সম্পদ সুন্দরবন থেকে আহরণ করে থাকে। যেমন অনুপ্রবেশকারীর ৭২% মাছ ধরে থাকে, এছাড়াও ৫২% কাঠ সংগ্রহ করে এবং ৩২% কাঁকড়া ধরে থাকে (শামশুদ্দিন, ২০১১)। প্রতিবছর প্রায় ২০০ জন মৌয়ালী মধু ও মোম সংগ্রহ করে থাকে। ঐ গবেষণায় আরও দেখানো হয় যে, মাছ সংগ্রহকারীরা বার্ষিক গড়ে ৩৯০ মার্কিন ডলার উপার্জন করে, তবে কাঁকড়া সংগ্রহকারীরা গড়ে ২৯০ মার্কিন ডলার উপার্জন করে।

ম্যানগ্রোভ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ

বাংলাদেশের সুন্দরবন বিপুল জীববৈচিত্র্যের আধার। পাশাপাশি তিন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ সুন্দরবন থেকে আহরিত হয় যেমন উদ্ভিদজাত- কাঠ ও ফলমূল, বেতগাছের ছাউনি ইত্যাদি, মৎস্যজাত- মাছ, বাগদা পোনা, কাছিম, কাঁকড়া, শামুক ইত্যাদি ও মধুজাত- মধু, মোম ইত্যাদি। ২০০১ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, একজন সুন্দরবন ম্যানগ্রোভে প্রবেশকারী বিভিন্ন রকমের প্রাকৃতিক সম্পদ সুন্দরবন থেকে আহরণ করে থাকে। যেমন অনুপ্রবেশকারীর ৭২% মাছ ধরে থাকে, এছাড়াও ৫২% কাঠ সংগ্রহ করে এবং ৩২% কাঁকড়া ধরে থাকে (শামশুদ্দিন, ২০১১)। প্রতিবছর প্রায় ২০০ জন মৌয়ালী মধু ও মোম সংগ্রহ করে থাকে। ঐ গবেষণায় আরও দেখানো হয় যে, মাছ সংগ্রহকারীরা বার্ষিক গড়ে ৩৯০ মার্কিন ডলার উপার্জন করে, তবে কাঁকড়া সংগ্রহকারীরা গড়ে ২৯০ মার্কিন ডলার উপার্জন করে।

প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ৪৭,২০১ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ১৯টি জেলা ও ১৫১টি উপজেলা রয়েছে। তবে এর মাঝে ৪৮টি উপজেলার ২৩,৯৩৫ বর্গ কিলোমিটার লোনাপানির এলাকা। এই এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদের খতিয়ান এখনো পুরাপুরি অজানা। উপকূলীয় অঞ্চলে চর ও দ্বীপের সংখ্যা ১৩১টির মত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সাথে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়, IUCN ও WWF এক যৌথ গবেষণায় দেখতে পায় যে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের কয়েকটি চর ও দ্বীপ ছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদগুলো ব্যক্তিমালিকানায় আহরিত হয়। যার ফলে এ প্রাকৃতিক সম্পদের হিসেব সরকার কিংবা অন্য কোন সংস্থার জানা নেই। এ প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক তথ্য ও উপাত্ত বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে জানা প্রয়োজন।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ রক্ষার্থে ও ভবিষতে স্থায়িত্বশীলভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে আমাদের ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশ রক্ষা করা প্রয়োজন। সুন্দরবন ও সোনাদিয়া ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশ অঞ্চল রক্ষা করা ছাড়াও, উপকূলীয় লবণাক্ত ভূমি ও দ্বীপগুলোকে ম্যানগ্রোভ বনায়নের আওতায় এনে, সরকারি ও ব্যক্তি মালিকানায়, ১৫-২০% এলাকায় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল গড়ে তুলে, অভয়াশ্রম ঘোষণার ব্যাবস্থা নিতে হবে। ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশ ও তার প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার্থে সরকারকে উপকূলবাসীদের সাথে একত্রে উন্নয়ন উদ্যোগে কাজ করতে হবে।

সুপারিশমালা

বঙ্গোপসাগর ও উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ও উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশ রক্ষাকল্পে প্রজাতিগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মৎস্যসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে নিম্নের কৌশলগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন:

- ❑ নীতিগতভাবে উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশ রক্ষাকল্পে আইন প্রণয়ন
- ❑ উপকূলীয় অঞ্চলে কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সৃষ্টি করা
- ❑ উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশের ওপর গবেষণা পরিচালনা করা
- ❑ বাংলাদেশের উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে দেশ ও প্রতিবেশী দেশের কার্যকর নীতি ও আইনগত দিকের সমতা নিরূপণ করা
- ❑ ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশ উন্নয়নকল্পে সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ
- ❑ ম্যানগ্রোভ এলাকা ও পার্শ্ববর্তী সঙ্কটাপন্ন প্রতিবেশগত এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ
- ❑ মৎস্য অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও এতদসম্পর্কিত মন্ত্রণালয়গুলোকে সমন্বয় করে 'উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ম্যানগ্রোভ' নীতি গ্রহণ।

১. প্রফেসর, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও ফিসিং লাইসেন্স গ্রহণের আবশ্যকতা

নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ূন

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা কর্মসংস্থানের সুযোগসৃষ্টি, আমিষের যোগান বৃদ্ধি, মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, ইকোট্যুরিজম-এর সম্প্রসারণ, বহুবিধ অগ্র-পশ্চাদ শিল্প ও ব্যবসা প্রসারে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। এদেশের সামুদ্রিক উপকূল রেখা হতে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত ১.৬৬ লক্ষ বর্গকিলোমিটার একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় প্রায় ৪৭৫ প্রজাতির মাছ ও ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি রয়েছে যার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রজাতি বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এবং এর অনুবর্তীক্রমে প্রণীত সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ১৯৮৩ অনুযায়ী সামুদ্রিক ও উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিটসহ উপকূলীয় জেলাসমূহের ১৪টি জেলায় মৎস্য অধিদপ্তরীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে স্থায়ী-অস্থায়ী ফিসিং লাইসেন্স এবং মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত আদেশের ক্রমধারায় বিভিন্ন প্রকৃতির ১৭৪টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রলার সর্বোচ্চ জোয়ারে ৪০ মিটার গভীরতার উর্ধ্বে মৎস্য ও চিংড়ি আহরণে নিয়োজিত আছে। এছাড়া উপকূলীয় সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্পের কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন (জুন ২০০২) অনুযায়ী ১৪টি জেলার বিপরীতে ২১,০১৬টি যান্ত্রিক ও ২২,১২০টি অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযান মৎস্য আহরণে নিয়োজিত রয়েছে। ২০০৯-১০ সালে দেশে উৎপাদিত সর্বমোট ২৮.৯৯ লক্ষ মে.টন মাছের মধ্যে ৫.১৭ লক্ষ মে.টন অর্থাৎ প্রায় ১৮% সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মাছের অবদান। সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৯৩% আর্টিসেনাল ক্যাচ যা প্রধানত যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযান কর্তৃক আহরিত। সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী এ পর্যন্ত মাত্র ৩,৯০০টি যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানকে (১৮%) রেজিস্ট্রেশনপূর্বক ফিসিং লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে।

যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান ও এর রেজিস্ট্রেশন এবং ফিসিং লাইসেন্স প্রদান বিষয়ক বিধি বিধান

i. Merchant Shipping Ordinance 1983: Fishing vessel means a vessel of whatever size and by whatever means propelled, which is exclusively engaged in sea fishing for profit. [Provisions under Chapter 32. Section 386-400].

ii. Marine Fisheries Ordinance 1983: Fishing vessel means any vessel used for fishing or for processing carriage or storage of fish, and includes any vessel used in support of, or ancillary to, fishing operations but does not include any vessel carrying fish as part of a general cargo unless that vessel is engaged in operations in support of, or ancillary to fishing operations.[Section 2 (f)]

iii. Under Article 388 of Part IX of the Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983 all power driven sea-going fishing vessels are liable to register under the Ordinance.

iv. Fishing licence shall be issued after compliance of the provisions made under Section 17 and 18 of the Marine Fisheries Ordinance, 1983 by the Marine Fisheries Office.

যান্ত্রিক/অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও ফিসিং লাইসেন্স গ্রহণের আবশ্যকতা

- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে সহায়ক পরিকল্পনা প্রণয়নসহ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ কর্মকাণ্ডে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা;
- সরকারি নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিমালা তথা এতদ্‌সংক্রান্ত অধ্যাদেশ, বিধি-বিধান সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি;
- সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ক্যাপাসিটি নির্ধারণপূর্বক মৎস্য নৌযানের সংখ্যা সীমিতকরণের মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণ;
- সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণকালে নিরাপত্তা বিধানে নীতিনির্ধারণ প্রণয়নসহ উন্নয়ন সহযোগীদের মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা প্রাপ্তির সুযোগসৃষ্টি;
- জরুরি দুর্যোগকালীন Search and Rescue Operation অথবা বেআইনি/অবৈধ কার্যক্রমে জড়িত নৌযান সম্পর্কে Chain of responsibility নিশ্চিত করা;
- পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও সার্ভেল্যান্স পদ্ধতি বাস্তবায়নে উন্নয়ন সাধন, যেমন: বিভিন্ন শ্রেণীর মৎস্য নৌযানে মৎস্য আহরণ এলাকাভেদে বিভিন্ন রং-কোড ব্যবহারের মাধ্যমে কোস্টগার্ড কর্তৃক নিবিড় মনিটরিং করা;
- মৎস্য আহরণকারী সকল নৌযান আইনের পরিধিতে আনা হলে জলদস্যুতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে; জলদস্যুতা রোধ/দমনে বিশেষ করে স্থল এলাকায় এর সাথে সম্পৃক্ত গোষ্ঠী/ব্যক্তিকে শনাক্ত করা সহজতর হবে।
- আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান প্রতিপালনের মাধ্যমে বাণিজ্য বাধাসমূহ (export barrier) উত্তরণ, যেমন:

ইলিগ্যাল, আনরেগুলেটেড এন্ড আনরিপোর্টেড (IUU) ফিসিং প্রতিরোধে সহায়ক প্রভাবের ফলে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারিত হবে।

যান্ত্রিক/অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রদানে প্রতিবন্ধকতা

- বিভিন্ন দপ্তরের সম্পৃক্ততার কারণে যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের মালিকগণ বোট রেজিস্ট্রেশন করার ক্ষেত্রে জটিলতা পরিহারের জন্য আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।
- রেজিস্ট্রেশন চার্জ তুলনামূলকভাবে বেশি (রেজিস্ট্রেশন ফি; সার্ভে ফি; নৌকা তৈরির ভ্যাট চার্জ, আয়কর ও ভ্যাট পরিশোধ সনদপত্র; মোট উপকরণ খরচ, ইঞ্জিন ক্রয়ের রশিদ, বন্দর কর্তৃপক্ষ অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল কর্তৃপক্ষের ফি পরিশোধ রশিদ)।
- লাইসেন্স গ্রহীতা এবং রেজিস্ট্রেশন ও ফিসিং লাইসেন্সবিহীন নৌযান মালিকগণ একই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে;
- দৈনিকভিত্তিতে উপকূল অঞ্চলে মৎস্য আহরণরত স্বল্প অশ্বশক্তি (২২ এইচপি-এর কম) সম্পন্ন মৎস্য নৌযান ফিসিং লাইসেন্স গ্রহণে আগ্রহী নয়;
- যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের মালিকগণের সচেতনতা ও উৎসাহের অভাব;
- ১৪টি উপকূলীয় জেলায় যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান-এর লাইসেন্সিং কার্যক্রমের উপর যথাযথ পরিবীক্ষণের অভাব;
- সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। নৌ বাণিজ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নৌযান রেজিস্ট্রেশনের পর তথ্যাদি সামুদ্রিক দপ্তরে প্রেরণ না করা;
- স্থানীয় পর্যায়ে সম্মানিত জনপ্রতিনিধিদের অধিকতর সক্রিয়তার আবশ্যকতা;
- সংশ্লিষ্ট উপকূলীয় জেলাসমূহের মৎস্য দপ্তরে চরম জনবলসঙ্কট ও অপর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ।

পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে রেজিস্ট্রেশন ও ফিসিং লাইসেন্স প্রদানের বিধি-বিধান

- In Maldives registration and licensing of non-powered small fishing boats is exempted by constitutional provision.
- In India, fisheries within 12NM are state subject. All fishing vessels need license for fishing from the DoF of concerned state. In case of larger fishing vessels registration is carried out by MMD (Central Government) and fishing license by DoF (State Government).
- In Srilanka, registration and licensing for all fishing vessels is required. Department of Fisheries and Aquatic Resources is empowered by the Law to registered and license fishing vessels.
- All the signatories of UNCLOS has obligation to protect the resources in their EEZ and registration and licensing is a pre-condition to conserve resources.
- Trade regulations like IPOA-IUU suggest registration and licensing of all fishing vessels.

মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও ফিসিং লাইসেন্স প্রদানে করণীয়

- মৎস্য আহরণকারী যান্ত্রিক/অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও ফিসিং লাইসেন্স প্রদানের নিমিত্ত নৌ বাণিজ্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এবং সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর সংশোধনী অত্যাবশ্যক;
- উপকূলীয় মৎস্য নৌযানসমূহকে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন ও ফিসিং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতা প্রত্যার্পনসহ এ সকল নৌযানের সার্ভে অব ইন্সপেকশন সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরে কর্মরত মেরিন ইঞ্জিনিয়ার/মেট/মাস্টার ফিসারম্যান কর্তৃক সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম এর পাশাপাশি উপকূলীয় সকল জেলাসমূহের মাধ্যমে ক্রাস প্রোগ্রামের আওতায় সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা প্রয়োজন। সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারার অনুবর্তীক্রমে উপকূলীয় জেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দকে ক্ষমতা ডেলিগেট করা।
- পঁচিশ (২৫) অশ্বশক্তির কম ক্ষমতাসম্পন্ন যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন, সার্ভে অব ইন্সপেকশন ও লাইসেন্সিং কার্যক্রম মৎস্য অধিদপ্তরের সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম এর মেরিন ইঞ্জিনিয়ার ও সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদন করা;
- সারা দেশের ৭১০ কিলোমিটার উপকূলীয় এলাকায় সামুদ্রিক নৌ বাণিজ্য দপ্তরের মাত্র ২টি (চট্টগ্রাম ও খুলনা) অফিস আছে, যেখানে মাত্র ৫ জন সার্ভেয়ার কর্মরত আছেন। জনবল স্বল্পতার কারণে ১৪টি উপকূলীয় জেলায় যৌথ ক্যাম্প পরিচালনার মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পাদন করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কাজেই জনবলের সমস্যার সমাধান আবশ্যক;
- অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযান এর সরাসরি ফিসিং লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন উপকূলীয় ১৪টি জেলা মৎস্য দপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়ন ;
- সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ১৯৮৩ (সংশোধিত ১৯৯৩) অনুযায়ী ১৪টি উপকূলীয় জেলার সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, স্থানীয় কোস্টগার্ড ও প্রশাসন সহযোগে অভিযান পরিচালনা;
- সকল প্রকার যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান (উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের নিমিত্ত) নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণের ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তর/জেলা মৎস্য দপ্তর হতে পূর্বানুমতি গ্রহণের সংস্থান রাখা;

- লাইসেন্স প্রক্রিয়া সম্পাদনের সাথে নৌযানের গায়ে রেক্টো রিফ্র্যাক্টিভ কালার ব্যবহারের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স নম্বর প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা;
- মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর প্রচলিত আইনটি সকল যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের পরিবর্তে ২৫ উর্দ্ধ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন সমুদ্রগামী মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে কার্যকর করার লক্ষ্যে আইনের সংশোধন প্রয়োজন;
- যে সকল মৎস্য নৌযান বিগত কয়েক বছর ফিসিং লাইসেন্স গ্রহণ করেনি তাদের বকেয়া মওকুফ করে চলতি সময়ের ফিসিং লাইসেন্স প্রদান করা। নৌ বাণিজ্য অধিদপ্তরের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বকেয়া (জরিমানা) মওকুফের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে;
- যান্ত্রিক/অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযান এর ফিসিং লাইসেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সহযোগে সরজমিনে যৌথ ক্যাম্প পরিচালনা করা;
- বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ নেভি ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে মৎস্য অধিদপ্তরের উপকূলীয় ১৪টি জেলা মৎস্য দপ্তর-এর মাধ্যমে একটি ক্রাস প্রোগ্রামের আওতায় মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও ফিসিং লাইসেন্স ইস্যুর ব্যবস্থা
- নেয়া;
উপকূলীয় অঞ্চলের প্রতিটি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের আওতায় পরিচালিত মৎস্য নৌযান মালিকদের সংঘটিত করে সমিতির মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন ও ফিসিং লাইসেন্স

মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও ফিসিং লাইসেন্স প্রদান বাস্তবায়ন কৌশল

- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নৌ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নেভি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, নৌ বাণিজ্য অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গাইডলাইন প্রণয়ন/ পরিপত্র জারি;
- মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বংলাদেশকে আহ্বায়ক করে মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার সদস্যদের সমহারে টাস্ক ফোর্স গঠনপূর্বক মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও সমস্যা সমাধানে পরামর্শ প্রদান। জেলা মৎস্য দপ্তর জেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির উপস্থিতিতে নিয়মিত সভা করে মাঠ পর্যায়ের অগ্রগতি মনিটরিং ও কর্মসূচিকে গতিশীলকরণ।
- জেলা/উপজেলাভিত্তিক যান্ত্রিক/অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের শ্রেণীবিন্যাসকৃত ডেটাবেইজ তৈরি যা মৎস্য অধিদপ্তর-এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, নৌ মন্ত্রণালয়, নৌ বাণিজ্য অধিদপ্তর, কোস্ট গার্ডসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এক্সেস প্রদান। এছাড়া উপকূলীয় সংশ্লিষ্ট ১৪টি জেলা মৎস্য দপ্তরে উপজেলাওয়ারী সকল মৎস্য নৌযানের হালনাগাদ তথ্যাদি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা;
- ছবিসহ মৎস্য নৌযানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত স্মার্টকার্ড তৈরি, সংরক্ষণ ও বিতরণ। নৌযান মালিকের ছবিসহ কার্ডটি পাসপোর্ট আকারের ও বৈশিষ্ট্যের থাকা;
- বিষয়ভিত্তিক পোস্টার, লিফলেট প্রস্তুত ও সভা-সমাবেশ করে তা বিতরণসহ স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকাসমূহে নিয়মিত বিরতিতে গণসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রচার। এছাড়া, টিভি ফিলার/ টিভি স্পট তৈরি ও সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও প্রধান প্রধান মৎস্যজীবী গ্রামে/এলাকায় মাইকিং ও সচেতনতা সভা অনুষ্ঠান;
- মৎস্য আবতরণ কেন্দ্র ও গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য আড়তে বিলবোর্ড, সাইনবোর্ড স্থাপনসহ সংশ্লিষ্ট জেলার প্রধান প্রধান মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে নৌযান মালিকদের নিয়ে মতবিনিময়/ওরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠান।
- সামুদ্রিক সংশ্লিষ্ট ১৪টি জেলার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা তার আওতাধীন নৌ বাণিজ্য অধিদপ্তরের জনবল সহযোগে কার্যাদি সম্পন্নের ব্যবস্থা নেয়াসহ নৌ বাণিজ্য অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো অন্যান্য উপকূলীয় জেলায় সম্প্রসারণ আবশ্যক;
- সমুদ্র/উপকূলীয় অঞ্চলের প্রধান প্রধান মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড/মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা সহযোগে নিয়মিতভাবে মৎস্য নৌযান চেকিং/তদারকি জোরদারকরণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে অভিযান/ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর-এর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/কোস্ট গার্ড/বাংলাদেশ নেভি-এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে সভা অনুষ্ঠান ও অগ্রগতি পর্যালোচনা/মনিটরিং।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে সমুদ্র ও উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য আহরণরত নৌযানসমূহকে রেজিস্ট্রেশন ও ফিসিং লাইসেন্স এর আওতায় আনা অত্যাবশ্যক। এর মাধ্যমে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ রাজস্ব প্রাপ্তির পাশাপাশি জলদস্যুতা নিয়ন্ত্রণ, নৌ দুর্ঘটনা, জেলেদের নিরাপত্তা প্রদান ও মৎস্য আহরণ সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ, অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণ, প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সরকারি বিভিন্ন সহায়তা প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ সহজতর হবে। সমুদ্রের বিশাল জলসম্পদসহ এর জীববৈচিত্র্যকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করার পাশাপাশি বর্তমানে প্রায় অর্ধলক্ষ মৎস্যজীবীর জীবন ও জীবিকা নির্বাহে উন্নতর ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণ করা আশু প্রয়োজন।

পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম

মাছ সংরক্ষণ ও পরিবহনে নতুন বরফ বাক্সের প্রবর্তন : পচন রোধ ও গুণগত মান উন্নয়নে প্রভূত উন্নতি

ড. এ কে এম নওশাদ আলম

মৎস্যজীবী, মাছ ব্যবসায়ী বা মাছ পরিবহনকারীদের অজ্ঞতা, অবহেলা আর উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে বাংলাদেশে মাছ ধরার পর থেকে বাজারজাতকরণের ধাপে ধাপে বিপুল পরিমাণ মাছ পচে নষ্ট হয়ে যায়। ২০০৩ সালে এফএও এর অর্থায়নে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত 'উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের জীবিকার নিরাপত্তার জন্য ক্ষমতায়ন (ইসিএফসি) প্রকল্প' এর গবেষণায় দেখা যায় যে ধরার পর থেকে ভোক্তার হাতে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত মাছের গুণাগুণ প্রায় ২৫ থেকে ২৮ শতাংশ বিভিন্ন কারণে নষ্ট হয়ে যায়। সরকারি হিসেবে দেশের বাৎসরিক মাছ উৎপাদন প্রায় ২৯ লক্ষ মে.টন। যথাযথ পরিচর্যার অভাবে এর প্রায় চার ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৭ লক্ষ মে.টন মাছ খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যায়। প্রতি কেজি মাছের মূল্য ন্যূনতম ১৫০.০০ টাকা করে ধরলেও বছরে প্রায় ১০,৫০০ কোটি টাকার ক্ষতি বা লোকসান হয়। বাংলাদেশের মতো একটি গরিব দেশের জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ও জনস্বাস্থ্যের জন্য এটা একটা বিরাট ক্ষতি। তাছাড়া গরিব মৎস্যজীবী, মাছ চাষি ও মাছ ব্যবসায়ীদের জন্যও এটি একটি মারাত্মক অর্থনৈতিক লোকসানের কারণ। মাছের এ বিপুল পরিমাণ ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য ধরার পর থেকে ভোক্তার হাতে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত মাছকে যথাযথভাবে পরিচর্যা করা দরকার। এ জন্য চাই মৎস্যজীবী, মাছ চাষি, মাছ ব্যবসায়ী, পরিবহনকারী, আড়ৎদার, ফড়িয়া, পাইকার, খুচরা বিক্রেতা, ভোক্তাসহ সকলের ব্যাপক সচেতনতা, যাতে সকলে মিলে সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে মাছকে ভোক্তার টেবিলে তুলে আনা যায়। মাছের সঠিক পরিচর্যার জন্য চাই আদর্শ সংরক্ষণ ব্যবস্থা। ধরার পরপর মাছকে যথোপযুক্ত বরফ বাক্সে রেখে নিয়ম অনুযায়ী বরফ দিলে মাছের আহরণোত্তর ক্ষতি প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব। সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সঠিক বরফ বাক্সের ব্যবস্থা করা গেলে বাৎসরিক প্রায় ৭ থেকে ১০ হাজার কোটি টাকার পুষ্টিগুণ সম্পন্ন আমিষ খাদ্যের যোগান হয়। গরিব মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষি ও ব্যবসায়ীগণও অনুরূপভাবে লাভবান হতে পারে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০০১ সালে এফএও-এর অর্থায়নে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ইসিএফসি প্রকল্পের সহায়তায় কক্সবাজার শহর ও আশেপাশের মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ শুরু করা হয়। পাশাপাশি মৎস্যজীবী ও মাছ ব্যবসায়ীদের সম্পৃক্ত করে মাছ পরিবহন ও সংরক্ষণের জন্য দেশীয় বস্তু দিয়ে তৈরি কয়েকটি আদর্শ ও ব্যয়-সাশ্রয়ী বরফ-বাক্স প্রবর্তন করা হয়।

প্রযুক্তি ছড়িয়ে পড়ার ইতিহাস

মাছকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করা, বিশেষত দিনের শেষে অবিক্রিত মাছ বরফ বাক্সে সংরক্ষণ করে পরের দিন পূর্বেকার তাজা মাছের সমান মূল্যে বিক্রি করার সুবিধা অনুধাবন করার মাধ্যমে মৎস্যজীবী ও মাছ ব্যবসায়ীদের মাঝে ব্যাপক সচেনতার সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে কক্সবাজারের মাছ বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের নিকট নতুন বরফ বাক্স দারুণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। অল্পদিনের মধ্যেই শহরের বড় বাজার ও বাহারছড়া বাজারের সকল মাছ বিক্রেতাগণ নিজ খরচে নতুন বরফ বাক্স তৈরি করে ব্যবহার করতে থাকেন। ২০০২ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসের মধ্যে কক্সবাজার জেলার প্রায় সকল মাছের বাজার ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বরফ বাক্সটি ছড়িয়ে পরে। ইসিএফসি প্রকল্পের উদ্যোগে ও প্রশিক্ষণে কক্সবাজার শহরের এন্ডারসন রোডে নতুন বরফ বাক্স তৈরি ও বাজারজাতকরণের বেশ কয়েকজন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়। বাক্সটি তৈরির পদ্ধতি খুব সহজ। দেশীয় সহজলভ্য বস্তু দিয়ে তৈরি বলে এটি বেশ সস্তা এবং হালকা ও সহজে পরিবহনযোগ্য। ইসিএফসি প্রকল্পটি চলমান থাকে ৬ বছর। তবে মাছ পরিবহণ ও অবিক্রিত মাছ বরফে সংরক্ষণ করে পরের দিনগুলিতে বিক্রির জন্য নতুন বরফ বাক্সের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়তে থাকে । কক্সবাজার থেকে শুরু হলেও এ সহজ ও টেকসই প্রযুক্তিটি চট্টগ্রাম, ঢাকা, যশোর, খুলনা, সিলেট, ময়মনসিংহসহ দেশের প্রধান প্রধান মাছ উৎপাদন ও ব্যবসা অঞ্চলে দ্রুত ছড়িয়ে পরে। ২০০৬ সালের মধ্যে সকল মেট্রোপলিটন শহরের মাছ বাজারগুলোতে মাছ বিক্রেতাদের পেছনে এক বা একাধিক বরফ বাক্সের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে লেখক কর্তৃক বিএফআরএফ এর অর্থায়নে পরিচালিত 'Quality improvement of exportable fish and prawn in Kulierchar through participatory stakeholder-based approach' ডিএফআইডি-এর অর্থায়নে পরিচালিত 'Promoting sustainable coastal aquaculture in Bangladesh (PROSCAB)' এবং এফএও-এর অর্থায়নে পরিচালিত 'Post-harvest loss reduction in fisheries in Bangladesh: a way forward to food security' ইত্যাদি বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে মাছের আহরণোত্তর পরিচর্যার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও নতুন বরফ বাক্সগুলোর উন্নয়ন ও জনপ্রিয় করার কাজ অব্যাহত রাখা হয়। এরই মধ্যে অভ্যন্তরীণ বাজারে সরবরাহকৃত মাছের গুণগতমান সঠিক রাখার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর মৎস্য ও পশু খাদ্য আইন-২০১০ প্রবর্তন করেন। তারই ধারাবাহিকতায় আজ ২০১১ সালে এসে দেখা যায় দেশের প্রায় সকল মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, আড়ৎ বা মাছ বাজারে বরফ বাক্সের ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। পাশাপাশি জেলে ও মাছ ব্যাবসায়ীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে দ্রুত ভঙ্গুর হলেও সস্তা ও সহজলভ্য ককসীটের তৈরি বাক্সেরও ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দূর-দূরান্তে মাছ পরিবহনের চিত্রটিও অত্যন্ত করুন। দূর-দূরান্তে মাছ পরিবহনের জন্য সাধারণত বড় বড় বাঁশের ঝুড়ি ব্যবহার করা হয়। ২-৩ মন মাছ ধরে এই রকম একটি বাঁশের ঝুড়ির চারিদিকে পলিথিন জড়িয়ে

উঁচু করে ৪-৫ মণ মাছ রেখে নাম-মাত্র বরফ দিয়ে পর পর দু'টি ঝুড়ি একটির ওপর আর একটি বসিয়ে ট্রাকে মাছ পরিবহন করা হয়। এভাবে মাছ পরিবহন করার ফলে উপরের ঝুড়ি ও মাছের চাপে নিচের ঝুড়ির মাছ পচে নষ্ট হয়ে যায়।

ছবি: প্রচলিত পদ্ধতিতে বাঁশের ঝুড়িতে মাছ পরিবহন

২০০৩ সালে লেখক সম্পাদিত একটি গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে এর ব্যাপকতা অনুধাবন করা যায়। দাউদকান্দি প্লাবনভূমি মৎস্য প্রকল্পের মাছ একটির ওপর আর একটি বসানো পরপর ২টি বাঁশের ঝুড়িতে রেখে ট্রাকে পরিবহন করে চট্টগ্রামে পৌঁছতে পৌঁছতে শতকরা ২৭ ভাগ মাছ পচে নষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে প্রকল্পের মাছ চাষিগণ ৩০ শতাংশ মূল্য কম পেয়েছেন। প্লাবনভূমির মাছ চাষিদের অনভিপ্রেত অত্যধিক পচনের হার কমিয়ে এনে ট্রাকে কার্যকরভাবে মাছ পরিবহনের জন্য লেখক একটি অপেক্ষাকৃত বড় ও ঘাতসহ বরফ বাক্স প্রবর্তন করেন যা কয়েক বছরের ব্যবধানে মৎস্য পরিবহনকারী, ব্যবসায়ী ও আড়ৎদারদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

ছবি: মাছ বিক্রেতার পিছনে বরফ বাক্সে মাছ সংরক্ষণ

২০০১ সালে ইসিএফসি প্রকল্পের মাধ্যমে মাছ বিক্রেতাদের সংগঠিত করে মাছ ও বরফের ব্লক সংরক্ষণের জন্য ভাগাভাগি করে ব্যবহারের নিমিত্ত একটি বড় আকারের বরফ বাক্স প্রবর্তন করা হয়- যা তখন 'কমিউনিটি বরফ বাক্স' বলে নামকরণ করা হয়। পরবর্তীকালে উক্ত কমিউনিটি বরফ বাক্সের ডিজাইনে পরিবর্তন এনে ট্রাকে মাছ পরিবহন উপযোগী করা হয়। এ ছাড়াও অবিক্রিত মাছ সংরক্ষণ বা ট্রাকে মাছ পরিবহনের একটি কার্যকর বরফ বাক্সের প্রচলনের জন্য আরো অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে উল্লেখ করার মতো রয়েছে 'বে অব বেঙ্গল' প্রোগ্রামের পরিচালক ড. যুবরাজ সিং যাদব এর কাছ থেকে ফাইবার রি-ইনফোর্সড প্লাস্টিক (এফআরবি) এর তৈরি বরফ বাক্স উপহার হিসেবে এনে দেশীয় প্রযুক্তিতে সস্তায় দেশীয়করণ করা চেষ্টা করা। কিন্তু উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ায় সে সকল কার্যক্রম সফলতা লাভ করেনি।

বরফ বাক্সের ডিজাইন ও নির্মাণ কৌশল

১. অবিক্রিত মাছ সংরক্ষণ ও স্থানীয়ভাবে পরিবহনের জন্য বরফ বাক্স

এটি একটি অপেক্ষাকৃত ছোট বরফ বাক্স। এতে বরফসহ প্রায় ৪০-৫০ কেজি মাছ ধরে। ৩০ x ২৪ x ১৮ ইঞ্চি আকারের বাক্সটির বাইরে ও ভিতরে দেয়াল জিআই শীট দিয়ে তৈরি। তাপ-অপরিবাহী করার জন্য বাইরে ও ভিতরের দেয়ালের মাঝখানে ১ ইঞ্চি পুরু ককশীট বসানো। উপরের ঢাকনাটিও একইভাবে তৈরি। বরফগলা পানি বের হয়ে যাওয়ার জন্য বাক্সটির পার্শ্বদেয়ালের নিচের দিকে একটি ট্যাপ লাগোনো রয়েছে।

ছবি: মাছ সংরক্ষণ ও পরিবহনের জন্য বরফ বাক্স

২. ট্রাকে মাছ পরিবহনের জন্য বরফ বাক্স

কমিউনিটি বরফ বাক্সের প্রাথমিক ডিজাইনে মাছের বাজারে রেখে মাছ সংরক্ষণের জন্য ৬' x ৩' x ৩' আকারের বরফ বাক্সের ভেতর ৪ থেকে ৫টি চেম্বার করে ৪-৫ জন মাছ বিক্রেতাকে মাছ ও বরফ সংরক্ষণ করতে দেয়া হয়। পরবর্তীতে দূর-দূরান্তে মাছ পরিবহনের জন্য উক্ত কমিউনিটি বরফ বক্সটির আকার ছোট করে (৩' x ২.৫' x ২') এবং চারদিকে লোহার অ্যাঙ্গেল-বার ও ফাট-বার এর ফ্রেম বসিয়ে ট্রাকে মাছ পরিবহনের উপযোগী করে প্রবর্তন করা হয়। বাক্স তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে প্লেইনসীট, অ্যাঙ্গেল, ফাটবার,

ছবি: ট্রাকে মাছ পরিবহনের জন্য বরফ বাক্স

নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি

দেশের প্রধান প্রধান অবতরণ কেন্দ্র, আড়ৎ বা মাছের বাজার থেকে বেশির ভাগ মাছ এভাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর বা উত্তরবঙ্গে পরিবহন করা হচ্ছে। ঢাকার কাওরান বাজার বা যাত্রাবাড়ী মাছের আড়তে গেলে এই চিত্রটি সহজেই অনুধাবন করা যাবে। মাছ সংরক্ষণ ও পরিবহনে ব্যবহৃত এ বরফ বাক্সগুলো তৈরির জন্য দেশব্যাপী অসংখ্য ছোট-বড় উদ্যোক্তা ও নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। এখন কক্সবাজারের এন্ডারসন রোড, ময়মনসিংহের শম্ভুগঞ্জ ও মোহনগঞ্জ, কিশোরগঞ্জের ভৈরব, ঢাকার রামপুরা ও যাত্রাবাড়ী, গোপালগঞ্জ শহর ও সাতক্ষীরায় বাণিজ্যিকভাবে এ সকল বরফ বাক্স তৈরি হচ্ছে। বহু বেকার লোকজন এতে আয়ের পথ খুঁজে পেয়েছেন। বিভিন্ন সাইজের বরফ বাক্সের বিক্রয়মূল্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক	বরফ বাক্সের ধরন	বাক্সের আকার (ইঞ্চি)	মূল্য (টাকা)
ক.	অবিক্রিত মাছ সংরক্ষণ ও স্থানীয়ভাবে পরিবহন	৩০ x ২৪ x ১৮	২,৫০০.০০-৩,৫০০.০০
খ.	ট্রাকে মাছ পরিবহন	৩৮ x ২৮ x ২৫	৬,৫০০.০০-৭,০০০.০০
		৩৬ x ২৪ x ২২	৬,০০০.০০-৬,৫০০.০০
		২৪ x ১৮ x ১৮	৩,৫০০.০০-৪,৫০০.০০

শিকল, কাঠ, ককসীট, আংটা, কব্জা, রং, রশি, ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। ভিতরে-বাইরে জিআই সীট দিয়ে আচ্ছাদিত কর্কসীটের বাক্সটি ঘাতসহ ও টেকসই করার জন্য এর বাইরের সকল প্রান্ত রেখা বরাবর লোহার অ্যাঙ্গেল ও ফাট বার বসিয়ে দেয়া হয় যাতে ট্রাকে উঠানো-নামানো ও পরিবহনের সময় বরফ বাক্স বা বাক্সের ভিতরের মাছ আঘাত না পায় বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। মাছ পরিবহনের এই নতুন পদ্ধতিটি এখন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। প্রয়োজনের তাগিদে ও সুবিধামতো মাছ পরিবহনকারীগণ ডিজাইনে কিছুটা পরিবর্তন করে নিয়েছেন। ময়মনসিংহ-নেত্রকোণা অঞ্চলে ব্যবহৃত হচ্ছে ৩৬ x ২৪ x ২০ ইঞ্চি সাইজের বাক্স। আবার সাতক্ষীরা অঞ্চলে ৩৮ x ২৮ x ২৫ ইঞ্চি, ভৈরব অঞ্চলে ৩৬ x ২৪ x ২২ ইঞ্চি বা ২৪ x ১৮ x ১৮ ইঞ্চি সাইজের বাক্স ব্যবহৃত হচ্ছে। বড় বাক্সে শীতকালে বরফসহ ২৫০-২৮০ কেজি এবং গরমকালে বরফসহ ২০০-২২০ কেজি মাছ পরিবহন করা যায়। ছোট বাক্সে শীতকালে বরফসহ ১২০-১৫০ কেজি এবং গরমকালে ৮০-১২০ কেজি মাছ পরিবহন করা হয়।

দেশীয় সহজলভ্য সস্তা বস্তু দিয়ে তৈরি বলে টেকসই বরফ বাক্সগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করার ফলে দেশে মাছের পচন অনেক কমে গিয়ে মাছের গুণাগুণ যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। বরফ বাক্সের ব্যবহার ও উন্নত পরিচর্যার ফলে মাছের আহরণোত্তর পচন ২৮ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশে নেমে এসেছে বলে অতি সম্প্রতি এফএও-এর অর্থায়নে পরিচালিত 'Post-harvest Loss Reduction in Fisheries in Bangladesh: A Way Forward to Food Security' শীর্ষক প্রকল্পের এক গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে। গত এক দশকে মাছের আহরণোত্তর ক্ষতি প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কমে আসাতে এখন প্রতি বছর বহু কোটি টাকা সাশ্রয় হচ্ছে। জিডিপিতে সরাসরি ভূমিকা রাখার মাধ্যমে গরিব মাছ ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াজাতকারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থারও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে মাছ সংরক্ষণ ও পরিবহনের এই প্রযুক্তিটি দেশে আরো ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়ে মাছের আহরণোত্তর ক্ষতি আরো কমে গিয়ে জনগণের আমিষের চাহিদা বহুলাংশে মেটাতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

অধ্যাপক, মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ, বাকৃবি

গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিসেস বা উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন

হাবিবুর রহমান খোন্দকার

খামারে উৎপাদিত চিংড়ির গুণগতমান ও নিরাপত্তার বিষয়টি পোনা উৎপাদনকারী, চাষি, বিক্রেতা, প্রক্রিয়াকরণকারী বা রপ্তানিকারক এবং বিদেশি ক্রেতা, কারো একক দায়িত্ব নয়। গুণগতমান এবং নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক উৎপাদন থেকে শুরু করে বিদেশি ক্রেতার নিকট রপ্তানি করা পর্যন্ত স্ব স্ব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে কমবেশি দায়িত্ব পালন করতে হয়। চিংড়ি পোনা উৎপাদন, চিংড়ি চাষ, চিংড়ি ধরা, প্রক্রিয়াকরণের জন্য বিপণন, পরিবহন, রপ্তানির জন্য প্রক্রিয়াকরণ এবং বিদেশি ক্রেতার নিকট প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানিকরণ সকল ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ যেমন প্রয়োজন তেমনি ধাপগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে নিয়ন্ত্রণের ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিংড়ির গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই প্রক্রিয়াকরণকারীকে যেমন জানতে হবে চাষের ক্ষেত্রে চাষি 'উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন' বা 'গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিসেস' মেনেছেন কিনা তেমনি তাকে এটিও জানতে হবে যে, বিক্রেতা 'ভাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অবস্থা' বা 'গুড হাইজিন প্রাকটিসেস' অনুসরণ করে আহরণোত্তর পরিচর্যার কাজটি সম্পন্ন করেছেন কিনা।

বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে আহরণোত্তর পরিচর্যার বিষয়টি বেশ আগে থেকেই গুরুত্ব পেয়ে আসছে। তবে কেবলমাত্র আহরণোত্তর পরিচর্যার উপর গুরুত্ব দিলেই চিংড়ির গুণগতমান ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান আদৌ সম্ভব নয়। আহরণোত্তর পরিচর্যার পাশাপাশি প্রয়োজন চাষ পর্যায়ে 'গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিসেস' বা 'উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন' অনুসরণ করে নিরাপদ চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিত করা।

'গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিস' আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি বিষয়, ইউরোপ ও আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এটি সংশ্লিষ্ট আইনের অংশ। আমাদের দেশে এটি এখনো বাধ্যতামূলক না হলেও আশা করা যায় খুব শীঘ্রই আইনের আওতায় এটিকে বাধ্যতামূলক করা যাবে। ইতোমধ্যে ট্রেসিবিলিটি বাস্তবায়নের জন্য খামারসমূহ লাইসেন্স-এর আওতায় আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিস (GAP) এবং হ্যাসাপ (HACCP) বাস্তবায়ন

'হ্যাসাপ ইন অ্যাকোয়াকালচার' একটি পৃথক বিষয় হলেও গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিস এর গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। 'হ্যাসাপ বা হ্যাজার্ড এনালাইসিস ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট' পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের একটি আধুনিক পদ্ধতি। এটি একটি বিজ্ঞানভিত্তিক, যুক্তিসঙ্গত, সুসংগঠিত, নিখুঁত এবং প্রোঅ্যাক্টিভ পদ্ধতি। ষাটের দশকের শুরুতে মহাকাশ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী নভোচারীদের জন্য শতকরা একশত ভাগ ত্রুটিমুক্ত খাদ্য তৈরির জন্য এ পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে পণ্যের মান নিশ্চিতকরণে এ পদ্ধতির বহুমাত্রিক ব্যবহার কার্যকর প্রমাণিত হওয়ায় সমগ্র বিশ্বে এটি একটি ইউনিভার্সাল পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে অ্যাকোয়াকালচারেও এটিকে সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। খামারে উৎপাদিত চিংড়ির গুণগতমান ও খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষতিকর জীবাণু, অ্যান্টিবায়োটিকের অবশেষ (রেসিডিউ), অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং অপদ্রব্যাদির সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ইতোমধ্যে চাষ পর্যায়ে হ্যাসাপ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর ফলে চিংড়ি উৎপাদনকারী অনেক দেশ চিংড়ির আন্তর্জাতিক বাজারে স্ব স্ব পণ্যের ভাবমূর্তি উন্নয়নের মাধ্যমে সুবিধাজনক ও অগ্রসর অবস্থানে রয়েছে।

হ্যাসাপ বাস্তবায়নের জন্য মূল ভিত্তি হিসেবে প্রথমেই কিছু 'পূর্বশর্ত কর্মসূচি' বা 'প্রিরিকুইজিট প্রোগ্রামস্' পালন করতে হয়, যেমন- 'গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্রাকটিসেস (GMP)' বা 'স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরস (SOP)' এবং 'স্যানিটেশান স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরস্ (SSOP)', ইত্যাদি। একইভাবে চিংড়ির চাষ পর্যায়ে হ্যাসাপ বাস্তবায়নের জন্য 'গুড অ্যাকুয়াকালচার প্রাকটিসেস' (GAP) একটি পূর্বশর্ত। অর্থাৎ চাষ পর্যায়ে হ্যাসাপ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হলে আগে থেকেই সেখানে 'গুড এ্যাকোয়াকাল্চার প্রাকটিসেস' প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। একটি গ্রহণযোগ্য মানের 'গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিসেস' অবলম্বন না করলে খামারের স্যানিটেশনের অবস্থা স্বাভাবিকভাবেই নিম্নমানের থাকে এবং এক্ষেত্রে নিরাপত্তা ঝুঁকির মাত্রাও বেড়ে যায়। এ অবস্থায় খামারে হ্যাসাপ পদ্ধতি বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে, গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিসেস সম্প্রসারিত হলে খামারের স্যানিটেশনের উন্নয়ন ঘটে এবং তা একটি সন্তোষজনক মাত্রায় থাকে। ফলশ্রুতিতে খামারের নিরাপত্তা ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং তা গ্রহণযোগ্য মান অর্জন করা সম্ভব হয়। সুতরাং চাষ পর্যায়ে 'হ্যাসাপ পদ্ধতি' বাস্তবায়ন করতে হলে পূর্বেই সেখানে 'গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিস' এর একটি গ্রহণযোগ্য অবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

গুড অ্যাকুয়াকালচার প্রাকটিসেস বা উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন

গুড অ্যাকুয়াকালচার প্রাকটিসেস বা উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন চাষ পর্যায়ে অনুসরণীয় সে সমস্ত কার্যাবলী যা

সঠিকভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা হলে পণ্য হিসেবে চিংড়ি বা সাদামাছের গুণগত মান এবং খাদ্যনিরাপত্তার (food safety) বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ বা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। চাষের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নিয়মগুলিকেই 'গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিসেস (GAP)' বলা হয়।

চিংড়ি চাষে অনুসরণীয় গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিসেস বা উত্তম চাষ অনুশীলনে করণীয় বিষয়সমূহ:

১. খামার পরিচালনায় সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়সমূহ

ক. সামাজিক বিষয়সমূহ

জমির মালিকানা নিশ্চিতকরণ ও প্রচলিত আইনসমূহ মেনে চলা: খামার মালিক দেশে প্রচলিত আইনসমূহ যথাযথভাবে মেনে চলবেন এবং পরিবেশ সংক্রান্ত নিয়ম ও বিধিসমূহ মানবেন। খামারে সকল বৈধ দলিলাদি ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করতে হবে, যেমন:-

- ❑ জমির মালিকানা ;
- ❑ ট্রেড লাইসেন্স;
- ❑ জমির খাজনা পরিশোধ রশিদ;
- ❑ পরিবেশ সংক্রান্ত লাইসেন্স;
- ❑ পানি ব্যবহারের অধিকার;
- ❑ অবকাঠামো নির্মাণের বৈধতা;
- ❑ খামার পরিচালনার বৈধতা (লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন) ইত্যাদি।

খ. স্থানীয় জনগণের সুবিধা সংরক্ষণ

স্থানীয় জনগণের যাতায়াত সুযোগসহ অন্যান্য সুবিধাদি সংরক্ষণ করতে হবে এবং অন্য ফসলের ক্ষতি না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

গ. কর্মচারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং দেশে প্রচলিত শ্রম আইন মেনে চলা

শিশু শ্রমিক ব্যবহার থেকে বিরত থাকা। শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং তাদের বাসস্থান ও স্বাস্থ্য সুবিধাদি নিশ্চিত করা।

ঘ. পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ

- ❑ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা। জলজ জীববৈচিত্র্য (aquatic biodiversity) সংরক্ষণ করা। ক্ষতিকর বর্জ্যপানি নদী-নালা বা খালে শোধন না করে বের না করা।
- ❑ খামারের কালো মাটি ও বর্জ্য শোধন না করে বাইরে না ফেল। এ মাটি পুকুর পাড়ে গাছের সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
- ❑ খামার পরিচালনার ফলে মাটির লবণাক্ততা যেন বৃদ্ধি না পায় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া। খামার পরিচালনার সময় যেন পার্শ্ববর্তী খামারের ফসলের কোনো ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া।
- ❑ খামারে ব্যবহারের জন্য জ্বালানী, কেমিক্যালস, সার, ঔষধ, খাবার ইত্যাদি নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে যেন এর দ্বারা কোনরূপ দূষণ না হয়। খামারে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও আবর্জনা নিরাপদ স্থানে ফেলতে হবে এবং তা নষ্ট করার ব্যবস্থা নিতে হবে যেন এর ফলে পরিবেশের কোনরূপ ক্ষতি না হয়।

২. খামারের স্থান নির্বাচন

চাষের জন্য জলাশয় নির্বাচনের সময় চাষিকে সংশ্লিষ্ট জমির পূর্বের ব্যবহার এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। জমির পূর্বের ব্যবহার মাটির রাসায়নিক গুণাগুণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চিংড়ির খামারটি যদি এমন জমির উপর তৈরি করা হয় যেটি পূর্বে কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, তাহলে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, ঐ জমিতে বিভিন্ন কীটনাশক, প্লান্ট হরমোন ও আগাছানাশকের অবশেষ (residue) থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সমস্ত ক্ষতিকর রাসায়নিকের অবশেষ চিংড়ি উৎপাদনে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে এবং উৎপাদিত চিংড়িকে ভোক্তার স্বাস্থ্যের জন্য বিপদজনক করে তুলতে পারে। একইভাবে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, পশু-পাখির বিচরণ, বা বায়ু-বাহিত দূষণের (যেমন- রাসায়নিয়ক স্প্রে) মত কার্যক্রমের মাধ্যমে সৃষ্ট পরিবেশও চিংড়ি খামারের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। যদি কোন চিংড়ি খামার কৃষিতে, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির খামার, জনবসতি এলাকা বা বস্তি এলাকার কাছে হয় তা হলে চাষিকে চিংড়ি খামারে এর ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও মনিটর করে স্থান নির্বাচনের বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। রাসায়নিক দূষণে দূষিত পানিতে উৎপাদিত চিংড়ি ভোক্তার স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হতে পারে।

৩. চাষে ব্যবহৃত পানি

চিংড়ি খামারের পানির মান চিংড়ির স্বাস্থ্য, গুণগতমান এবং খাদ্যনিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দূষিত পানি যেমন চিংড়ির মৃত্যুর কারণ হয় তেমনি তা চিংড়ির বৃদ্ধিতেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দূষিত পানিতে উৎপাদিত চিংড়ির দেহে ক্ষতিকর রাসায়নিকের অবশেষ (residue) থাকে ও ক্ষতিকর জীবাণুর দূষণ ঘটায় যা ভোক্তার স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হ্যাজার্ড হিসাবে দেখা দেয়। পানি সরবরাহ উৎস দূষিত হলে খামারের পানিও দূষিত হবে। চিংড়ি খামারের স্থান নির্বাচনের সময় তাই ভালভাবে পানির উৎসের গুণাগুণের বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। পানি দূষণের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো হলো- ভারী ধাতুসমূহ (heavy metals), বিভিন্ন কীটনাশক (pesticide/ insecticide) এবং কৃষি-রাসায়নিক দ্রব্য (agro-chemcals), শিল্প কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য এবং কলিফর্ম ও *Salmonella* জীবাণু। ভারী ধাতুগুলির একাধিক উৎসের মধ্যে প্রকৃতিই এগুলোর একটি সাধারণ উৎস। ভারী ধাতুসমূহের অন্যান্য উৎসের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক উৎসটি

হলো শিল্প কারখানা (যেমন- ট্যানারি, কাগজের কল, ইত্যাদি)। কৃষিতেও কিছু কিছু ভারী ধাতুর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং চিংড়ি খামারের আশপাশ সার্ভে করলেই জানা যাবে খামারের পানিতে প্রকৃতপক্ষেই কোন ভারী ধাতুর দূষণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা।

৪. পারিপার্শ্বিক পরিবেশ

চিংড়ি খামারের আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ভাল অবস্থায় রাখলে সরাসরি আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে যেমন রক্ষা পাওয়া যায় তেমনি নিরাপত্তা সম্পর্কিত অনেক বিপদের সম্ভাবনাকে কমিয়ে আনা যায়। জলাশয়ের চারদিকে পরিকল্পিত উপায়ে গাছ লাগালে (যেমন-ম্যানগ্রোভ) ভূমিক্ষয় বা ভূমিধ্বস রোধ করার পাশাপাশি জলাশয়ে রাসায়নিক ও জীবাণুঘটিত দূষণকেও রোধ করা যায়। এ ছাড়া জলাশয় এবং আশপাশ থেকে ঝোপঝাড়, অতিরিক্ত জলজ আগাছা এবং ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার রাখা জরুরি। ইঁদুর, ছুঁচো, বেজি, ভোঁদড়, বিভিন্ন পাখি এবং অন্যান্য বন্যপ্রাণী বিভিন্ন ক্ষতিকর জীবাণু (যেমন-*Salmonella*, *E. coli* ইত্যাদি) সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ উৎস। সরাসরি জলাশয়ে বা জলাশয়ের আশপাশে অথবা চিংড়ির খাবার তৈরি বা সংরক্ষণ করা হয় এমন স্থানের নিকটে মলমূত্র ত্যাগ করা হলে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর জীবাণু পানিতে বা খাবারে মিশে উৎপাদিত চিংড়িতে সংক্রমিত হয়। খামারে উৎপাদিত চিংড়ির এই সংক্রমণ আহরণোত্তর পরিচর্যা ও প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন ধাপের মধ্যদিয়ে ভোক্তার নিকট পৌঁছায় এবং ভোক্তার স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হয়। ইঁদুর জাতীয় প্রাণী অনেকগুলো রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর বাহক, খাদ্য তৈরি, প্রস্তুত এবং সংরক্ষণ এলাকায় এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৫. স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস/হাইজিন প্রাকটিস

চিংড়ি খামারে স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস বলতে মূলত মানুষের মলমূত্র, আবর্জনা পচন ও অন্যান্য ক্ষতিকর কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু নিয়ন্ত্রণ বা পশুপাখির মল ও বর্জ্যের সার হিসেবে ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করা বুঝায়। স্তন্যপায়ী বা উষ্ণরক্তের প্রাণীর বর্জ্য বা মল মারাত্মক রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু বহন করে যা চিংড়ির খামারে বিস্তার লাভ করতে পারে। চিংড়ি খামার ও জলাশয় সংলগ্ন এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস মেনে চললে পানিতে মলমূত্রের দূষণকে ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা সম্ভব। কোন অবস্থাতেই পুকুরের পানিতে, পাড়ে, পুকুর সংলগ্ন এলাকায়, পানির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয় এমন সব জলাশয়ে (যেমন- নদী, খাল, ইত্যাদি) মলমূত্র ত্যাগ করতে দেয়া যাবেনা। মলমূত্র ত্যাগের জন্য খামার এবং পানির উৎস থেকে নিরাপদ দূরত্বে জলাবদ্ধ পায়খানা (স্যানিটারি ল্যাট্রিন) নির্মাণ করতে হবে। পায়খানাগুলোকে সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে যেন মলাধার থেকে দূষিত তরল পদার্থ কোনভাবেই চাষ এলাকায় চুইয়ে না পড়ে। মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী ও উষ্ণরক্তের প্রাণীর মলে বিভিন্ন ধরণের মারাত্মক রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু থাকে। এজন্য পুকুরে অপরিশোধিত মল ও বিষ্ঠাকে সার হিসেবে ব্যবহার চিংড়ির গুণগত মান ও খাদ্যনিরাপত্তার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

৬. চিংড়ির খাদ্য সম্পর্কিত যত্ন ও সতর্কতা

চিংড়ি একটি দামী পণ্য হওয়ায় চাষ পর্যায়ে তার যথাযথ দৈহিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য বাড়তি খাবার দিতে হয়। তবে অধিক বৃদ্ধির প্রত্যাশায় চাষি অনেক সময় সঠিক নিয়ম অনুসরণ না করেই খাবার ব্যবহার করে থাকেন। এর ফলে যেমন নিম্নমানের খাবার ব্যবহার করা হয়ে থাকে তেমনি সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। নিম্নমানের খাদ্য এবং খাদ্যের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার কেবল চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর নয় তা ভোক্তার স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। ব্যবহৃত খাদ্যে অগ্রহণযোগ্য বা ক্ষতিকর উপাদানের ব্যবহার এবং ত্রুটিপূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর সংরক্ষণ ব্যবস্থা খাদ্যকে চিংড়ি এবং ভোক্তার জন্য বিপদজনক করে তুলতে পারে। স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য বিভিন্ন কাঁচা খাবার, যেমন- শামুক ও ঝিনুকের মাংস, মরামাছ, মরা প্রাণীর মাংস ও নাড়ীভুঁড়ি, স্কুইড, কাঁকড়া চূর্ণ, ইত্যাদি দেয়া হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরনের কাঁচা খাবার বিভিন্ন ধরনের রোগজীবাণু দ্বারা সংক্রমিত থাকে, যেমন- *Salmonella*, *E. coli* ইত্যাদি এবং খাবারের মাধ্যমে তা খুব সহজেই চিংড়িতে সংক্রমিত হয়। এ ধরনের কাঁচা খাবার খুব সহজেই পানিকে দূষিত করে পানির স্বাভাবিক গুণাগুণকে নষ্ট করে ফেলে। এর ফলে চিংড়ির ব্যাপক মড়কও দেখা দিতে পারে। এ সমস্ত কাঁচা খাবার ভালভাবে সিদ্ধ করে ব্যবহার করলে সম্ভাব্য রোগজীবাণু সংক্রমণ রোধ করা সম্ভব হবে।

৭. ঔষধের ব্যবহার

প্রাণিকূলের রোগ নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন ঔষধের আবিষ্কার হলেও এর অপব্যবহার আবার প্রাণীর জন্য মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি করে। উদাহরণ হিসেবে চাষ পর্যায়ে বিভিন্ন এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার চাষ ক্ষেত্রে চিংড়ির রোগ নিরাময়ে সহায়ক হলেও এর অনিয়ন্ত্রিত ও দীর্ঘদিন ব্যবহারে চিংড়ির দেহে এন্টিবায়োটিকের অবশেষ (রেসিডিউ) জমা হয় এবং চিংড়ির মাধ্যমে তা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে বিভিন্ন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কতিপয় এন্টিবায়োটিক মানবদেহে ক্যানসারের মত মারাত্মক রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী বলে শনাক্ত হওয়ায় বর্তমানে সেগুলোর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনুমোদিত এন্টিবায়োটিক ও অন্যান্য ঔষধের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি করা হয়েছে। চাষ পর্যায়ে ঔষধের নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহার চাষির জন্য উপকারের পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায়। চাষাধীন চিংড়ি, খামারে নিয়োজিত কর্মী, পরিবেশ এবং ভোক্তার স্বাস্থ্যের উপর ঔষধের তিকর প্রভাব প্রশমনের জন্য ঔষধ প্রয়োগ, মাত্রা নির্ধারণ এবং এর অবশেষ নিঃশেষের সময়

(withdrawl time) মেনে চলার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের পাশাপাশি স্টোরে ঔষধ সংরক্ষণ ও ব্যবহারের পর অবশিষ্টাংশ এবং খালি প্যাকেট বা পাত্র উপযুক্ত স্থানে ফেলে দেওয়ার বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিৎ। বাংলাদেশে উৎপাদিত চিংড়ি পৃথিবীর বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশে রপ্তানি হয়ে থাকে, যেমন- ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ, আমেরিকা, কানাডা, জাপান ও অন্যান্য দেশ। তাই চাষ পর্যায়ে ঔষধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লিখিত দেশসমূহে তার অনুমোদনের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা অপরিহার্য।

৮. চিংড়ির আহরণপূর্ব মূল্যায়ন

চাষের সময় সাধারণত চাষি নির্দিষ্ট সময় অন্তর চিংড়ির আকার, পরিমাণ এবং স্বাস্থ্যগত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। এটি এক ধরনের রুটিন চেক, যা উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনার জন্য খুবই প্রয়োজন। চাষ পর্যায়ে চিংড়ি ধরার আগে এ রুটিন চেক চিংড়ির গুণগত মান ও খাদ্যনিরাপত্তার বিষয়টি মূল্যায়নের একটি বাড়তি সুযোগ তৈরি করে দেয়। খামারে উৎপাদিত চিংড়ির গুণগত মান এবং খাদ্যনিরাপত্তার অবস্থা কাঙ্খিত স্ট্যান্ডার্ডে অর্জন করা সম্ভব হয়েছে কিনা চিংড়ি ধরার পূর্বে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া খুবই জরুরি। এজন্য চিংড়ি আহরণের ৭-১০ দিন আগে একটি আহরণপূর্ব পরীক্ষা করা উচিৎ। কারণ, আহরণের পর চিংড়ির গুণগত মান এবং খাদ্যনিরাপত্তা সম্পর্কিত ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তখন চাষি বা প্রক্রিয়াকরণকারীর পক্ষে আর তেমন কিছু করার সুযোগ থাকেনা। পক্ষান্তরে, আহরণপূর্ব পরীক্ষায় বা মূল্যায়নে ত্রুটি ধরা পড়লে পুকুরে প্রয়োজনীয় সংশোধন ব্যবস্থা প্রয়োগ করে সম্ভাব্য সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

৯. আহরণের সময় অনুসরনীয় প্রাকটিসসমূহ

চিংড়ি আহরণের কার্যক্রম এমন কতগুলো ধাপের মধ্য দিয়ে করতে হয় যা উৎপাদিত চূড়ান্ত পণ্যের গুণগত মান ও খাদ্যনিরাপত্তাকে সঠিক রাখতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলো হলো

- ❑ খাবার কমিয়ে দেয়া/বন্ধ করে দেয়া;
- ❑ আহরণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, উপকরণ এবং কর্মী প্রস্তুত রাখা;
- ❑ আহরণ এবং
- ❑ হ্যান্ডলিং ও পরিবহন।

চিংড়ি ধরার কাজটি সাধারণত নোংরা অবস্থায় হলেও চিংড়ি রাখার কাজে ব্যবহৃত পাত্রগুলোকে ভালভাবে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। কারণ, নোংরা পাত্রের গায়ে লেগে থাকা ময়লা ও পূর্বের মরা চিংড়ি থেকে নতুন চিংড়িতে জীবাণু সংক্রমণ ঘটতে পারে। চিংড়ি রাখা এবং পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত সকল বাস্কেট, টাব ও অন্যান্য পাত্রকে যথাযথভাবে পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

চিংড়ি ধরার কাজে যে সমস্ত ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা হবে তাদেরকে অবশ্যই রোগমুক্ত থাকতে হবে। বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে কোন কাটা ঘা বা দূষিত ক্ষত থাকবে না। ধরার পর সরাসরি হাত দিয়ে চিংড়ি হ্যান্ডলিং না করে দস্তানা (হ্যান্ড গ্লোভস্) পরে হ্যান্ডলিং করা সবচেয়ে ভাল।

১০। পরিচর্যা এবং পরিবহনের জন্য প্রস্তুতি

পরিবহনের পূর্বে চিংড়িকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এরপর থেকে প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় পৌছানো পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গুণগত মানের ক্ষতি শুরু হয়। এ পর্যায়ে চাষির করণীয়:

- ❑ আহরিত ও সাময়িকভাবে সংরক্ষিত চিংড়িকে পানযোগ্য পানি দিয়ে তৈরি কুচি বরফের মধ্যে রাখতে হবে। পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত প্লাস্টিকের বাক্সের মধ্যে প্রথমে বরফের একটি স্তর, তারপর চিংড়ির একটি স্তর, তারপর আবার বরফ এভাবে সাজাতে হবে।
- ❑ পরিবহনে কত সময় লাগবে এবং পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা কত তা বিবেচনা করে বরফ ও চিংড়ির অনুপাত নির্ধারণ করতে হবে। সাধারণত চিংড়ি ও বরফের অনুপাত হবে ১:১। দিনের তাপমাত্রা ও দূরত্বের বিবেচনায় প্রয়োজনে বরফের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।
- ❑ পরিবহনের সময় চিংড়িতে যেন চাপ না লাগে সেজন্য উপযুক্ত ডিজাইনের শক্ত প্লাস্টিকের বাক্সে চিংড়ি পরিবহন করতে হবে। উপযুক্ত ডিজাইনের বাক্স উপর্যুপরি সাজিয়ে রাখলেও নিচের বাক্সের চিংড়িতে একটুও চাপ পড়বে না। জৈব পদার্থ দ্বারা তৈরি ঝুড়ি পরিহার করতে হবে।
- ❑ ইনস্যুলেটেড (তাপ নিরোধক) ট্রাকে বা ভ্যানে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি চিংড়িকে ডিপো/ আড়তে/ সার্ভিস সেন্টারে/ সরাসরি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ❑ পরিবহনের পর পরিবহন যান ও চিংড়ির বাক্স উপযুক্ত সাবান, ডিটারজেন্ট ও জীবাণুনাশক দিয়ে ভাল করে ধুয়ে শুকিয়ে ফেলতে হবে।

চিংড়ির আহরণোত্তর পরিচর্যার উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপের ফলে সাধারণভাবে আমরা মনে করে থাকি যে, কেবলমাত্র আহরণোত্তর পরিচর্যার উপরই চিংড়ির গুণগতমান ও খাদ্যনিরাপত্তার বিষয়টি নির্ভরশীল। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, খামারে উৎপাদিত চিংড়ির গুণগতমান ও খাদ্যনিরাপত্তার বিষয়টি মূলত চাষের পরিবেশের উপর নির্ভর করে । খাদ্যনিরাপত্তার বিষয়টি চাষের পরিবেশের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত হওয়ায় চিংড়ি চাষে সফলতা অর্জন অনেকাংশেই চাষের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের সফলতার সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চাষ পর্যায়ে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের এই কাজটি গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিস বা উত্তম মৎস্যচাষ অভ্যাস অনুসরণের মাধ্যমে অর্জন করা যেমন সম্ভব হবে তেমনি একই সাথে চাষ পর্যায়ে 'হ্যাসাপ নীতিমালা' বাস্তবায়ন সুগম হবে।

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর,

বাগদা চিংড়িতে হোয়াইট স্পট (ভাইরাস) রোগের প্রাদুর্ভাব ও এর প্রতিরোধ

ড. নিত্যানন্দ দাস[১], আ ক ম শফিক-উজ-জামান[২] ও সরোজ কুমার মিস্ত্রী[৩]

বাংলাদেশের দক্ষিণের উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি-অর্থনীতিতে বাগদা চিংড়ির ভূমিকা অন্যতম। এ অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে এ শিল্পকে ঘিরে। এ অঞ্চলের প্রায় ২.১২ লক্ষ হেক্টর জমিতে লোনাপানির বাগদা চিংড়ি চাষ হচ্ছে। প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্যবিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ সেক্টরের ভূমিকা অগ্রগণ্য। রপ্তানিযোগ্য মৎস্য সম্পদের মধ্যে শতকরা ৯০% চিংড়ি যার প্রায় ৭৫% বাগদা চিংড়ি। ২০০৯-১০ সালে দেশের মোট মৎস্য পণ্য রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭৭৫৮২.৯৭ মে.টন যার মূল্য ছিল ৩৩৯৩.০৪ কোটি টাকা যার মধ্যে চিংড়ির পরিমাণ ছিল ৫১৫৩৮.৭৫ মে.টন এবং রপ্তানি মূল্য ছিল ২৮৭০.৩৬ কোটি টাকা। ২০১০-১১ (মে পর্যন্ত) সালে মোট মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে ৯০৮৮৯.৯৩ মে.টন যার মূল্য ৪১৭৫.৩০ কোটি টাকা। তন্মধ্যে চিংড়ির পরিমাণ ৪৯০৫০.৯২ মে.টন মূল্য ৩১৯১.৮০ কোটি টাকা। বিগত দুই অর্থবছরের রপ্তানির তথ্য বিশ্লেষণ করলে বাগদা চিংড়ির গুরুত্ব ও সম্ভাবনা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাগদা চিংড়িতে হোয়াইট স্পট ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে বিপুল সম্ভাবনাময় এ সেক্টরে নেতিবাচক প্রভাব পরিলতি হচ্ছে।

হোয়াইট স্পট ভাইরাসের পরিচিতি ও বিস্তৃতি

বাগদা চিংড়িতে হোয়াইট স্পট (WSD) রোগটি হোয়াইট স্পট সিনড্রোম ভাইরাস (WSSV) দ্বারা সংক্রমিত এক প্রকার ভাইরাস রোগ। হোয়াইট স্পট সিনড্রোম ভাইরাস (WSSV) দ্বি-স্তর (double strained) বিশিষ্ট এক প্রকার DNA ভাইরাস। সারা বিশ্বে চিংড়িতে রোগ সৃষ্টিকারী ২৫টি ভাইরাস শনাক্ত করা সম্ভব হলেও বাংলাদেশে ৮টি প্রজাতির ভাইরাস চিংড়ি সম্পদের ক্ষতি করে বলে জানা যায়। বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদের সর্বাধিক ক্ষতি সাধনকারী কয়েকটি ভাইরাস-হোয়াইট স্পট সিনড্রোম ভাইরাস (WSSV); মনোডন বেকুলো ভাইরাস (MBV); টাউরা সিনড্রোম ভাইরাস (TSV); হেপাটোপেনক্রিয়াটিক পারভো-লাইক ভাইরাস (HPV); ইয়োলো-হেড ভাইরাস (YHV) ইত্যাদি। উল্লিখিত ভাইরাসসমূহের মধ্যে হোয়াইট স্পট ভাইরাসে ক্ষতির পরিমাণ সর্বাধিক। এ ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট রোগের নাম 'হোয়াইট স্পট সিনড্রোম রোগ (White Spot Syndrom Disease-WSSD)'।

এ ভাইরাসটি খুবই শক্তিশালী, লবণাক্ত ও অর্ধ-লবণাক্ত পানির প্রায় সকল চিংড়ি প্রজাতির জীবনচক্রের সকল পর্যায়ে WSSV সংক্রমণ সম্ভব। তবে জুভেনাইল সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি চিংড়ির জীবনচক্রের যেকোনো পর্যায়/ধাপে আক্রমণ করলেও ৬০-৭৫ দিন বয়সী চিংড়ির শরীরে এর সংক্রমণ অত্যন্ত দ্রুত প্রকাশিত হয়। সে কারণে চিংড়ির খামারে পিএল মজুদের ৪৫-৬০ দিনের মধ্যে এর আক্রমণ বেশি ঘটে। এ ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত রোগটি খুবই মারাত্মক, অতি দ্রুত সংক্রমিত হয় এবং আক্রান্ত জলাশয়ের সমুদয় চিংড়ি ৩-৪ দিনের মধ্যে মারা যায়। সারা বিশ্বে এর কোনো চিকিৎসা নেই। প্রতিরোধই একমাত্র চিকিৎসা। কাঁকড়া এবং লবস্টার WSSV দ্বারাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মনুষ্যদেহে WSSV এর ক্ষতিকর কোনো প্রভাব নেই।

হোয়াইট স্পট রোগটি সর্বপ্রথম ১৯৯১ সালে তাইওয়ানে চিংড়ি খামারগুলোতে দেখা যায়। ১৯৯২ সালে চীন, কোরিয়া ও ভারতে এর সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৯৩ সালে জাপানের চিংড়ি খামারে রোগটি সর্বপ্রথম শনাক্ত করা হয়। ১৯৯৪ সালে থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামে এর উপস্থিতি পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে WSSV এর সংক্রমণে চিংড়ি সম্পদের প্রথম বিপর্যয় দেখা দেয় ১৯৯৪ সালে। ঐ বছর বিদেশ থেকে স্বল্প মূল্যে রোগাক্রান্ত চিংড়ির পোনা আনার ফলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল বলে ধারণা করা হয়। ঐ বছরের ফেব্রুয়ারি/মার্চ মাসে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও কক্সবাজার অঞ্চলের ৬০-৭০ ভাগ চিংড়ি খামারে এ রোগের সংক্রমণের ফলে চিংড়ি সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ১৯৯৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে এর সংক্রমণ দেখা যায়। ১৯৯৯-২০০০ সালের মধ্যে সারা ল্যাটিন আমেরিকায় এ ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ে।

এ রোগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো যে, রোগাক্রান্ত চিংড়ির সংস্পর্শে ভাল চিংড়িও আক্রান্ত হতে পারে এবং বংশপরম্পর মা চিংড়ি হতেও সংক্রমিত হয়। সকল ক্রাস্টাশিয়া জাতীয় প্রাণী এ ভাইরাসের প্রধান বাহক এবং এটি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অভিপ্রয়াণ (migration)-এর ফলে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। ২৫-৩০ ডিগ্রি সে. পানির তাপমাত্রায় হোয়াইট স্পট ভাইরাসের আক্রমণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ৩০-৩২ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় মোটামুটি বৃদ্ধি পায় এবং পানির তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি সে. এর বেশি হলে এদের বৃদ্ধি স্তিমিত হয়ে পড়ে। যে কারণে মার্চ এপ্রিল মাসে হঠাৎ বৃষ্টির পর দক্ষিণ অঞ্চলের বাগদা ঘেরগুলোতে পানির গুণাগুণের পরিবর্তন ঘটে এবং তাপমাত্রা দ্রুত কমে যাওয়ায় ভাইরাসের আক্রমণ বৃদ্ধি পায় হয়।

রোগের লক্ষণ

আক্রান্ত চিংড়ির ক্যারাপেস বা মস্তক অঞ্চল, ফুলকা, পাকস্থলী, মধ্য পরিপাকনালী, উপাঙ্গ ও বহিঃ ও মধ্য-ত্বকের

কোষ-কলা ইত্যাদি WSSV দ্বারা আক্রান্ত হয়। প্রথমে ক্যারাপেস অঞ্চলে এবং ব্যাপক সংক্রমণের ক্ষেত্রে সারা দেহে সাদা স্পট দেখা যায়। দেহে বিশেষ করে শিরোবক্ষ এবং উদর এলাকার খোলসে ক্ষুদ্র সাদা গোলাকার দাগ দেখা যায়। ত্বকের বহিঃআবরণে ক্যালসিয়াম সল্ট জমা হওয়ার ফলে এ সাদা স্পটগুলো আরো স্পষ্ট দেখা যায়। কখনো দেহ লালচে বর্ণ ধারণ করতে পারে। আক্রান্ত চিংড়ি প্রাথমিক অবস্থায় দুর্বল এবং অলস হয়ে পড়ে, চিংড়ি পুকুরের পানির উপরের স্তরে বিক্ষিপ্তভাবে ভাসতে থাকে, অনেক সময় পুকুরের কিনারায় অচেতন অবস্থায় বসে থাকে। চিংড়ির খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখা দেয়। চিংড়ির দেহের বর্ণ ফ্যাকাসে ও লালচে দেখা দেয়। এক সময়ে মারা যায় এবং পানিতে তলিয়ে যায়। এ রোগে আক্রান্ত হলে ৩-৪ দিনের মধ্যে খামারের ১০০ ভাগ চিংড়িই মারা যেতে পারে।

রোগের সংক্রমণ

চিংড়ি খামারে বিভিন্ন কারণে ভাইরাসের সংক্রমণ ত্বরান্বিত হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক প্রাকৃতিক পরিবেশগুলো হচ্ছে-

১. লবণাক্ততার ব্যাপক উঠানামা (অসমোসিসের সমস্যা)
২. ব্যাপক বৃষ্টিপাত (লবণাক্ততা হঠাৎ কমে যাওয়া)
৩. পানির তাপমাত্রা কমে যাওয়া
৪. অতিরিক্ত মজুদ ঘনত্ব
৫. দুর্বল/ত্রুটিপূর্ণ খামার ব্যবস্থাপনা

WSSV সংক্রমণের কোনো প্রতিকার সম্ভব নয়। প্রতিরোধই এর একমাত্র উপায়। বাগদা চিংড়ির খামারে ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধের যে উপায়গুলো রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম দু'টি উপায় হলো-

১. খামারের পরিবেশ ভাইরাসমুক্ত রাখতে হবে।
২. বাইরে থেকে বাহকের মাধ্যমে খামারে ভাইরাসের প্রবেশ প্রতিরোধ করতে হবে।

চিংড়ি খামারে বাহকের মাধ্যমে দু'ভাবে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটতে পারে -

ক. উপর-নিচ সংক্রমণ (Vertical Contamination)

মা চিংড়ির শরীরে ভাইরাস থাকলে তা প্রজননের সময় ডিম ও লার্ভার মাধ্যমে পিএল-এর শরীরে সংক্রমিত হয়। পিএল -এর শরীরে উপস্থিত ভাইরাস নির্ধারিত সময় পরে খামারে চিংড়ি সম্পদের বিপর্যয় ঘটিয়ে থাকে। খামারে ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধের অন্যতম উপায় হলো 'খামারে ভাইরাসমুক্ত পোনা মজুদ করা'।

খ. সমান্তরাল সংক্রমণ (Horizontal Contamination)

ভাইরাসের সমান্তরাল সংক্রমণ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন বাহক -

- ❑ কাঁকড়া, ব্যাঙ, সাপ, মাছ ইত্যাদি
- ❑ বক, মাছরাঙ্গা, পেঁচা ও অন্যান্য মৎস্যভুক পাখী
- ❑ পোকা-মাকড়
- ❑ ইঁদুর, ছুঁচো, কুকুর, বেড়াল, শেয়াল ইত্যাদি প্রাণী
- ❑ প্লাংকটন, জলজ প্রাণী ও এদের ডিম ও লার্ভা
- ❑ আক্রান্ত খামার/জলাশয়ের পানি
- ❑ খামারের কর্মী, খামারের সরঞ্জাম
- ❑ বহিরাগত ব্যক্তি/যানবাহন ইত্যাদি

এর মধ্যে উপর থেকে নিচে সংক্রমণের সম্ভাবনা সবসময়ে বেশি থাকে। চিংড়ি খামারে যতগুলো বাহকের প্রবেশ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে, ভাইরাস সংক্রমণের সম্ভাবনা ততই কমতে থাকবে।

হোয়াইট স্পট রোগ প্রতিরোধে আমাদের করণীয়

- ❑ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত খামার অপেক্ষা বদ্ধ (closed) নিয়ন্ত্রণযোগ্য জলাশয়ে ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ বা ব্যবস্থাপনা করা সহজতর। এ কারণে পুকুরের আয়তন যথাসম্ভব ছোট হতে হবে এবং পানি পরিবর্তনের সুযোগ থাকতে হবে।
- ❑ পুকুর ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। তলদেশের কাদা ও পচা মাটি অপসারণ করে পানিতে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করে (শতকে ৫০০ গ্রাম) সকল অবাঞ্ছিত প্রাণী মেরে ফেলতে হবে।
- ❑ ভাইরাস বহনকারী এবং রাক্ষুসে প্রাণীর প্রতিরোধে পানি ঢুকানোর পূর্বে খামারের চতুর্দিকের পাড় বরাবর মাটির ৬ ইঞ্চি গভীর থেকে ১.৫ - ২.০ ফুট উঁচু মশারির জাল স্থাপন করতে হবে। পাড় মজবুত হতে হবে এবং পানি চুয়ানো রোধে পাড়ের ভিতরে শক্ত পুরু পলিথিন ব্যবহার করতে হবে।
- ❑ ঘন ফিল্টার নেট এর মাধ্যমে ছেঁকে পানি প্রবেশ করাতে হবে যেন কোনো ভাইরাস বহনকারী প্রাণী বা তার ডিম প্রবেশ করতে না পারে। সমস্ত চাষকালীন পানির গভীরতা ৩.৫- ৫ ফুট এর মধ্যে রাখতে হবে।
- ❑ পুকুরের পানিকে দূষণমুক্ত এবং সম্পূর্ণভাবে ভাইরাসমুক্ত করার জন্য পোনা ছাড়ার আগে অনুমোদিত জীবাণুনাশক (৩০-৬০ পিপিএম ব্লিচিং পাউডার) দ্বারা বিশুদ্ধ করতে হবে।
- ❑ ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করার আগে পানির উপরিতল সংলগ্ন পানিতে নেট স্থাপন করতে হবে যাতে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করার সাথে সাথে ভাইরাসের বাহক বিশেষ করে কাঁকড়া পাড়ে উঠে আশ্রয় না নিতে পারে।
- ❑ পানি জীবাণুমুক্তকরণের পর এর বিষাক্ততা দূর করে পানিতে চিংড়ির পোনা ছাড়ার উপযোগী করতে ১০-১৫ দিন সময় লাগতে পারে।
- ❑ খামারের পানির তাপমাত্রা ৩২° সে. অপেক্ষা কম থাকলে WSSV সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি থাকে আমাদের দেশে বর্ষা এবং শীত মৌসুমে পানির তাপমাত্রা

কম থাকে। তাই এ সময়ে হোয়াইট স্পট ভাইরাসের সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি থাকে। এপ্রিল মে মাসে অতি গরমেও রোগের সংক্রমণ ঘটে। পানির গভীরতা বৃদ্ধি করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

- খামারের পরিবেশ ভাইরাসের অনুকূল না থাকলে এদের সংক্রমণ প্রকাশিত হয় না। চাষকালীন খামারের পানির গুণাবলী নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে অন্যথায় পরিবেশগত পীড়নের কারণে চিংড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তখন ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটানো সহজ হবে।
- প্রাকৃতিক উৎস থেকে আহরিত চিংড়ি পোনার শরীরে অধিকাংশ সময়ে ভাইরাস থাকে। পোনার মাধ্যমে যেন ভাইরাস সংক্রমিত না হয় সে জন্য PCR পরীক্ষিত হ্যাচারি ভাইরাসমুক্ত, সুস্থ, সবল পিএল (বাগদার পোনা) ব্যবহার করতে হবে। সারা বিশ্বে ভাইরাসমুক্ত চিংড়ি খামার ব্যবস্থাপনার জন্য এটাই অন্যতম নির্ভরশীল উপায় হিসেবে অনুশীলন করা হয়ে আসছে।
- চাষকালীন পুকুরে উন্নত পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। কোনোভাবেই জীবন্ত ক্রাস্টাসিয়া জাতীয় খাবার (কাঁকড়া কিংবা চিংড়ি দ্বারা তৈরি) দেয়া উচিত নয় সে ক্ষেত্রে ভাইরাসের আক্রমণ হতে পারে।
- উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পুকুরের সঠিক পরিবেশ, পানির গুণগত মান, প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ঠিক রাখতে হবে যা রোগের ব্যাপকতা কমাতে সহায়তা করে।
- অধিক ঘনত্বে পোনা মজুদ পরিহার করতে হবে। কম ঘনত্বে পোনা মজুদ করলে পোনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশের চাপও কম পড়ে।
- ঘেরের পানির লবণাক্ত যেন খুব বেশি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাগদা চিংড়ির সহনীয় লবণাক্ততায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- হোয়াইট স্পট রোগ প্রতিরোধে একক চাষের পরিবর্তে মিশ্রচাষ করাই উত্তম। সেক্ষেত্রে বাগদার সাথে তেলাপিয়া ও পার্শে মাছ (*Mugil* spp.) চাষ করা যেতে পারে।
- ভাইরাস প্রতিরোধে বদ্ধ জৈবিক চাষ ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এন্টিবায়োটিক বা কোনো রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করে প্রোবায়োটিক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ব্যবহৃত জাল, পাত্র এবং প্রতিটি সরঞ্জাম ব্যবহারের পূর্বে এবং পরে ব্লিচিং পাউডার মিশ্রিত পানিতে/উচ্চ ঘনত্বের পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণে ভিজাতে হবে এবং রৌদ্রে ভালভাবে শুকাতে হবে। এ সব সরঞ্জাম খামারের বাইরে নেয়া যাবে না বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- খামারের কর্মী বা অন্যান্য বহিরাগত ব্যক্তির মাধ্যমে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা রোধ করতে হবে। খামারে প্রবেশকারী প্রত্যেক ব্যক্তির হাত ও পায়ের তালু জীবাণুনাশক দ্রবণে ধোয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- কোনো পুকুরে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটলে তা নিশ্চিত হওয়ার পরই পুকুরের সমস্ত চিংড়ি ধরে ফেলা উচিত এবং পুড়িয়ে ফেলতে হবে কিংবা গর্তে ফেলে চুন দিয়ে ও পরে মাটি চাপা দিয়ে রাখতে হবে।
- ভাইরাস আক্রান্ত ঘেরে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি কোনো অবস্থাতেই অন্য ঘেরে বা পরবর্তী চাষের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।
- চাষে ব্যবহৃত পানি নদী/সাগরে অবমুক্ত করার আগে তা দূষণমুক্ত করা প্রয়োজন। এভাবে পানি দুষণমুক্ত করার ফলে তা রোগ বিস্তারের ঝুঁকি কমায় এবং পানি জীবাণুমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। ভাইরাস আক্রান্ত ঘেরের পানিতে ১০০ পিপিএম হারে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করে ৭ দিন রেখে দিলে তা দূষণমুক্ত হয়।

জলবায়ুর পরিবর্তন, হোয়াইট স্পটসহ বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ, চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত উপকরণের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা, অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার অভাব, আধুনিক মানসম্পন্ন বাজার ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, চিংড়ি শিল্পে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কারণে বাগদা চিংড়ি চাষ হুমকির মুখে পড়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম রপ্তানি পণ্য ও অমিত সম্ভাবনাময় এ শিল্পকে টিকিয়ে রাখা দরকার। থাইল্যান্ড, চীনসহ বিশ্বের অন্যান্য চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশগুলো ভাইরাস প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। যার ফলে ঐ সকল দেশে চিংড়ি উৎপাদন অব্যাহত আছে। দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি বাগদা চিংড়ি সেক্টর দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বর্তমান সরকারের ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী আগামী ২০১৫ সাল নাগাদ মৎস্যখাত হতে ১০ হাজার কোটি টাকা রপ্তানি আয় নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই সামগ্রিক বিষয় বিবেচনায় রেখে আমাদেরকে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। প্রচলিত চাষ পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক পরিবেশবান্ধব বদ্ধ জৈব পদ্ধতির চাষ দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটানো দরকার। চিংড়ি চাষের জন্য নির্ধারিত এলাকা চিহ্নিত করে বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন ঘটানো একান্ত দরকার কারণ অবকাঠামো উন্নয়ন ছাড়া ভাইরাসমুক্ত চিংড়ি চাষ প্রায় অসম্ভব। জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে চিংড়ি সেক্টরের বিদ্যমান সঙ্কট দূর করে আগামী দিনের সুখী বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণে সহায়ক হবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১. উপপরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ
২. সহকারী পরিচালক, বাগদা প্রকল্প
৩. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে আদিবাসী সমাজের অংশগ্রহণে কুচিয়া চাষের এক সফল গবেষণা

সৈয়দ আরিফ আজাদ[১] ও ড. বিনয় চক্রবর্ত্তী[২]

ভৌগোলিক ও জলবায়ুর পরিবর্তনে প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারানোর ফলে অধিক খরা এবং উজান থেকে নদীপথে বয়ে আসা পলি জমে আমাদের জলাভূমি ভরাট হচ্ছে। ফলে পানি প্রবাহ কমছে এবং জলজ পরিবেশের পরিবর্তন হচ্ছে। অপরিকল্পিত ড্রেন, স্লুইস গেইট ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, জলাভূমি কৃষি জমিতে রূপান্তর, নিষিদ্ধ ঘোষিত ও মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ও সার ব্যবহার এবং শিল্পকারখানার বর্জ্য ইত্যাদি জলজ পরিবেশের উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

এক সময় বাংলাদেশের সর্বত্র কুচিয়ার (*Monopterus cuchia*) প্রাপ্যতা ছিল। বাংলাদেশ ছাড়া পাকিস্তান, নেপাল ও ভারতে এর প্রাপ্যতা রয়েছে। সিলেট, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার অগভীর বিল ও বোরো ধানক্ষেতের আইলে, জলজ আগাছার ঝোঁপঝাড়ে পরিপূর্ণ পরিবেশে কুচিয়া পাওয়া যেত। আদিবাসী শিকারিগণ দেশের বিভিন্ন এলাকায় কুচিয়া শিকার করে তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করত। বর্তমানে এর প্রাপ্যতা খুবই অপ্রতুল। কুচিয়া এখন বিপন্ন প্রজাতি। আদিবাসী এলাকায় অনেক ছোট পুকুর ও জলাশয় (ধানক্ষেত) রয়েছে যা আজও মৎস্যচাষের আওতায় আসেনি। পুকুর ও জলাভূমিতে যথাক্রমে চাষ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটিয়ে কুচিয়ার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। আদিবাসীদের রয়েছে কুচিয়ার প্রতি বিশেষ আগ্রহ। তাই এ ধরনের প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে আদিবাসী সমাজের খাদ্য নিরাপত্তায় সরাসরি ইতিবাচক ভূমিকা রাখা সম্ভব। আদিবাসী সমাজ ছাড়াও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অনেকেই কুচিয়া খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। দেশে ও আন্তর্জাতিক বাজারে এর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। কুচিয়ার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি এবং এর চাষ ব্যবস্থাপনায় আদিবাসী সমাজের অংশগ্রহণ একটি সফল সংযোজন। বিগত ২০০৯ সালে WorldFish Centre এর সহায়তায় এ ধরনের একটি গবেষণা পরিচালিত হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ:

- কুচিয়ার আবাস্থল উন্নয়ন এবং সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আদিবাসী সমাজের সচেতনতা সৃষ্টি;
- অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমের ভিত্তিতে ক্ষুদ্রাকার আবাসস্থল (পুকুর ও ধানক্ষেত) উন্নয়নের মাধ্যমে কুচিয়া চাষ/ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি;
- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ধারণা কাজে লাগিয়ে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন।

কর্ম পদ্ধতি

জরিপের মাধ্যমে জলাশয় নির্বাচন, সুফলভোগীদের নিয়ে ব্যবস্থাপনা দল তৈরি, দলের সাথে নিয়মিত আলোচনা, আবাসস্থল উন্নয়ন, পুকুর পাড়ে জাল ও বিলে (ধানক্ষেত) বাঁশের বানা স্থাপন, পোনা মজুদকরণ, খাবার পরিবেশন (জীবন্ত কার্প জাতীয় ধানীপোনা ও মৃত মাছ, শুটকি মাছ ও ছোট শামুক ও ঝিনুকের মাংস), ডাটা সংগ্রহ (ভৌত-রাসায়নিক প্যারামিটারসমূহ এবং মাছের দৈর্ঘ্য ও ওজন) ইত্যাদি।

কার্যক্রম এলাকা

গোহালী ঢেউ (পুকুর), বিরিশিরি, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা এবং নওকুচি বিল, ঝিনাইগাতী, শেরপুর।

ব্যবস্থাপনা দল তৈরি

গোহালী ঢেউ এ ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল এবং নওকুচি বিলে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল গঠন।

অংশগ্রহণমূলক দলীয় আলোচনা

অংশগ্রহণকারী দলে ছিল গবেষক, মৎস্য অধিদপ্তর, ওয়ার্ল্ডফিস সেন্টার, বিএফআরএফ, তারা (এনজিও) এবং সুফলভোগী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী।

দল সচলীকরণ ও গৃহীত কার্যক্রম

আলোচনার মাধ্যমে স্থানীয় জ্ঞান ও জলাশয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, এলাকা ভিত্তিক প্রস্তাবনা তৈরি ও অনুমোদন, জলাশয়ের উপযোগিতা বিবেচনা করে ধানক্ষেতে বানা ও পুকুর পাড়ে নেট স্থাপন, কম্পোস্ট হিপ তৈরি করে আশ্রয়স্থল স্থাপন, আশ্রয়স্থলে জলজ আগাছা (কচুরিপানা) স্থাপন, বাঁশের লাল পতাকা স্থাপন, কুচিয়া ও অন্যান্য দেশীয় মাছ ধরা নিষেধ সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপন, প্রতিপাক্ষিকে কুচিয়া চাষের অগ্রগতি মনিটরিং, সমস্যা ও সমাধান, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কুচিয়ার প্রাপ্তি শিকার, খাবার ও বাসস্থান সম্পর্কিত বিষয়াদি আলোচনা, জীবন ও জীবিকার ওপর প্রভাব বিষয়ে আলোচনা ও কর্মসূচির স্থায়িত্বশীলতা বিষয়ে পর্যালোচনা।

কুচিয়ার আবাসস্থল উন্নয়ন

বাঁশের গুড়ি, গোবর, কচুরিপানা ও কাদামাটি দিয়ে (১মি.×২মি.×১মি.) সাইজের কম্পোস্ট হিপ তৈরি এবং প্লাস্টিক পাইপ ও বাঁশের চোঙ স্থাপন করে কৃত্রিম আবাসস্থল নির্মাণ করা হয়।

পোনা মজুদ

পোনা মজুদ হার অপর পৃষ্ঠায় দেখানো হলো:

গবেষণার স্থান	জলাশয়ের ধরন	আয়তন (শতাংশ)	মজুদ সংখ্যা	মজুদের হার (কেজি/শতাংশ)	মোট মজুদ (কেজি)
গোহালী ঢেউ, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা	পুকুর	১৩.৫	৭০৭	৫.০	৬৭.৫
নওকুচি বিল, ঝিনাইগাতী, শেরপুর	ধানক্ষেত	৫০.০	১০৪২	২.০	১০০

খাবার পরিবেশন

পুকুর ও বিলে খাবার পরিবেশন ছিল নিম্নরূপঃ

আবাসস্থল	খাবারের ধরন	প্রয়োগ হার	প্রয়োগ পদ্ধতি	মন্তব্য
পুকুর (গোহালী ঢেউ) ও নওকুচি বিল (ধানক্ষেত)	জীবিত ধানী পোনা	৫%	১৫ দিন অন্তর	
	শুটকি মাছ	১%	১ দিন পরপর	
	শামুক/ঝিনুকের মাংস	১%	১ দিন পরপর	
	ছোট মৃত মাছ	১%	১ দিন পরপর	

গবেষণায় ব্যবহৃত পরিমাপক

ভৌত-রাসায়নিক প্যারামিটারসমূহ

১. পানির তাপমাত্রাঃ সেন্টিগ্রেড স্কেলসমূহ; ২. স্বচ্ছতাঃ ২০ সেমি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট সেক্কিডিস্ক; ৩. অক্সিজেন ও পিএইচঃ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক অক্সিজেন এবং পিএইচ মিটার; ৪. ক্ষারতাঃ টাইট্রিমেট্রিক পদ্ধতি ও ৫. গভীরতাঃ মিটার স্কেল (বাঁশের তৈরি)

ফলাফল

১২০ দিনের ভৌত-রাসায়নিক ডাটাসমূহ কুচিয়া চাষের অনুকূল ছিল। নিম্নের ছকে তা প্রদান করা হলো।

প্যারামিটার	ট্রিটমেন্ট	
	নওকুচি বিল (ধানক্ষেত)	গোহালী ঢেউ (পুকুর)
তাপমাত্রা (^{o}সেগ্রে)	২৯.৮২±১.৩৭ (২৭.৫-৩২.০)	২৯.৭৮±১.২৬ (২৭.৪০-৩২.৪০)
স্বচ্ছতা (সেমি)	১৮.৪৮±২.০৯ (১৪.৮০-২০.৫০)	১৬.৩২±২.৬৪ (১৪.৪০-১৯.৪০)
গভীরতা (মি)	০.৭৪±০.২৩ (০.৪০-১.১০)	০.৯০±০.২১ (০.৫০-১.৪০)
পিএইচ	৬.৫০±০.৩০ (৫.৫০-৭.২০)	৬.৪৮±১.২৬ ০.৩৩ (৫.৮৮-৭.৪০)
দ্রবিভূত অক্সিজেন (মিগ্রা/লি)	৪.৫৪±০.৬৬ (৩.৬৪-৫.৬২)	৪.৪৪±০.৭০ (৩.৫৫-৬.১০)
মোট ক্ষারতা (মিগ্রা/লি)	৩১.৫৭±৮.৮৭ (২২.৪০-৩৪.২০)	৩৭.২২±৯.৬৯ (২১.৬০-৪১.২০)

১২০ দিনে পুকুর ও বিলে কুচিয়া মাছের বৃদ্ধির ডেটাসমূহঃ কুচিয়া মাছের বৃদ্ধির ডেটা নিম্নে প্রদান করা হলো।

প্যারামিটার	ট্রিটমেন্ট	
	নওকুচি বিল (ধানক্ষেত)	গোহালী ঢেউ (পুকুর)
আদি দৈর্ঘ্য (সেমি)	৪৩.৩৯±৫.০৬	৪৬.১৩±৩.২৬
চূড়ান্ত দৈর্ঘ্য (গ্রাম)	৫৬.১৯±৩.৩৫	৫৬.৬১±১.৭৩
আদি ওজন (গ্রাম))	৯৫.৯৬±৩.২১	৯৫.৪৫±৪.০
চূড়ান্ত ওজন (গ্রাম)	১৬৪.৩৪±২০.৮	১৬১.০৮±১৮.২
নীট ওজন (গ্রাম)	৬৮.৩৮±০.৯৮	৬৫.৬৩±০.৮৪
দৈনিক গড় ওজন বৃদ্ধি (গ্রাম)	০.৫৭±০.০৮	০.৫৫±০.৫
আপেক্ষিক বৃদ্ধির হার	০.৪৫±০.২৩	০.৪৩±০.৩২
বেঁচে থাকার হার (%)	৯০.০	৮৯.২৫±৫.৫০

প্যারামিটার	ট্রিটমেন্ট	
	নওকুচি বিল (ধানক্ষেত)	গোহালী ঢেউ (পুকুর)
কুচিয়ার উৎপাদন (কেজি/হে.)	১৪৪০	২৬৮১.৫
কার্পের উৎপাদন (কেজি/হে.)	৬১৪.২৯	৩৬৮.০৫
ন্যাটিভ ফিস এর উৎপাদন (কেজি/হে.)	৬৩১.০৫	৩০.২৯
মোট উৎপাদন (কেজি/হে./১৫০ দিন)	২৬৮৫.৩৪	৩০৭৯.৮৪

১৫০ দিন চাষের কুচিয়া, অন্যান্য মাছ ও ধান উৎপাদনের আয় ব্যয়ের বিবরণ: নিম্নে আয়-ব্যয়ের বিবরণ প্রদত্ত হলো।

ক্রমিক নং	আয়ের খাতসমূহ	নওকুচি বিল (ধানক্ষেত)		গোহালী ঢেউ (পুকুর)		মন্তব্য
		ব্যয় (টাকা)	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	আয় (টাকা)	
১.	কুচিয়া	১৯৮৮৭০	২৫৯২০০	৩২২৪৫১	৪০২২২৫	সাইজ অনুসারে মূল্য: ১৮০টাকা/কেজি ১৫০টাকা/কেজি
২.	কুচিয়ার খাবারের জন্য সরবরাহকৃত মাছের পোনা	২২০০০	৯৮২৮৬	২৬০০০	৪৪২২২৫	
৩.	প্রাকৃতিক মাছ (Native Fish)	-	১২৬২১০	-	৪৪৫২	
৪.	তরিতরকারী	১৪২৫	৫২৫০	১০২৫	২১১০	-
৫.	ধান ও খড়	৪৪১২০	৭৫৭৫০	-	-	-
	মোট	২৬৬৪১৫	৫৬৪৬৯৬	৩৪৯৪৭৬	৪৫২৯৪৭	বিলের আয় বেশি

নওকুচি বিল ও গোহালী ঢেউ পুকুরে কুচিয়া মাছের প্রাথমিক ওজন ছিল ৯৫.৯৬ ও ৯৫.৪৫ গ্রাম। ১৫০ দিন চাষ করে চূড়ান্ত ওজন পাওয়া যায় যথাক্রমে ১৬৪.৩৪ ও ১৬১.০৮ গ্রাম। দৈনিক গড় ওজন বৃদ্ধি যথাক্রমে ০.৫৭ ও ০.৫৫ গ্রাম। বেঁচে থাকার হার ছিল ৯০.০ ও ৮৯.২৫ %। কুচিয়া মাছের উৎপাদন নওকুচি বিল ও গোহালী ঢেউ পুকুরে ছিল ১৪৪০ ও ২৬৮১.৫ কেজি/হে. এবং অন্যান্য মাছ মিলিয়ে মোট উৎপাদন দাঁড়ায় ২৬৮৫.৩৪ ও ৩০৭৯.৮৪ কেজি/হে.।

ছবি: নওকুচি বিলে উৎপাদিত কুচিয়া

নওকুচি বিলে কুচিয়াসহ অন্যান্য মাছ এবং অন্যান্য ব্যয় ২৬৬৪১৫.০০ টাকা এবং আয় ৫৬৪৬৯৬.০ টাকা। গোহালী ঢেউ পুকুরে কুচিয়াসহ অন্যান্য মোট ব্যয় ৩৪৯৪৭৬.০০ টাকা এবং আয় ৪৫২৯৪৭.০ টাকা। যা আদিবাসী সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক নবদিগন্তের উন্মোচন করেছে।

কুচিয়ার বৃদ্ধিহার যথেষ্ট সন্তোষজনক। বর্ণিত গবেষণায় কুচিয়ার খাবার প্রয়োগ পদ্ধতির সফল নিরূপণ সম্ভব হয়েছে (বাঁশের চোঙ, প্লাস্টিক পাইপ ব্যবহার করে শুটকি ও মৃত মাছ জিআই তারে মালা গেঁথে প্রয়োগ)। কুচিয়া জীবিত/মৃত পোনা মাছ, শুটকি মাছের গুড়া, শামুক ও ঝিনুকের মাংস খেতে ভালবাসে। কম্পোস্ট হিপ, বাঁশের চোঙ, বাঁশের মোড়া, ঝোপঝাড় দিয়ে তৈরি আবাসস্থলে কুচিয়া বসবাস করে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মাঝে কুচিয়া পছন্দের খাবার। কুচিয়ার বাজারদর বেশি এবং দেশে ও আর্ন্তজাতিক বাজারে এর যথেষ্ট চাহিদা থাকায় চাষের ব্যাপকতা বাড়িয়ে রপ্তানি আয় বাড়ানো যেতে পারে। গবেষণাকালে আদিবাসী সমাজের আন্তরিক সহযোগিতা ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে।

আদিবাসী এলাকার ছোট পুকুর ও জলাশয় (ধানক্ষেত) যা আজও মৎস্যচাষের আওতায় আসেনি সে সমস্ত পুকুর ও জলাভূমিতে যথাক্রমে চাষ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটিয়ে কুচিয়ার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। উদ্ভাবিত এ ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের আদিবাসী সমাজের খাদ্য নিরাপত্তায় সরাসরি ইতিবাচক ভূমিকা রাখা যেতে পারে। কুচিয়ার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি এবং এর চাষ ব্যবস্থাপনায় আদিবাসী সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে এ প্রযুক্তি অর্থনৈতিক উন্নয়নে সফল ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া একটি বিপন্ন মৎস্য প্রজাতি রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হতে পারে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: ডঃ বিনয় কুমার বর্ম্মন, ওয়ার্ল্ডফিস সেন্টার, ঢাকা।

১. উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ২. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর

পার্ল গ্রাফটিং

শেখ মুস্তাফিজুর রহমান

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবকূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "দরিয়া দু'টি একরূপ নহে, একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটি লোণা, খর। প্রত্যেকটি হতে তোমরা আহার কর তাজা মাছ এবং অলঙ্কার যাহা তোমরা পরিধান করো এবং রত্নাবলী (মনি মুক্তা) এবং তোমরা দেখ উহার বুক চিরিয়া নৌযান চলাচল করে যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে পারো এবং যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও"। (সুরা ফাতির, আয়াত ১২, মহাগ্রন্থ আল কুর'আন)।

মানুষ সুন্দরের পূজারী। অন্যান্য মৌলিক চাহিদার মতো আপন সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা মানুষের চিরন্তর। ঝিনুক আর শামুকের তৈরি কণ্ঠহার প্রেয়সীকে উপহার দিতে দিতে ক্লান্ত পুরুষ হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলো ঝিনুকের ভেতরে আরো সুন্দর, আরো আকর্ষণীয় মুক্তাকে। দ্রুত সেটির মালা তৈরি করে উপহার দিলো দয়িতাকে আর এ থেকে শুরু হলো মানব সভ্যতার আর এক বিকাশ। সেদিন থেকে শুরু হলো রত্ন হিসেবে মুক্তার অগ্রযাত্রা, যা আজও অপ্রতিরোধ্য।

মুক্তা কি? উইকিপিডিয়া বলছে এটি জ্যান্ত ঝিনুকের ভেতরে সৃষ্ট একটি শক্ত পদার্থ। প্রকৃতিতে এটি শুরু হয় ঝিনুকের শরীরের ভেতরে প্রবিষ্ট কোন কণার সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য ঝিনুকের নিজস্ব জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া থেকে। অতীতে মুক্তা ছিলো পুরোটাই প্রাকৃতিক। প্রকৃতিতে মুক্তা তৈরি হয় খুবই কম, প্রতি ২০০০ ঝিনুকের মধ্যে মাত্র একটি। এখন প্রাকৃতিক মুক্তার পাশাপাশি চাষকৃত মুক্তাও আহরিত হয়ে থাকে।

মুক্তা তৈরি হয় নেইকার দিয়ে। নেইকার হলো অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে রঙের পরিবর্তন হয় এমন স্ফটিক স্বচ্ছ ষড়ভূজ অ্যারোগোনাইটের কণিকা (ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এর একটি রূপ)। ঝিনুকের শরীরে প্রবিষ্ট কণার চতুর্দিকে ধীরে ধীরে ঘন নেইকারের আস্তরের পর আস্তর দিয়ে মুক্তা ক্রমশ বড় হতে থাকে। মুক্তার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে এর আকার এর ওপর, এর সুগোলত্ব আর উজ্জ্বলতার কারণে। বেশির ভাগ মুক্তাই আঁকাবাঁকা আকার এবং অনুজ্জ্বলতার কারণে মূল্যহীন অথবা অনেক কম মূল্যের হয়ে থাকে। মুক্তাই হলো একমাত্র প্রাকৃতিক রত্ন যা কোনোরূপ প্রক্রিয়াজাতকরণ ছাড়াই সরাসরি অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

যদিও মুক্তার ব্যবহার শুরু হয়েছিল বেশ প্রাচীনকাল থেকেই, এর চাষ কিন্তু খুবই সাম্প্রতিক। মাত্র বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে জাপানীজ গবেষকগণ প্রথম মানব নিয়ন্ত্রিত মুক্তা উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। এর ফলে প্রাকৃতিক মুক্তার চাইতে বড় আর উজ্জ্বলতর মুক্তা পাওয়ার একটা সুযোগ সৃষ্টি হলো। প্রাকৃতিক কৃত্রিম মুক্তা উৎপাদন নির্ভর করে ঝিনুকের শরীরে একটি ছোট্ট শল্য অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ঢুকিয়ে দেয়া (গ্রাফটিং) কৃত্রিম নিউক্লিয়াসের (প্রবিষ্ট দানা) ওপর। ঢোকানোর পর থেকেই শুরু হয় ঝিনুকের শরীর থেকে নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে নেইকারের নিঃসরণ এবং এর ফলেই সৃষ্টি হয় মুক্তা।

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে যে পরিমাণ চাষকৃত মুক্তা আহরিত হয় তার সিংহভাগই উৎপাদিত হয় চীনদেশে। যেখানে ১৯৮৫ সালে চীনে চাষকৃত কোন মুক্তাই পাওয়া যেত না সেক্ষেত্রে বিগত ১৯৯৯ সালে চাষ করে মুক্তা উৎপাদিত হয়েছে প্রায় ৩৫০ মে.টন। আর এটি সারা পৃথিবীতে উৎপাদিত মুক্তার প্রায় ৯০%।

সকল ঝিনুকে কিন্তু মুক্তা হয় না। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত প্রায় ১০০০ মিঠা পানির প্রজাতির ঝিনুকের মধ্যে মাত্র ১০-১২টি প্রজাতি মুক্তা উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত। মুক্তা উৎপাদনের জন্য আদর্শ ঝিনুক হলো ইউনিয়নিডি পরিবারের *Hyriopsis cumingii* ও *Cristaria plicata*। এ ঝিনুকগুলো বর্তমানে চীনে পর্যাপ্ত পাওয়া যায় যদিও বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে প্রাপ্ত লোনা পানির প্রজাতিগুলো হলো *Crassostrea gryphoides* (Schlotheim) এবং *C. belcheri* (Sowerby)। মিঠা পানির প্রজাতিগুলো হলো *Lamellidens marginalis* ও *Parreysia spp*।

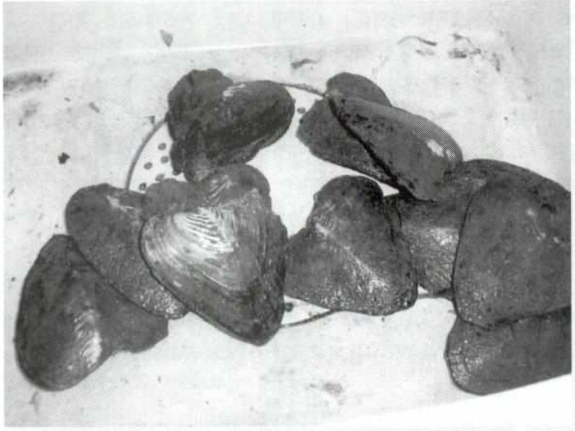

ছবি: মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুক (*Hyriopsis Cumingii*)

গ্রাফটিং করার পূর্বে চাষকৃত ঝিনুকগুলোকে মজুদ জলাশয় হতে বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত পুকুরে স্থানান্তর করা হয়। মুক্তা চাষের জন্য ঝিনুকগুলোকে বিশেষভাবে প্রস্তুত পুকুরে পরিচর্যা করা প্রয়োজন। উপযুক্ত কিশোর ঝিনুকগুলোকে (স্প্যাট) মজুদ পুকুর থেকে তুলে এনে বিশেষভাবে তৈরি

পলিথিন ব্যাগে প্রতিটিতে ১০টি ঝিনুক রেখে (প্রতি বর্গ মিটারে ৪.৫ টি/ ঘনত্ব) এদের জন্য নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত পুকুরে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এ পুকুরে পানির উর্বরতা বাড়িয়ে রাখতে হয় এবং পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের সংস্থান থাকতে হয়। ঝিনুক সাধারনত ২ বৎসরে গ্রাফটিঙ্গের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। এরপর তাদের প্রায় একমাস নিবিড় নজরদারিতে রেখে মুক্তা তৈরির জন্য প্রস্তুত করা হয়। এদের মধ্যে যেগুলো একটু বড়, সুন্দর বাহ্যিক আকার এবং স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠে তাদের গ্রহণকারী ঝিনুক এবং অন্যগুলো দাতা ঝিনুক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। নিউক্লিয়াস যুক্ত মুক্তার জন্য প্রতিটি দাতা ঝিনুক থেকে ১.৫টি এবং নন-নিউক্লিয়াস মুক্তার ক্ষেত্রে প্রতি ১০-১৫টি গ্রাহক ঝিনুকের জন্য একটি দাতা ঝিনুক প্রয়োজন হয়।

সেল স্লাইচ তৈরি

মুক্তা কৃত্রিমভাবে তৈরি করতে হলে এতে সেল স্লাইচ প্রবিষ্ট করতে হয়। সেল স্লাইচ নিউক্লিয়াস মুক্তার জন্য মুক্তা থলি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেল স্লাইচ তৈরির জন্য দাতা ঝিনুকের খোলসমুখী ম্যান্টেলের নেইকার নিঃসরণকারী কোষসমূহ আলাদা করা হয় এবং ছেটে পরিষ্কার পাতলা সেল স্ট্রিপ তৈরি করতে হয়। তারপর এ স্ট্রিপটি ফালি করে কাটা হয় যাতে নেইকার নিঃসরণকারী কোষসমূহ অক্ষুণ্ন থাকে। এরই নাম সেল স্লাইচ। এরপর এ সেল স্লাইচগুলো গ্রহিতা ঝিনুকের শরীরে ছোট্ট অস্ত্রোপচারের সাহায্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এর ফলে খুব দ্রুত নেইকার নিঃসরিত হয়ে মুক্তা তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়।

মুক্তার মান সরাসরি নির্ভর করে এর মধ্যে প্রবিষ্ট সেল স্লাইচ ও নিউক্লিয়াসের ওপর। এজন্য খুবই সতর্কতার সাথে তা তৈরি করতে হয়। দাতা ঝিনুককে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে ম্যান্টেলের বাইরের ও ভেতরের স্তরকে আলাদা করা হয়। যে পদ্ধতিই ব্যবহার করা হোক না কেন, সেল স্লাইচগুলো সমান সাইজ এবং সমান পুরুত্বের হওয়া জরুরি। স্লাইচ তৈরীর সাথে সাথে তা সাধারণ বা সামান্য লবণাক্ত পানিতে ভিজিয়ে ফেলতে হয় এবং এটি ভেজা রাখতে হয়। কোন অবস্থাতেই সেল স্লাইচকে শুকিয়ে যেতে দেয়া যাবে না। স্লাইচগুলোকে দীর্ঘক্ষণ অব্যবহৃত অবস্থায় রেখে দেয়াও যাবে না। এতে করে গ্রহীতা ঝিনুকের সংযোজক কলায় এটির লেগে থাকার ক্ষমতা কমে যাবে বা একেবারেই থাকবে না। তাহলে যে কোন সময় তা ঝিনুক থেকে পড়ে যেতে পারে। স্লাইচ তৈরির সময় এর বাহ্যিক আবরণটিকে খুব পীড়া দেয়া যাবে না। এতে এর নেইকার নিঃসরণ ক্ষমতা কমে যাবে। এজন্য খুব ধারালো ছুড়ি দিয়ে সেল স্লাইচ তৈরি করতে হবে। স্লাইচ তৈরির ম্যান্টেলের কলাগুলো ক্রটিযুক্ত, অসম্পূর্ণ কিংবা পিণ্ডায়িত হলে ফল ভালো হবে না। দাতা ঝিনুকের ম্যান্টেলের রঞ্জক কলা পুরোটাই ধারালো ছুড়ি দিয়ে কেটে ফেলতে হবে। অন্যথায়, মুক্তা উজ্জ্বল হবে না। সেল স্লাইচগুলো অবশ্যই চারকোণা হতে হবে এবং লম্বায় কিঞ্চিত বড় হতে হবে। মোটামুটি ২মিমি প্রস্থ ও ৩ মিমি দৈর্ঘ্যযুক্ত সেল স্লাইচ হলো আদর্শ। যত দ্রুত সম্ভব স্লাইচগুলো গ্রহীতার শরীরে প্রবিষ্ট করতে হবে। অধিক বয়সী ঝিনুকের চাইতে কিশোর ঝিনুকের কলা দিয়ে তৈরি স্লাইচ ভালো ফল দেয়।

প্রবিষ্ট করার পদ্ধতি (গ্রাফটিং)

সেল স্লাইচ প্রবিষ্ট করার পূর্বে এজন্য পরিস্কার পানি, তোয়ালে, তুলা, প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি অস্ত্রোপচারের টেবিলে প্রস্তুত রাখতে হয়। অতঃপর পূর্ব থেকেই বাছাই করা গ্রহীতা ঝিনুকের খোলস বিশেষ ধরণের খোলস উন্মুক্তকরণ যন্ত্রের সাহায্যে খুলে প্রয়োজনীয় মাপের U type প্লাগ এমনভাবে উন্মুক্ত খোলসে লাগাতে হবে যেন ঝিনুক ইচ্ছে করলেও তা বন্ধ করতে না পারে। এরপর ঝিনুকের ভেতরের ফুলকা এবং প্রত্যঙ্গসমূহ একটি লম্বা সুঁই দিয়ে একপাশে সরিয়ে ফেলতে হবে। অতঃপর ভেতরের ঘোলা তরল কিংবা মিউকাস একটি ভেজা ফোম দিয়ে পরিস্কার করে নিতে হবে। এরপর ঝিনুকের গোনাডে একটা ছোট্ট ছিদ্র করতে হয়। সাধারণত গোনাডের অবস্থা দেখে একজন দক্ষ টেকনিশিয়ান বুঝতে পারেন সে ঝিনুকে সেল স্লাইচ বসানো যাবে কি না। সেল স্লাইচ প্রবিষ্ট করার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত সুঁই এর মাথায় সেল স্লাইচটি নিয়ে গোনাডটির ছিদ্রপথে ঢুকিয়ে দিতে হবে। একই সাথে নিউক্লিয়াসও প্রবিষ্ট করা হয়। গ্রহীতা ঝিনুকের আকার ও স্বাস্থ্য বিবেচনা করে একই ঝিনুকে একাধিক মুক্তা বসানো যেতে পারে। বসানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, এগুলো যেন খুব ভেতরে কিংবা খুব বাইরে লাগানো হয় না। নিউক্লিয়াস ও স্লাইচ বসানোর কাজটি স্থায়ীভাবে, সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত করতে হয়। সর্বোচ্চ ১০ মিনিটের মধ্যে পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হয়। অন্যথায়, সেল স্লাইচ এবং গ্রহীতা ঝিনুক উভয়েই ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এবং এতে মুক্তার আকার, রং ও মান খারাপ হবে।

ছবি: গ্রাফটিং

সেল স্লাইচ বসানোর পর দ্রুততার সাথে গ্রহীতা ঝিনুকগুলোকে নির্ধারিত পুকুরে স্থানান্তর করতে হবে। এজন্য র‍্যাক বা ঝুলানো, যে পদ্ধতিই গ্রহণ করা হোক না কেন, পুকুরের প্রাকৃতিক খাবার, পানি সরবরাহের সুবিধা, মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে মাছের প্রজাতি ইত্যাদি বিবেচনায় রাখতে হবে। মুক্তা তৈরি হতে প্রায় ২ বৎসর সময় লাগে বিধায় এর পুরো সময়টাই নিবিড় তত্ত্বাবধানে রাখতে হয়। বিশেষত অস্ত্রোপচারের ফলে দুর্বল ও অবসাদগ্রস্থ ঝিনুকগুলো খুবই নাজুক থাকার কারণে প্রথম মাসটি এদের রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত নজরদারি থাকতে হবে। পুকুরে বিভিন্ন প্রাণী ঘনত্ব, পানির গুণাগুণ, পুকুরে ঝিনুকভোজী মাছ, রোগের প্রতিষেধক ব্যবহার, চুন প্রয়োগ ইত্যাদি বিবেচনা করা খুবই জরুরি।

মুক্তা আহরণ

নিবিড় চাষের মুক্তা ২-৩ বছরের মধ্যে আহরণ উপযুক্ত হয়ে থাকে। সাধারণত শীতকালে যখন পানির তাপমাত্রা ১৩-১৭° সেলসিয়াস তখন মুক্তা আহরণের উপযুক্ত সময়। ঝিনুককে

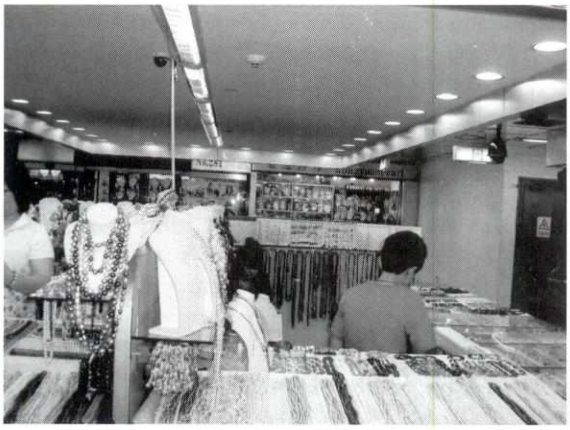

ছবি: চীনে একটি মুক্তার দোকান

সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে অথবা জ্যান্ত ঝিনুক থেকে সাবধানতার সাথে মুক্তা বের করা যায়। এ ক্ষেত্রে ঝিনুকটি পুনরায় মুক্তা চাষের জন্য উপযুক্ত করা সম্ভব।

আহরিত মুক্তার রং এবং মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য সাথে সাথে পানি দিয়ে ধুয়ে প্রক্রিয়াজাত করা প্রয়োজন। সাধারণত কিছুটা লবণাক্ত পানিতে ধৌত করার পর পরিস্কার পানিতে ধুয়ে ফেলতে হয়। বড় খামারের ক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রবন দিয়েও মুক্তা পরিস্কার করা হয়ে থাকে। সাধারণত এজন্য ২% ডডেসীল এলকোহল সোডিয়াম সালফেট দ্রবন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অতঃপর পলিশ করে গ্রেডিং করার পর বাজারজাত করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে মুক্তার যথেষ্ট বাজার থাকা সত্ত্বেও এর চাষের ইতিহাস খুব সমৃদ্ধ নয় এবং বর্তমানেও মুক্তা চাষ খুব উল্লেখযোগ্যভাবে হচ্ছে না। কক্সবাজার এবং ময়মনসিংহে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু মুক্তার চাষ হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে মুক্তা চাষ সম্প্রসারিত করার জন্য তাঁর সদয় আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যেই গণভবন পুকুরে পরীক্ষামূলক মুক্তার চাষ শুরু করেছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে মুক্তা চাষের ওপর একটি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে হাত দিয়েছে। বাংলাদেশে পর্যাপ্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মুক্তা চাষ জনপ্রিয় না হওয়ায় একটি অতীব সম্ভাবনাময় সম্পদ আমরা কাজে লাগাতে পারছি না। ঝিনুক চাষের জন্য উপযুক্ত প্রজাতির ঝিনুক এনে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় খাপ খাইয়ে, বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের জনবলকে এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছে এমন দেশে প্রশিক্ষণে পাঠিয়ে এবং জাতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে মুক্তা চাষকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় করে তোলা এখন একান্ত প্রয়োজন।

উপপরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা), মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্যচাষ সম্প্রসারণে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা : জলমহাল হস্তান্তর প্রসঙ্গ

ড. মোঃ মফিজুর রহমান

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। এ দেশটি পৃথিবীর অনন্য সুন্দর প্লাবনভূমি সমৃদ্ধ ওয়েটল্যান্ড। এখানে অসংখ্য খাল, বিল, নদীনালা, হাওর, বাঁওড়, পুকুরদীঘিসহ অন্যান্য জলাশয় ছিল এবং এখনো আছে। তবে প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট বহুবিধ কারণে বাংলাদেশের এসব জলাশয়ের অনেকগুলো ভরাট হয়ে গেছে, বহু নদনদী নাব্যতা হারিয়েছে, পানি শূন্য হয়ে মৎস্যচাষের অনুপোযোগী হয়ে গেছে। বাংলাদেশে সর্বমোট প্রায় ৪৫.৭৬ লক্ষ হেক্টর অভ্যন্তরীণ জলাশয় রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর (৮৮.৪৪%) মুক্ত জলাশয়। এসব প্রাকৃতিক উৎসে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যেতো। ষাটের দশকে মুক্ত জলাশয়ের মাছ উৎপাদন ছিল প্রায় ৮০%। কিন্তু সে সময়ের মৎস্যসম্পদে ভরপুর এ দেশের প্রাকৃতিক উৎসে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গেছে। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে দেশে মোট মাছের উৎপাদন ছিল প্রায় ২৯ লক্ষ মে.টন যার মাত্র ৩৫.৫২% মুক্ত জলাশয় থেকে এসেছে। প্রাকৃতিক উৎসে মাছের উৎপাদান কমলেও মোট মাছ উৎপাদন কিন্তু অনেক বেড়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে সরকারের মৎস্য সম্প্রসারণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বেসরকারি পর্যায়ে সাধারণ মানুষের অসম্ভব আগ্রহের কারণে।

বাংলাদেশের সকল ভূসম্পদের মালিকানা ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। মৎস্যচাষ ও এর সম্প্রসারণের দায়িত্ব মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত থাকলেও এ মন্ত্রণালয়ের নিজ মালিকানায় কোনো জলাশয় নেই। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় তার অধীনস্ত মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মৎস্য সম্প্রসারণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে অনেকগুলো জলমহাল হস্তান্তর করার মাধ্যমে মৎস্যচাষ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জলাশয় মৎস্য বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা না হলে বাস্তবে মৎস্য উৎপাদন আজকের পর্যায়ের উন্নীত করা সম্ভব হতো কিনা তা বলা মুশকিল। আলোচ্য জলাশয়গুলো মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে চলমান রেখেছে, গুণগত পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে মাছচাষে আগ্রহী করা সম্ভব হয়েছে, মা-মাছ রক্ষাসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, মানব দেহের প্রয়োজনীয় প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে, মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক উন্নতি ঘটিয়েছে এবং সর্বোপরি জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

জলাশয় হস্তান্তর প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য

আগেই বলা হয়েছে যে, সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিকানা ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট ন্যস্ত। শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৎস্য হ্যাচারি ও ছোট খাট কিছু খামার ব্যতীত মৎস্য অধিদপ্তরের মালিকানায় কোনো জলাশয় নেই। নিজস্ব মালিকানায় বা ব্যবস্থাপনায় কিছু জলাশয় না থাকলে মৎস্য অধিদপ্তর উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৎস্য চাষ, রেণু-পোনা উৎপাদন, পুকুর প্রস্তুতি, রোগবালাই দমন ইত্যাদি বিষয়গুলো কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে পারত না। এসব অসুবিধার কথা বিবেচনা করে সর্বপ্রথম ১৯৭৯ সালে তৎকালীন কৃষি মন্ত্রণালয় (মৎস্য বিভাগ তখন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত ছিল) কয়েকটি জলমহাল কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তরের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রস্তাব করলে ভূমি মন্ত্রণালয় একটি প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে ৬টি বাঁওড় হস্তান্তর করে। শুরু হয় মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে একটি নতুন ইতিহাসের।

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পভিত্তিক হস্তান্তরিত জলমহাল

ভূমি মন্ত্রণালয় ১৯৭৯ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে মৎস্য অধিদপ্তর তথা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিকট অনেকগুলো প্রকল্পের মাধ্যমে বেশকিছু জলমহাল হস্তান্তর করেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হলো:

১. বাঁওড় ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (OLP-1): এ প্রকল্পের আওতায় যশোর ও ফরিদপুর জেলার ৬টি বাঁওড় (বলুহর, জয়দিয়া, ফতেপুর, কাঠগড়া, মর্জাদ ও বেড়গোবিন্দপুর বা ডায়নার বিল) ১৯৯৭ সনে থেকে ৩০ বছরের জন্য হস্তান্তরিত হয় যা প্রতি দশ বছর পরপর নবায়ন করার সিদ্ধান্ত ছিল। প্রকল্পটির উন্নয়ন ফেইজ বিশ্বব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় ১৯৭৯-৮০ খ্রি. সালে শুরু হয়ে ১৯৮৫-৮৬ খ্রি. সালে সমাপ্ত হয়। প্রকল্প সমাপ্ত হবার পর বর্তমানে রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত জলমহালগুলো ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ খ্রি. পর্যন্ত ১০ বছরের জন্য নবায়ন করা ছিল। পরবর্তী ১০ বছরের জন্য নবায়নের প্রস্তাব করা হলেও নানা জটিলতায় এখনো নবায়ন হয়নি।

২. ইফাদ সাহায্যপুষ্ট বিল ও বাঁওড় মৎস্য উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (OLP-2): এ প্রকল্পের আওতায় ২৩টি বাঁওড় ০৬/২/১৯৯৬ খ্রি. তারিখে স্বাক্ষরিত একটি বিনিময়পত্র অনুযায়ী ৫০ বছরের জন্য বাঁওড়গুলো হস্তান্তর করা হয়। মেয়াদ শেষ হবে ২০৩৯ সনে। প্রতি দশ বছর পরপর নবায়ন করার বিধান রয়েছে। সর্বশেষ নবায়ন অনুযায়ী আগামী ২০১২ সালের শেষভাগ পর্যন্ত নবায়ন বলবৎ আছে। ইফাদ প্রকল্পভুক্ত ২৩টি বাঁওড়ের মধ্যে ঝিনাইদহ জেলার মধ্যে ৬টি বাঁওড়ের (নারায়নকান্দি কায়েতপাড়া, পোড়াপাড়া, নস্তি, সাগান্না, সর্জাদ ও সস্তা বাঁওড়) ইজারার মেয়াদ থাকা সত্ত্বেও নিয়ম বহির্ভূতভাবে দখল নিয়ে সেগুলো ইজারা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট সিদ্ধান্ত চেয়েছেন।

৩. মৎস্যচাষ উন্নয়ন প্রকল্পের বাঁওড়সমূহ (ইফাদ প্রকল্প, ফরিদপুর কেন্দ্রিক): এ প্রকল্পের আওতায় সরকারি ২০টি বাঁওড় অন্তর্ভুক্ত। প্রকল্প মেয়াদ ছিল ১৯৯৮ হতে ২০০৬ খ্রি.

পর্যন্ত। প্রকল্প শেষ হওয়ার পর বর্তমানে রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত হচ্ছে। এসব বাঁওড়ের ইজারা মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০২০ সন পর্যন্ত মেয়াদ আছে। শুধুমাত্র ফরিদপুরের ধোপাডাঙ্গা বাঁওড়ের মেয়াদ এপ্রিল ২০১৬ খ্রি. তারিখে শেষ হয়। জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর উক্ত বাঁওড়টি নবায়নের অনুমতি দিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করেছে। অন্যদিকে একই প্রকল্পের পুড়াখালি বাঁওড়টি জেলা প্রশাসক, যশোর পরবর্তী ১০ বছরের জন্য ইতোমধ্যেই ইজারা মেয়াদ নবায়ন করেছেন।

৪. The Management of Aquatic Ecosystems through Community Husbandry (MACH) প্রকল্প: এ প্রকল্পে ৩০টি জলমহাল যা বিভিন্ন সময়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর হয়। প্রকল্পের আওতায় বিল খনন, অভয়াশ্রম স্থাপন, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। বাইক্যা বিলে স্থায়ী অভয়াশ্রম ও ওয়াচিং টাওয়ার স্থাপন, বনায়ন ইত্যাদি করা হয়। প্রকল্পের বাইক্যা বিল জাতীয় পর্যায়ের একটি অভয়াশ্রম যেখানে বন্য প্রাণী ও মাছের সংরক্ষণ হচ্ছে। প্রকল্পের সম্পদ ব্যবহারকারী দলের সংখ্যা ৯০টি, সুফলভোগী ১৯৯৮ জন। মাচ (MACH) প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ায় এ প্রকল্পের জলাশয়সমূহ (৩০টি) বর্তমানে IPAC প্রকল্পভুক্ত করা হয়েছে। এ জলমহালসমূহ IPAC প্রকল্পের অনুকূলে ১০ বছরের জন্য নবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৫. Community Based Fisheries Management Project (CBFM) প্রকল্প: এ প্রকল্পের আওতায় মোট ১১৬টি জলমহাল অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে এগুলোর মধ্যে অনেকগুলো বেসরকারি জলমহাল থাকায় সেগুলো হস্তান্তর হয়নি। সিবিএফএম প্রকল্পে প্রত্যক্ষ সুফলভোগী ২৩০৯৬ জন এবং পরোক্ষ ১১৩০২৯ জন। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১৮৬টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য যে, সিবিএফএম প্রকল্পের অসাধারণ সফলতার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ২০০৭ সনে Consultative Group of International Agricultural Research (CGIAR) এর আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়। এক্ষণে সিবিএফএম প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ায় উক্ত প্রকল্পের জলমহালগুলোর মধ্য থেকে ১২টি IPAC এবং ৪০টি Fisheries Livelihood প্রকল্পের অনুকূলে অর্থাৎ মোট ৫২টি জলমহাল ১০ বছরের জন্য নবায়নের প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৬. নতুন জলমহাল নীতিমালাভুক্ত উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলমহালে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প: এ প্রকল্পে ৩৩টি জলমহাল অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'জাতীয় মৎস্যজীবী সমিতি' এ প্রকল্পের উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান। এ প্রকল্পের আওতায় ২৫টি পাইপ/বক্সকালভার্ট, ১৬টি সুফলভোগীদের অফিস-কাম-ট্রেনিং সেন্টার ১৩টি ইঞ্জিন নৌকা এবং ২০টি সাধারণ নৌকা জেলেদের মাঝে সরবরাহ করা হয়। ১৯৫১৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয় ১৩টি। ৩৩টি জলমহালের মধ্যে ৮টি জলমহাল বিভিন্ন সমস্যার কারণে প্রতিস্থাপন ও নবায়ন এবং ২৫টি শুধু রাজস্ব বাজেটে ব্যবস্থাপনার জন্য নবায়ন প্রয়োজন হবে। এদিকে জলমহালগুলো যথাসময়ে নবায়ন না হওয়ায় এর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে যার ফলে উৎপাদন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ ৩৩টি জলমহালের মধ্যে ২৫টি নবায়ন এবং বাকী ৮টি জলমহাল প্রতিস্থাপনসহ ১০ বছরের নবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৭. ৪র্থ মৎস্য প্রকল্প (Fourth Fisheries Project): এ প্রকল্পের আওতায় ৪৩টি জলমহাল হস্তান্তর করা হয়েছিল। এ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় ২০০৫ সনে। আগামী ৩০ চৈত্র অধিকাংশ জলমহালের ইজারা মেয়াদ শেষ হবে। প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলোর মধ্যে ছিল জলাশয় সংস্কার, অভয়াশ্রম স্থাপন, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, ঋণ কার্যক্রম, পোনা অবমুক্তি, বিল নার্সারি স্থাপন, সমাজভিত্তিক সংগঠন সৃষ্টি ইত্যাদি। এ প্রকল্পের ৪৩টি জলমহালের সবগুলোই ফিসারিজ লাইভলিহুড প্রকল্পের অনুকূলে ১০ বছরের জন্য নবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৮. অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আবাসস্থল পুনরুদ্ধার প্রকল্প: এ প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন স্থানের ৩৯টি জলমহাল ২০০৭ সালে দশ বছরের জন্য ন্যস্ত করা হয়। মূলত দেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মাছের আবাসস্থল অক্ষুন্ন রাখাসহ দেশজ প্রজাতির বিভিন্ন মাছকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মেয়াদ আগামী ২০১৭ সালে শেষ হবে এবং নবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৯. নিমগাছি মৎস্য চাষ প্রকল্প: এ প্রকল্পটির আওতায় ৭৮৩টি পুকুর অন্তর্ভুক্ত। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয় একসঙ্গে থাকার সময় থেকেই উক্ত জলাশয়গুলো মৎস্য অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ছিল। ১৯৮৬ সালে সামরিক শাসনামলে সরকারের এক সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশনকে ২৫ বছরের জন্য একটি সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়। ২০১১ সনের জানুয়ারি মাসে এগুলোর মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় সরকারের সিদ্ধান্তে এগুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বুঝে নেওয়া হয়। বর্তমানে বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। নিমগাছি প্রকল্পের এ জলাশয়সমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একটি নীতিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী সামাজিক ব্যবস্থাপনায় মৎস্যচাষ নিশ্চিত করার নিমিত্ত অবিলম্বে উক্ত জলাশয়সমূহ মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় নবায়ন হওয়া আবশ্যক।

জলাশয় হস্তান্তরের শর্তাবলী

ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর সংক্রান্ত চুক্তি/সমঝোতা স্মারকের শর্তাবলী সবক্ষেত্রেই প্রায় একই রকম। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- জলাশয়গুলো প্রকল্পের পিপি অনুযায়ী পরিচালিত হবে, পুনরায় ইজারা বা উপ-ইজারা দেয়া যাবে না, প্রয়োজনে সংস্কার করা যাবে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে, জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কিছু করা যাবে না, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা মূল্য পরিশোধ করতে হবে, আয়তন ও পরিসীমা সংরক্ষণ

করতে হবে, ভূমি মন্ত্রণালয় যেকোনো সময় পরিদর্শন করতে পারবে এবং জেলা জলমহাল কমিটি প্রতি বছর ৩০ চৈত্রের মধ্যে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ে জমা দেবে। পরপর দু'বছর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হলে প্রকল্পভুক্ত জলাশয় ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রত্যার্পিত হবে।

হস্তান্তরিত জলাশয় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তরিত জলাশয়গুলো প্রধানত ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি/সমঝোতা স্মারকের শর্ত মোতাবেক সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলে/মৎস্যজীবীগণকে নিয়ে একটি সমিতি গঠনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। সমাজভিত্তিক দল গঠনের মাধ্যমে জেলে/মৎস্যজীবীগণ নিজেরা মাছচাষ করে এবং জেলা জলমহাল কমিটি/উপজেলা জলমহাল কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ইজারামূল্য পরিশোধ করে থাকে। উৎপাদিত মাছসহ অন্যান্য সুবিধাও সংশ্লিষ্ট জেলে/মৎস্যজীবীগণ ভোগ করে থাকেন। এখানে মৎস্য অধিদপ্তর শুধুমাত্র কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মাছের পোনা সরবরাহ করাসহ প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকে। মৎস্য অধিদপ্তর কোন অবস্থাতেই বর্ণিত জলাশয়সমূহ সাব-লীজ প্রদান করে না বা কোনো আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করে না।

মৎস্য সম্প্রসারণে হস্তান্তরিত জলাশয়ের ভূমিকা

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক হস্তান্তরিত জলাশয়গুলো সার্বিকভাবে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো-

১. সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম ও মাছের উৎপাদন: আলোচ্য জলমহালগুলো মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর হওয়ার পূর্বে অধিকাংশগুলোতেই মাছের চাষ হতো না; বরং প্রাকৃতিকভাবেই যা কিছু উৎপাদন হতো। বেশিরভাগ জলমহালই কচুরিপানাসহ বিভিন্ন জলজ আগাছায় পরিপূর্ণ ছিল। মৎস্য অধিদপ্তরে সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় এ সকল জলমহালের আগাছা অপসারণসহ সার্বিক অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মাছচাষের আধুনিক কলাকৌশল ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৭৯-৮০ সালে ৬টি বাঁওড়ে হেক্টর প্রতি মাছের গড় উৎপাদন ছিল মাত্র ৮০-১০০ কেজি যা প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পর থেকে ক্রমাগতভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হেক্টর প্রতি গড়ে প্রায় ৪০০ কেজিতে এবং রানী মাছসহ (চাষবিহীন অন্যান্য দেশীয় প্রজাতির গুড়ো মাছ) হেক্টর প্রতি ছোট মাছের গড় উৎপাদন প্রায় ৭৫০ কেজিতে উন্নীত হয়েছে।

২. আয় বৃদ্ধি: মৎস্য অধিদপ্তরে সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের কারণে প্রতিটি জলমহালের সঙ্গে যুক্ত সাধারণ মৎস্যজীবীদের আর্থিক উন্নতি হয়েছে যেমন: শুধুমাত্র যশোর ঝিনাইদহের ৬টি বাঁওড়ে ১৯৮৫-৮৬ সাল থেকে ২০০৭-২০০৮ সাল পর্যন্ত ১৪৫১.১৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ৯৭০৩.৪৯৫ মে.টন কার্পজাতীয় মাছ উৎপাদিত হয়েছে যা বাজারজাতকরণের মাধ্যমে ২৭৫২.৫০১ লক্ষ টাকা আয় করা হয়েছে। প্রকল্পটি শুরুর পূর্বে মৎস্যজীবীদের মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ছিল মাত্র ১৫০-১৬০ টাকা। বর্তমানে মৎস্যজীবীদের মাথাপিছু গড় আয় প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য প্রকল্পের সাধারণ মৎস্যজীবীদের আয় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

৩. গুণগত মানসম্পন্ন পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ: বাঁওড় ও অন্যান্য জলাশয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের মৎস্যজীবীদের মধ্যে উন্নত প্রজাতির কার্পজাতীয় মাছের গুণগত মানসম্পন্ন রেণু প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মৎস্য অধিদপ্তর বহুসংখ্যক হ্যাচারি ও মৎস্য খামার স্থাপন করেছে। ফলে দেশের প্রায় সর্বত্র মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও নার্সারি মালিকদের মধ্যে উন্নত প্রজাতির কার্পজাতীয় মাছের গুণগত মানসম্পন্ন রেণু সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সর্বত্র রেণু প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করার কারণেই আজ বাংলাদেশের মাছের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

৪. প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি: ভূমি মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত জলমহালসমূহকে ব্যবহার করে গৃহীত কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর কেন্দ্রীয় মৎস্য হ্যাচারি কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে এতদাঞ্চলের সর্ববৃহৎ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ইফাদ প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুরের ২৪টি বাঁওড়সহ সমগ্র আঞ্চলিক পর্যায়ে মৎস্যজীবীদের বাঁওড় ব্যবস্থাপনাভিত্তিক যেমন: বাঁওড়ের উৎপাদন পরিকল্পনা, বাঁওড় বায়োলজি ও ইকোলজি, পুকুর প্রস্তুতি, পোনা মজুদ ও লালন-পালন, বাঁওড়ের মৎস্য আহরণ পদ্ধতি ও মৎস্য আহরণ এবং বিপণন ও বাজারজাতকরণসহ নানাবিধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, বেকার যুব পুরুষ ও মহিলা, স্কুল শিক্ষক ও এনজিও কর্মীসহ মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদের মৎস্যচাষ বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

৫. মা মাছ রক্ষাসহ সার্বিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ: বাংলাদেশে এক সময় বিভিন্ন প্রজাতির বহুসংখ্যক মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণী পাওয়া যেত। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি, উন্নয়ন প্রকল্প, রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং সর্বোপরি প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে এখানকার অনেক জলাশয় আজ মৃত এবং বহু প্রজাতির মাছ, জলজ প্রাণী হারিয়ে যাচ্ছে। বেসরকারি পর্যায়ে ইজারা গ্রহণকৃত বাঁওড় বা জলমহালসমূহের ইজারাদারদের মাছচাষ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না থাকায় এবং অধিক মুনাফা লাভের আশায় নামমাত্র পোনা মজুদ করে এবং শুধুমাত্র পূর্বতন বছরসমূহের পুরাতন মাছ অতিরিক্ত আহরণ করে জলাশয়সমূহ মৎস্য শূন্য করার অপপ্রয়াস চালায়। অন্যদিকে প্রকল্পভুক্ত বাঁওড় ও জলাশয়ে মৎস্য সংরক্ষণ আইন যথাযথভাবে মেনে চলা হয়। তাছাড়া বাঁওড় ও জলাশয়ের প্রতিটিতে একটি করে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যাতে মা মাছ ধরা না হয় এবং কোনো প্রজাতি চিরতরে হারিয়ে না যায়। তা ছাড়াও শীতকালসহ সারাবছর প্রকল্পভুক্ত বাঁওড়সমূহে বিভিন্ন প্রজাতির পাখিসমূহ অবাধে বিচরণ করে।

৬. মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক উন্নতি: মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ন্যস্ত বাঁওড় এবং অন্যান্য জলাশয়ের মৎস্যজীবীদের আর্থিক উন্নতি চোখে পড়ার মত। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্যজীবীগণ প্রকল্পের পূর্বাবস্থার তুলনায় বর্তমানে অনেক ভাল অবস্থায় খেয়ে পরে জীবিকা নির্বাহ করছেন। বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অনেকের এখন সুন্দর বাড়ি হয়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে, অনেক মৎস্যজীবী জেলের বাড়ি আধাপাকা, অনেকের ঘরে টেলিভিশনও আছে। বিশেষ করে বাঁওড় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মৎস্যজীবীগণ স্বচ্ছল হওয়ার কারণে বর্তমানে প্রতিটি বাড়ীতেই স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, পানীয় জলের সুব্যবস্থা থাকায় তারা স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করছেন। ফলশ্রুতিতে এখন মৎস্যজীবীদের অনেকেরই সামাজিক অবস্থানেরও উন্নতি ঘটেছে।

৭. জাল যার জলা তার নীতির প্রতিফলন: মৎস্য অধিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের কারণে প্রতিটি জলমহালের আশে পাশের মৎস্যজীবীগণই (প্রকৃত জেলে পরিবার) নিজেরা কমিটি গঠন করে মৎস্যচাষসহ জলাশয়টি রক্ষণাবেক্ষণ করছে এবং মৎস্য আহরণ ও বিপণন করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে প্রকল্প নির্ধারিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সুফলভোগীরা সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লাভজনক পর্যায়ে মাছ উৎপাদন করছে এবং আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে তাদের জীবনজীবিকার মান উন্নয়ন করেছে। সেখানে কোন ধরনের রাজনৈতিক বা পেশী শক্তির প্রভাব নেই। প্রকৃত মৎস্যজীবীগণই জলমহালের ব্যবস্থাপনাসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে এবং জলমহাল থেকে সুফল ভোগ করছে। সুতরাং সরকারের জাল যার জলা তার নীতি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে।

৮. জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান : আগেই বলা হয়েছে, মৎস্য অধিদপ্তরের নিজস্ব কোন জলমহাল বা জলাশয় নেই, ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মাছের আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশে মৎস্যচাষে এক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ এবং দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মাছের ব্যাপক উৎপাদন এবং বহু মানুষের মাছ চাষে নিয়োজিত হওয়ার ঘটনাই তাঁর প্রমাণ বহন করে। বিভিন্ন বাঁওড়, কেন্দ্রীয় মৎস্য হ্যাচারি কমপ্লেক্স, মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করায় দেশের প্রাকৃতিক উৎস নদনদী, খালবিলে মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। মৎস্যখাত দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ বেকার সমস্যা সামাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নবায়ন প্রস্তাব ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক উদ্যোগ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তরিত এসব জলমহালের প্রায় অধিকাংশগুলোরই মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই নবায়ন প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি ভূমি মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যে সকল প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে সে সকল জলমহাল ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট ন্যস্ত হবে এবং সেগুলো জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৯ অনুযায়ী জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে ইজারা দেয়া হবে। এ বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এপ্রিল ২০১১ তে ভূমি মন্ত্রণালয় এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, প্রকল্পের মাধ্যমে কোনো জলমহাল ব্যবস্থাপনার প্রস্তাব থাকলে সেগুলোর নবায়ন প্রস্তাব অনুমোদন করা হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তরিত অনেক প্রকল্পের মেয়াদ অনেক আগেই শেষ হয়ে যাবার পর রাজস্ব বাজেটের আওতায় সেসব প্রকল্পের জলাশয়গুলোতে মৎস্যচাষ অব্যাহত রয়েছে। সেখানে নতুন করে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না, অথচ জলমহালগুলোর নবায়ন প্রস্তাব অনুমোদিত না হলে মৎস্যচাষে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটবে। শুধুমাত্র ইজারা দেয়া হলে হয়ত রাজস্ব কিছুটা বেশি পাওয়া গেলেও মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এ বিষয়টি বিবেচনা করে ভূমি মন্ত্রণালয় আরো সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, প্রকল্প গ্রহণ সম্ভব না হলেও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় যদি একটি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দাখিল করে সেক্ষেত্রেও নবায়ন প্রস্তাব অনুমোদন করা হবে। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যেই প্রতিটি প্রকল্পের জলমহালের জন্য একটি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দাখিল করেছে।

আমরা সকলেই জানি যে, প্রাণিজ আমিষ মানব দেহের জন্য অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশের প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৫৮% আসে মৎস্য খাত থেকে। ২০২১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা হবে ১৭.১১ কোটি (অনুমিত) এবং সে সময় দেশে মাছের চাহিদা দাঁড়াবে ৩৯.১০ লক্ষ মে.টন (অনুমিত)। বর্ধিত জনসংখ্যার পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মাছ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৪১.৩৯ লক্ষ মে.টন। কিন্তু মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিকট বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে হস্তান্তরিত জলাশয়সমূহ ব্যবস্থাপনার সুযোগ না পেলে ভিশন: ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না। এতে খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে সরকারের ভিশন ও মিশন উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন বাঁওড় এবং কমবেশি ১৭৪টি জলমহালের ইজারা মেয়াদ (উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ থেকে) পরবর্তী ১০ (দশ) বছরের জন্য নবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। এসব জলমহাল মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর/নবায়নের প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয় আরো সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবে বলে সকলের দৃঢ় বিশ্বাস।

উপসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

জলাভূমিতে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

মোঃ আবুল হাশেম[১] ও মোঃ তৌহিদুর রহমান[২]

বাংলাদেশ হিমালয়ের পাদদেশে একটি পলিবাহিত ব-দ্বীপ অঞ্চল যেখানে পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা এ তিনটি বড় নদীসহ শতাধিক নদী বহমান। এ দেশে প্রাণিবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ বিস্তীর্ণ নদী বিধৌত অঞ্চলসহ উন্মুক্ত অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পরিমাণ মোট ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর। অতীতে এ সকল জলাশয় মাছ ও অন্যান্য জলজ সম্পদে ভরপুর ছিল কিন্তু কালের বিবর্তনে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে এ সকল জলাশয়ে বর্তমানে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব দেখা দিয়েছে। বৈশ্বিক আবহাওয়া পরিবর্তন, জনসংখ্যার আধিক্য, অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত সেচ ও পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থলের চরিত্রগত পরিবর্তন ও সঙ্কোচনের কারণে জলাভূমিতে প্রাকৃতিক সম্পদ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া জলাভূমির প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল গরিব জনগোষ্ঠীর ওপরে পড়েছে। অপরদিকে প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাসের কারণে জলাভূমিতে জীববৈচিত্র্যও হ্রাস পেয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে বর্তমানে বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, আবাসস্থল পুনরুদ্ধার ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ একান্ত অপরিহার্য। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী, স্থানীয় সরকার ও নীতিনির্ধারকবৃন্দের সম্মিলিত প্রয়াসে জলাভূমিতে তার পূর্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসহ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

জলাভূমির বৈশিষ্ট্যসমূহ

জলাভূমির আবহাওয়া, মাটি, পানি এবং জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময়। জলাভূমিতে প্রধানত মিনারেল এবং অরগানিক অথবা পেটি মাটি থাকে। উচ্চ পরিমাণে জৈব পদার্থ থাকায় এ মাটি অত্যন্ত উর্বর হয়। ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণিসম্পদে জলাভূমি অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। শস্য উৎপাদন, সামাজিক, অর্থনৈতিক অপরিহার্যতার পাশাপাশি জীবনধারণের জন্য জলাভূমি (১) বৃষ্টি ও বন্যার পানির আধার, (২) ভূগর্ভস্থ পানির পুনর্ভরণের উৎস, (৩) সুপেয় পানির উৎস (৪) পলি নিয়ন্ত্রক (৫) বিভিন্ন প্রাণীর আবাসস্থল বিচরণ ও প্রজননক্ষেত্র ও (৬) জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ মোকাবেলা ও ভূমিধ্বস রোধে অনন্য ভূমিকা পালন করে।

জলাভূমির প্রাকৃতিক সম্পদের সহ-ব্যবস্থাপনা

জলাভূমির প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়ায় এ সম্পদ পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের জন্য টেকসই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলন করা প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পদ ব্যবহারকারী সুফলভোগী জনগোষ্ঠী, সরকারি প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, কর্মকর্তা ও উন্নয়ন সহযোগীদের সমন্বয়ে জলাভূমিতে প্রাকৃতিক সম্পদের সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এ ব্যবস্থাপনায় পারস্পরিক জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায় এবং দুর্বলতা দূর করে।

জলাভূমির প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারকারী ও স্টেকহোল্ডার

জলাভূমির প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারকারীদের মধ্যে রয়েছে জলাভূমির চারিদিকে বসবাসরত হতদরিদ্র ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র ও মধ্যম ফসল চাষি, জমির মালিক, ইজারাদার, মৎস্যজীবী ও মৎস্যব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী এবং মধ্যস্বত্বভোগী, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী। জলাভূমির সম্পদ আহরণকারী এ সকল শ্রেণী এ সম্পদের টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে না বিধায় এ সম্পদের টেকসই উন্নয়নের জন্য সম্পদ ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার সাথে সংযুক্ত করা প্রয়োজন।

জলাভূমির প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে রয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়, বন ও পরিবেশমন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থা, বোর্ড, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সরকারের সদস্য, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ইত্যাদি, এছাড়া বেসরকারি সংস্থা/ উন্নয়ন সহযোগী এবং সম্পদ ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী, সুফলভোগী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। তবে স্থান, কাল ও সম্পদ ভেদে স্টেকহোল্ডার ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন এবং ফলাফল লাভের সম্ভাবনার ওপর সম্পদের সঠিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ নির্ভর করে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি জলাভূমি ব্যবহার করার সুযোগ লাভ করে।

সমাজভিত্তিক সংগঠন

জলাভূমির সম্পদকে কেন্দ্র করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ এবং ঐ সম্পদের ওপর পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল নানা পেশা, শ্রেণী, বয়স ও লিঙ্গভুক্ত জনগোষ্ঠীর সমন্বিত সংগঠনকে সমাজভিত্তিক সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে। এ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য সমাজভিত্তিক সংগঠন ও সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলন করা হলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা, অভিজ্ঞতা বিনিময়, মাঠ স্কুলে অংশগ্রহণ এবং হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজভিত্তিক সংগঠনের দক্ষতা উন্নয়ন করা সম্ভব। সফলভাবে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি সংগঠনের ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। প্রত্যেক শ্রেণী, পেশার মানুষের মধ্যে সুফল লাভের দ্বন্দ্ব সার্বিক উন্নয়নকে ব্যাপকভাবে প্রতিহত করার সম্ভাবনা আছে বিধায় সর্বোচ্চ সুফল লাভের জন্য শ্রেণী স্বার্থ ও দ্বন্দ্ব নিরসন একান্ত প্রয়োজন।

জলাভূমির প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন অত্যন্ত কার্যকর। এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সমাজভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলা যেতে পারে এবং সকল কমিউনিটির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সমাজভিত্তিক সংগঠনের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য সিবিও নেটওয়ার্কিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার

যে কোনো প্রতিবেশ (ecosystem) ব্যবস্থার জীববৈচিত্র্য এর আবাসস্থলের মানের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ জলাভূমি আনুমানিক ৭ কোটি দরিদ্র লোকের খাদ্য ও আয়ের সংস্থান করে কিন্তু বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এবং পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো মাছের স্বাভাবিক চলাচল পথ বন্ধ করে দিয়েছে। সেচ ব্যবস্থা ধান উৎপাদন বৃদ্ধি করলেও শুষ্ক মৌসুমে জলজ জীবের আবাসস্থল বহুলাংশে হ্রাস করেছে। শিল্প কারখানা সম্প্রসারণের ফলে পানি ব্যাপকভাবে দূষিত হচ্ছে। অধিক মাত্রায় গাছপালা কাটার ফলে বনাঞ্চল ক্রমাগতভাবে বিলীন হচ্ছে। এছাড়া পাহাড়ের ঢালে ক্ষতিকর পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণ পলি জমে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে সমগ্র প্লাবনভূমির (বিল, হ্রদ, এবং খাল-খন্দ, মৌসুমভিত্তিক প্লাবনাঞ্চল, নদী এবং ছড়া/ঝরা, পাহাড়ি নদী ইত্যাদি) প্রতিবেশ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার এবং এর সকল সম্পদ যেমন মাছ, উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণীর উৎপাদনশীলতা ও টেকসই প্রবৃদ্ধি জরুরি হয়ে পড়েছে।

জলাভূমিতে জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণকল্পে সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

(ক) মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন: মাছের সর্বোচ্চ মজুদ, টেকসই উৎপাদন ও মাছের প্রজাতি বৈচিত্র্য রক্ষায় জলাভূমিতে মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা একটি সফল ব্যবস্থাপনা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। জলাভূমির মূল আয়তনের শতকরা ৫-১০ ভাগ এলাকা, নদী বা হাওরের গভীরতম অংশ এবং প্লাবনভূমিতে গুচ্ছ বিলের যেখানে সারা বছর পানি থাকে এমন বিলে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা যায়।

(খ) মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণ: মৎস্য অভয়াশ্রম বা সংরক্ষিত এলাকা প্রতিষ্ঠা, নির্দিষ্ট সময়ে মাছ ধরা থেকে বিরত রাখা, ক্ষতিকর সরঞ্জাম দিয়ে মাছ ধরা বন্ধ রাখা, মৎস্য আহরণের ক্ষতিকর পদ্ধতি বন্ধ করা এবং পোনা/রেণু ধরা বন্ধ করা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলাভূমিতে মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

(গ) শস্য বহুমুখীকরণ: বোরো ধান চাষে শীতকালীন রবিশস্যের তুলনায় ৩-৪ গুণ সেচের প্রয়োজন হয় এবং বিল, খাল ও নদী থেকে এ পানি সংগ্রহ করা হয়। শুষ্ক মৌসুমে একদিকে যেমন জলাভূমিতে পানির পরিমাণ কমতে থাকে অন্যদিকে বোরো ধান সেচ দেয়ার জন্যে বিল সেচে পানি উত্তোলন করার ফলে মাছসহ জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী ঝুঁকির মুখে পড়ে। এ সকল কারণে শুষ্ক মৌসুমে বোরো ধানের পরিবর্তে রবি শস্যের চাষ প্লাবনভূমির উৎপাদন ও প্রয়োজনীয় পানি রক্ষার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(ঘ) স্লুইস গেট ব্যবস্থাপনা: স্লুইস গেট মৎস্যসম্পদ উৎপাদন ও প্রজাতি বৈচিত্র্য রক্ষায় নেতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। সে কারণে মৎস্যবান্ধব উপায়ে এসকল স্লুইস গেট ও রেগুলেটর ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি এটিকে মৎস্যবান্ধব হিসেবে ব্যবস্থাপনা করা যায় তাহলে ফসলের কোন ক্ষতি না করেও মাছে ন্যূনতম অভিপ্রয়াণ সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব যার ফলে জলাভূমিতে মাছের উৎপাদন ও প্রজাতি বৈচিত্র্য বাড়বে।

(ঙ) মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন: পলিতে ভরাট হওয়া জলাভূমির গভীরতা বৃদ্ধি করার জন্য খনন করা প্রয়োজন যাতে শুষ্ক মৌসুমে এটি বেশি পরিমাণ পানি ধারণ করে রাখতে পারে যেখানে মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণী নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারে। নদী ও বিলের সাথে সংযুক্ত ভরাট হওয়া খাল খনন করার মাধ্যমে বর্ষার শুরুতে মাছ সহজে যাতায়াত করতে পারে। বিলের ধারে বৃক্ষ রোপণ এবং জলাভূমির ধারের বনাঞ্চলসমূহ পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন।

(চ) বিপন্ন প্রজাতির মাছ মজুদ: পলি ভরাট ও প্রকৃতি পরিবর্তনের কারণে জলাভূমিতে আবাসস্থল ধ্বংস এবং অতি আহরণের কারণে মৎস্য প্রজাতি দিনে দিনে আরো বিপন্ন হয়ে পড়ছে। স্থানীয় পর্যায়ে বিপন্ন প্রজাতির পরিপক্ব ও ডিমওয়ালা মাছ এবং মাছের পোনা অবমুক্ত করার মাধ্যমে জলাভূমিতে মৎস্য বৈচিত্র্য ও উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।

উন্নয়ন এবং প্লাবনভূমির ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

উক্ত প্রকল্পের সার্বিক ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

সার্বিক উদ্দেশ্য

অবক্ষয়িত জলাভূমিসহ ক্ষতিগ্রস্থ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি জলাভূমি সম্পদের ওপর নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রকল্প এলাকায় সমন্বিত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তন এবং এর টেকসই চর্চা নিশ্চিত করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- প্রকল্প এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নয়ন
- জলাভূমির ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের আয় বৃদ্ধিকরণ ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি
- জলাভূমির ওপর নির্ভর বন্যপ্রাণীর বিভিন্ন প্রজাতি ও সংখ্যা বৃদ্ধি
- জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

প্রকল্প কার্যক্রম

ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রিহ্যাবিলিটেশন প্রকল্প (WBRP) এর মূল কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- সমন্বিত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য লক্ষ্য জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সমাজভিত্তিক সংগঠন গঠন
- লক্ষ্য জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্ষমতায়ন ও গোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ
- জলাভূমিতে জলজপ্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ও সংযোগ খাল উন্নয়ন
- বিলুপ্তপ্রায় জলজপ্রাণীর মজুদ, পরিবেশবান্ধব স্লুইসগেট পরিচালনা ও বনায়নের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- জলাভূমিতে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নকল্পে উপযোগী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- জলাভূমির সম্পদের ওপর চাপ হ্রাসকল্পে বিকল্প আয় সৃষ্টি ও বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
- পরিবেশবান্ধব জলাভূমির সম্পদ ব্যবহার সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

দেশের উন্নততর জলাভূমির প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সার্বিক স্বার্থে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন বিশেষ প্রয়োজন। আন্তঃমন্ত্রণালয় তথা সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের আওতায় গৃহীত জলাভূমি নির্ভর প্রকল্প ও কর্মসুচীসমূহ বাস্তবায়ন একান্ত অপরিহায। যা হবে প্রকৃত অর্থেই দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর।

১. প্রকল্প পরিচালক, ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রিহেবিলিটেশন প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

২. সহকারী প্রকল্প পরিচালক, ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রিহেবিলিটেশন প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

(ছ) জলাভূমি বনায়ন: জলাভূমির পাড়ের স্থিতিশীলতা রক্ষা, সকল জলজপ্রাণীর সহাবস্থান নিশ্চিত করা ও জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধির জন্য বনায়ন করা একান্ত প্রয়োজন। পানি প্রবাহ এলাকা এবং জলাভূমির পাড়ের গাছ তাড়াতাড়ি বড় হয় বলে তা জলাভূমির সম্পদ ব্যবহারকরীদের আয়ের উৎস হিসেবেও কাজ করে।

(জ) দূষণ নিয়ন্ত্রণ: জলাভূমি দূষণের ফলে শুধুমাত্র মাছ বা অন্যান্য জলজপ্রাণীই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, জলাভূমি সম্পদের ওপর সরাসরি নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীও মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রয়োজন এবং একটি কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের ওপর নজরদারী বজায় রাখা দরকার।

উল্লেখ্য, উপরিল্লিখিত বিষয়সমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক 'ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রিহেবিলিটেশন প্রকল্প (WBRP)' শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং জার্মান ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন, GIZ এর মাধ্যমে জার্মান সরকারের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয় এর সার্বিক সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি পদ্মা ও যমুনা নদীর মিলন স্থল-পাবনা জেলার বেড়া, সাথিয়া ও সুজানগর উপজেলায় উন্মুক্ত জলাভূমিতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, মৎস্যসম্পদ

উপকূলীয় অঞ্চলে জৈব পদ্ধতিতে মাছ ও চিংড়ি চাষ (ORGANIC AQUACULTURE)

ডা. আফতাবুজ্জামান

জৈব পদ্ধতির উৎপাদন ব্যবস্থা এখন বিশ্বজুড়ে এক নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। আধুনিক সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং যাচাই-বাছাই এর পর বিজ্ঞানীরা খাদ্যনিরাপত্তা এবং মানুষের সুস্বাস্থ্যের বিবেচনায় সে প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন। পরিবেশবান্ধব জৈব পদ্ধতির মাধ্যমে চাষাবাদকৃত খাদ্য দ্রব্যই এখন বিশ্বজুড়ে সচেতন নাগরিকদের কাছে অধিক সমাদৃত। মাছ চাষের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। অনেক দেশ বিশেষ করে ভিয়েতনাম জৈব পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ করে পাঙ্গাস এবং তেলাপিয়ার ফিলে বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে রপ্তানি করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে জৈব পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ মৎস্য সেক্টরে তথা মৎস্য রপ্তানিতে এবং বিশ্বের দরবারে দেশের সুনাম টিকিয়ে রাখতে অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে।

জৈব পদ্ধতি এমন একটি প্রযুক্তি ও দর্শন (paradigm) যা স্থানীয় মানুষের সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত হয়, যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। সে সাথে উদ্ভিদ, জলজ ও প্রাণিসম্পদসহ মানুষের স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষার ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা যাবে। বস্তুত মাছ/চিংড়ি চাষের জৈব পদ্ধতি এক কথায় বর্ণনা করা কঠিন। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান সনাতন চিংড়ি চাষ পদ্ধতি ও জৈব পদ্ধতি প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ যার মাধ্যমে স্বল্প সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে চাষিদেরকে এ প্রযুক্তি সফলভাবে হস্তান্তরের মাধ্যমে উৎপাদন দ্বিগুণ করা সম্ভব এবং আন্তর্জাতিক বাজারেও বর্তমান প্রাপ্ত মূল্য অপেক্ষা ২০-৩০% (premium price) অধিক মূল্যে রপ্তানি করা সম্ভব। জৈব পদ্ধতিতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ভোক্তাগণের আশু ও দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যগত প্রভাব, মাছের স্বাদ, গুণগতমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের উপর প্রভাব পরিবেশ, শিশু ও নারীশ্রম এবং পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সকল আইন মেনেই উৎপাদন হতে রপ্তানি পর্যন্ত সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। বস্তুত জৈব চাষে কোনো প্রকার অজৈব সার, এন্টিবায়োটিক, প্রোবায়োটিক, দ্রুত বর্ধনের জন্য কোন প্রকার হরমোন বা কেমিক্যাল, গ্রোথ ফ্যাক্টর, অজৈব কীটনাশক, কোনো প্রকার জেনেটিক ক্রিয়া কাণ্ড সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। এটি অত্যন্ত সহজ সাধ্য পদ্ধতি বিশেষ করে যারা চিংড়িসমৃদ্ধ অঞ্চলে যুগ যুগ ধরে শতাব্দি লব্ধজ্ঞান নিয়ে এখনও একই সঙ্গে ধান ও মাছ/চিংড়ি চাষ করে চলেছেন। সমন্বিত সরকারি নীতিমালা, উপকূলের পোল্ডারসমূহের অবকাঠামোয় প্রয়োজনীয় সংস্কার বা পুনঃনির্মাণ, চাষিসহ সকল সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্ততা, প্রয়োজনীয় মোটিভেশন, প্রশিক্ষণ এবং চলমান কর্মকাণ্ডের নিয়মিত মনিটরিং, সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জনপ্রতিনিধিগণের সমন্বিত উদ্যোগ পূর্বশর্ত।

বর্তমানে উপকূল অঞ্চলের প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর জমিতে চিংড়ি (বাগদা গলদাসহ) চাষ হচ্ছে। এর মধ্যে ১৫% জমিতে ডিসেম্বর/জানুয়ারি হতে জুলাই/আগস্ট পর্যন্ত বাগদা চিংড়ি চাষ হয় এবং জুলাই/আগস্ট হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমন ধানের সাথে যুগপৎভাবে গলদা ও অন্যান্য সাদা মাছের চাষ হয়। ৫% অতিলবণাক্ত এলাকায় কোনো প্রকার ধানচাষ সম্ভব নয় বিধায় সারা বছর শুধু বাগদা, গলদা ও নানা প্রজাতির সাদা মাছের চাষ হয়। বাকি ২৩% জমি অপেক্ষাকৃত নিচু এবং পানি নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় (কৃত্রিম জলাবদ্ধতা) বোরো বা আমন ধান চাষের উপযুক্ত হলেও ধান চাষের পরিবর্তে চিংড়িসহ নানা প্রজাতির মাছের চাষ হয়। এতদসত্ত্বেও অত্র অঞ্চলের প্রায় ২৮% জমিতে ধানের চাষ না হলেও উৎপাদন হার বাংলাদেশের গড় উৎপাদন অপেক্ষা বেশি। আউশ, আমন ও বোরোসহ বাংলাদেশের গড় উৎপাদন হার হেক্টর প্রতি ১.৫৩ মে.টন। চিংড়িসমৃদ্ধ জেলাগুলোর মধ্যে সাতক্ষীরার গড় ধান উৎপাদন হেক্টর প্রতি ২.৭৯ মে.টন। খুলনা-বাগেরহাট এলাকার উৎপাদন হারও অনুরূপ। লবণাক্তপ্রবণ হওয়া সত্ত্বেও গড় উৎপাদন হার এখানে বেশি। কারণ সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীবাহিত জোয়ারের পানির প্রচুর পলি মাটি, জৈব সার ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস যা চিংড়ি চাষের জন্য জোয়ারের পানি জমিতে ঢুকানোর ফলে জমির উপরিভাগে জমে উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায় (renewed fertility)। উত্তরাঞ্চলে বোরো চাষিগণ প্রতি বিঘায় ৪০-৫০ কেজি ইউরিয়া ব্যবহার করে থাকে অথচ এ অঞ্চলে মাত্র ২৫-৩০ কেজি ইউরিয়া ব্যবহার করেন। আরো উল্লেখ্য, চিংড়ি/মাছ চাষের পর জমিতে যে বর্জ্য পদার্থ জমে তা ধান গাছের সার হিসেবে কাজ করে এবং উদ্ভিদ বর্জ্য পদার্থ শুষে নিয়ে পরবর্তী বছরে মাছ চাষের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার ধান কাটার পর ধান গাছের গোছার যে অংশ মাটির সঙ্গে থেকে যায় তা প্রথমে চিংড়ির পোনার আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে এবং তা ধীরে ধীরে পচে পোনার খাদ্য যোগায়। ইতোপূর্বে এটাই করা হতো এখনও তাই করা হচ্ছে। ব্যতিক্রম হলো, আগে জোয়ারের পানিতে পর্যাপ্ত বাগদাসহ নানা প্রজাতির চিংড়ি ও সাদা মাছের পোনা এমনিতেই জমিতে প্রবেশ করত, আর এখন হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা অবমুক্ত করা হচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার এই অপূর্ব সনাতন কৃষি কর্মকাণ্ড এবং উত্তরাঞ্চলের কৃষি কর্মকাণ্ডের কোনো তুলনামূলক গবেষণা প্রকৃত অর্থে এদেশের কেউ

করেছেন বলে জানা নেই। তবে জাপানের হোক্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন গবেষক ২০০৪-২০০৫ সালে এমন একটি গবেষণা করেছিলেন এবং ঐ গবেষণালব্ধ ফলাফল আগস্ট ২০০৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার গোল্ড কোস্ট এ Association of Agricultural Economists Conference এ উপস্থাপিত হয় এবং সারা বিশ্বের কৃষি বিশেষজ্ঞগণ তা সমর্থন ও গ্রহণ করেন।

ফলাফল টেবিল ১, ২ ও ৩ -এ উপস্থাপন করা হলো:

মাছ চাষ নিষিদ্ধ ছিল) অনেক বেশি পাওয়া যায়। অপরদিকে বাগদা চিংড়ির উৎপাদন হার (অন্যান্য সাদা মাছ ও ছোট চিংড়ির উৎপাদন বাদে) হেক্টর প্রতি ৫০০-৬০০কেজি ছাড়িয়ে গেছে যা দেশের গড় উৎপাদন হারের প্রায় দ্বিগুণ। এ দুটি পোল্ডারের বাস্তব চিত্র হোক্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয়ের

টেবিল ১: আধুনিক জাতের ধান উৎপাদনে সারের ব্যবহার

একর প্রতি ব্যবহার	উপকূলীয় অঞ্চল (কেজি)	যশোর-চুয়াডাঙ্গা অঞ্চল (কেজি)	যত গুণবেশি	মন্তব্য
ইউরিয়া	২১.৫	৯৯.৫	৪.৬৩	যশোর চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে ধান চাষে অনেক বেশি সার লাগে। চাষিদের অভিজ্ঞতা হলো বছরে পরপর দুবার ধান করায় জমির উর্বরতা কমছে ও দিনদিন বেশি সার লাগছে। পক্ষান্তরে ২৫-৩০ বছর একনাগাড়ে পর্যায়ক্রমিক আমন ধান ও চিংড়ি চাষের পরও উপকূলীয় জমির উর্বরতা ভাল আছে। ধানের উৎপাদন উভয় এলাকায় প্রায় একই রকম।
টিএসপি	১৫.৫	৭৬.৬	৪.৯৪	
এমপি	৩.৪	৩৩.২	৭.৭২	
জিপসাম	৪.৬	৮৩.৭	১৮.১৯	

টেবিল ২: সার ও সেচ বাবদ ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী

একর প্রতি	উপকূলীয় অঞ্চল	যশোর-চুয়াডাঙ্গা অঞ্চল	উৎপাদন ব্যয় যত গুণ বেশি	মন্তব্য
সার বাবদ ব্যয়	৩৫৬.০০	২২৩১.০০	৬	২০০৬ সালের বাজার দরে
সেচ বাবদ ব্যয়	৩৬০.০০	৩৬০০.০০	১০	

টেবিল ৩: মাটির গুণাগুণ

মাটির পুষ্টি উপাদান	চিংড়ির পর (ধানের আগে)				ধানের পর (চিংড়ির আগে)			
	গড়	বিচ্যুতি	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	গড়	বিচ্যুতি	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ
পিএইচ	৭.৬৯	০.৭৪৬	৫.০	৯.১	৭.০৫	০.৪২৪	৬.২	৭.৯
টোটাল নাইট্রোজেন (%)	০.৪৬	০.১১৮	০.২৯	০.৭৫	০.৩৭	০.১০২	০.১৯	০.৬১
পটাশ (মি.গ্রাম/১০০ গ্রাম মাটি)	১.২৫	০.৪০৩	০.৬২	২.৮৯	০.৯৭	০.২৩	০.৬১	১.৬০
ক্যালসিয়াম (মি.গ্রাম/১০০ গ্রাম মাটি)	২৯.৪	৬.৪১	১৬.২৫	৪৯.০৫	২৩.২৩	৪.৩৩	১৪.৭৫	৩২.৭৫
ফসফরাস (মা.গ্রা./১০০ গ্রাম মাটি)	১২.২৩	৭.৭৩	২.২৬	৩৭.০০	৯.৫৬	৫.৮৯	২.১৬	৩৪.০০
সালফার (মা.গ্রা./১০০ গ্রাম মাটি)	২৩২.৫	৯৫.১	৪৯.১	৪১০.৬	১৭৬.২	৮০.৪০	৪৯.১	৩৮১.৬
ম্যাঙ্গানিজ (মা.গ্রা./১০০ গ্রাম মাটি)	১০৮.৪৮	৩৮.২	৩৯.৪	২১২.০	৮৮.২৪	২২.৫	৫০.০০	১৭৩.৬০
বোরন (মা.গ্রা./১০০ গ্রাম মাটি)	২.৮৭	০.৬৫৫	১.৭৫	৪.২৩	২.০৫	০.৫৪৯	১.১২	৩.৫১
কপার (মা.গ্রা./১০০ গ্রাম মাটি)	১২.৫৪	৩.৭১	৫.৪২	২১.৮১	১০.৬৪	২.১১	৪.৪২	১৪.৪২

হোক্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ যশোর ও চুয়াডাঙ্গার ধান চাষ পদ্ধতি, সার ও পানির ব্যবহার এবং খুলনার দক্ষিণ অঞ্চলের লবণাক্ত এলাকার চিংড়ি ও ধান চাষভুক্ত এলাকার ধান চাষ পদ্ধতি, সার ও পানির ব্যবহারের উপর একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেন। গবেষণায় ৫০টি স্থানের মাটি ও পানির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সংক্ষেপে গবেষকগণের গবেষণার ফলাফলকে সমর্থন করে। এ কথাগুলো উল্লেখ করতে হলো এজন্য যে, বর্তমান চাষ পদ্ধতি প্রায় জৈব পদ্ধতির কাছাকাছি অবস্থান করছে। শুধু প্রয়োজন জৈব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। অপরপৃষ্ঠায় জৈব পদ্ধতিতে চিংড়ি ও মাছ চাষের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী উল্লেখ করা হলো-

১. পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ।
২. যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বনজসম্পদের সংরক্ষণ।
৩. মজুতকৃত চিংড়ি পোনার ঘনত্বের সীমা নির্ধারণ।
৪. অজৈব সার ব্যবহার না করা।
৫. কৃত্রিম কীটনাশক ও আগাছানাশক ব্যবহার না করা।
৬. মৎস্য খাদ্যের উপকরণের এবং খাদ্যের গুণগত মান নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।
৭. চিংড়ি পোনা উৎপাদন ও খাদ্য শিল্পে GMO (Genetically Modified Organisms) ব্যবহার না করা।
৮. চিংড়ি ঘের ব্যবস্থাপনায় প্রচলিত বিদ্যুতের ব্যবহার সীমিতকরণ ও সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান।
৯. প্রাকৃতিক ঔষধ ও গ্রহণযোগ্য জৈব পদার্থ বাঞ্ছনীয়।
১০. হরমোন, এন্টিবায়োটিক, প্রোবায়োটিক এবং অগ্রহণযোগ্য রাসায়নিক পদার্থ পরিহার করে গ্রহণযোগ্য এবং প্রাকৃতিক প্রজনন পদ্ধতির মাধ্যমে চিংড়ি পোনা উৎপাদন।
১১. সকল কর্মকাণ্ডের উপর নিয়মিত নিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া এবং তথ্য ফিডব্যাক করা।

জৈব চিংড়ি চাষের শর্তাবলীর প্রায় অনেকগুলো দেশের অধিকাংশ চাষি সনাতন পদ্ধতি অনুসরণ করার মাধ্যমে পালন করে যাচ্ছে। অন্যান্য শর্তগুলো পালন করাও কষ্টসাধ্য নয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের টিম গত ২/৩ বছর যাবৎ নিয়মিতভাবে চিংড়ি চাষকৃত ঘের এবং প্রক্রিয়াকরণ কারখানাগুলো নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। তারা এই মর্মে মতামত দিয়েছেন যে, এদেশে মোটামুটিভাবে পরিবেশসম্মত উপায়ে, নারী ও শিশু শ্রম সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইন মেনে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে চিংড়ি চাষ ও প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে।

বৈদেশিক ভোক্তাগণ ক্রমান্বয়ে পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য, নারী ও শিশুশ্রম ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠেছেন বিধায় জৈব পণ্যের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। এক গবেষণায় দেখা যায় যে, ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে ২০০০-২০১০ সালের মধ্যে 'অর্গানিক' পণ্যের চাহিদা দ্বিগুণ হয়েছে। অর্গানিক পণ্যের মূল্য সব সময় ২০%-৩০% বেশি হলেও ইউরোপে বর্তমানে প্রায় ২০% ভোক্তা নিয়মিত এবং ৫২% ভোক্তা প্রায়ই অর্গানিক পণ্য (চিংড়ি) ক্রয় করেন এবং এই চাহিদা বাৎসরিক ১০%-১৫% হারে বেড়ে চলেছে। বর্তমানে ঐসব দেশে বাৎসরিক অর্গানিক পণ্যের বাজার প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলারের মত। তাই ভোক্তাগণের চাহিদা এবং সর্বোপরি নিজ দেশের পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে বিশ্বের অনেক চিংড়ি উৎপাদন ও রপ্তানিকারী দেশ ইতোমধ্যে জৈব পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। ভারত, থাইল্যান্ড, চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশসমূহ অর্গানিক চাষ এবং অর্গানিক চিংড়ি রপ্তানি শুরু করেছে।

চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি ও রপ্তানি আয় বাড়াতে চিংড়ি চাষভুক্ত জমি না বাড়িয়ে নিবিড় ও আধানিবিড় চাষ উৎসাহিত করতে অনেকে মতামত দেন। বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রস্তাব লোভনীয় হলেও মৎস্য খাদ্য তৈরির মুখ্য উপাদান ফিসমিলের অপ্রতুলতা ও উচ্চমূল্য, আর্থসামাজিক অবস্থা ও ভৌত অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে এদেশে এটা করা সমীচীন হবে কিনা তা ভেবে দেখার বিষয়। কেননা-

১. দেশের চিংড়ি খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য উচ্চমূল্যে বিদেশ থেকে ফিসমিল আমদানি অথবা উন্নতমানের চিংড়ি খাদ্য আমদানি করে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হবে।
২. বিদ্যুৎ ও অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ব্যাপক অর্থ ব্যয় করতে হবে।
৩. কৃষকগণ প্রযুক্তিগতভাবে এখনও নিবিড় চাষের জন্য প্রস্তুত নন।
৪. সর্বোপরি নিবিড়/ আধানিবিড় চিংড়ি চাষের ফলে যে বর্জ্য তৈরি হয় এবং খামারের তলদেশে যে 'স্লাম' জমে তা পরিবেশের জন্য বড় হুমকি। অপরদিকে প্রচলিত সনাতন পদ্ধতিকে আরো উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গড় উৎপাদন হার বর্তমানের হেক্টরপ্রতি ২৫০-২৮০ কেজি হতে সহজেই ৫০০-৬০০ কেজিতে উন্নীত করা সম্ভব। তবে উন্নত ব্যবস্থাপনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও প্রয়োজনীয় নদীর পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

এসব কিছু বিবেচনায় আনলে প্রতীয়মান হয় যে, প্রচলিত চাষ পদ্ধতি 'জৈব মৎস্য ও চিংড়ি চাষ' এর কাছাকাছি পর্যায়ে অবস্থান করছে এবং সামান্য প্রচেষ্টাতেই উৎপাদন হার দ্বিগুণ করা সম্ভব। এভাবে জনবহুল ছোট এ দেশের পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, আত্মকর্মসংস্থান, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আন্তর্জাতিক আইনকানুন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এজন্য মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, হ্যাচারি এ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারক সমিতি, জাতীয় চিংড়িচাষি সমিতি সমন্বয়ে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে সকলের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা আবশ্যক। অধিকন্তু পরিবেশ ও প্রতিবেশবান্ধব চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি তথা কৃষি সেক্টরের সার্বিক উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা তথা সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং সর্বোপরি পলিগঠিত দেশটির উপকূল অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান জলাবদ্ধতার অভিশাপ হতে সুরক্ষার সর্বোত্তম উপায় 'পলিমাটি ব্যবস্থাপনা' (TRM) অর্থাৎ ভূমি গঠন প্রক্রিয়ায় অর্ধসমাপ্ত পোল্ডারভুক্ত নিচু জমিতে নিয়মিত এবং নিয়ন্ত্রিত জোয়ার-ভাটা খেলানোর মাধ্যমে মৃত বা অর্ধমৃত নদী/ খালগুলোতে প্রাকৃতিক নিয়মে জমির স্বাভাবিক উচ্চতা বৃদ্ধি ও নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ আশু প্রয়োজন।

সভাপতি, জাতীয় চিংড়ি চাষি সমিতি

মৎস্য ও মৎস্যপণ্যে রাসায়নিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ: বাংলাদেশের অগ্রগতি

নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস[১] ও মোঃ সিরাজুল ইসলাম[২]

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম। যদিও পোষাক শিল্প হতে দেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে, কিন্তু এর কাঁচামাল সম্পূর্ণ আমদানি নির্ভর। অন্যদিকে, মৎস্যপণ্য পুরোপুরি দেশীয় উৎপাদন থেকে প্রক্রিয়াজাতকৃত। এ কারণে এ শিল্প বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। আমাদের দেশের মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য মূলত ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডায় রপ্তানি হয়। এ সকল দেশ তাদের জনস্বাস্থ্যের প্রশ্নে বিশেষ করে রাসায়নিক দ্রব্যের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি (রেসিডিউ) বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। কোনো পণ্যে রাসায়নিক দূষণ অনুমোদিত মাত্রার অধিক হলে তা এসব দেশে রপ্তানিযোগ্য নয়।

মৎস্য ও মৎস্যপণ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদি

উৎপাদন পর্যায়ে ব্যবহার বা প্রাকৃতিকভাবে সংশ্লেষিত হওয়ার কারণে অথবা আহরণ পরবর্তী ব্যবস্থাপনার ত্রুটি বা প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যায়ে ব্যবহার বা সংক্রমণ ইত্যাদি কারণে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যে বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি ঘটতে পারে, যা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন নব্বই দশকে এ ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের তালিকা প্রকাশ করে। ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদি দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। একটি হলো পুরোপুরি নিষিদ্ধ, অর্থাৎ অতি সামান্য পরিমাণ উপস্থিতিও গ্রহণযোগ্য নয় (zero tolerant), অন্যগুলোর সর্বোচ্চ রেসিডিউ সীমা (maximum residue limit) নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত মাছে বিশেষ করে চিংড়িতে যে সব রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া গেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেয়া হলো:

নিষিদ্ধ (Zero tolerant) রাসায়নিক দ্রব্যাদি

১. নাইট্রোফুরান এন্টিবায়োটিকস (Nitrofurans): এ গ্রুপের প্রধান ড্রাগগুলো হলো ফুরাজোলিডন, নাইট্রোফুরানটোয়াইন, ফুরালটাডোন ও নাইট্রোফুরাজোন। এ ড্রাগগুলো যে অবস্থায় মাছ বা চিংড়ির মাংসে সংশ্লেষিত আকারে বা টিস্যু বন্ডেড অবস্থায় থাকে তাদেরকে মেটাবোলাইট বা মার্কার রেসিডিউ বলা হয় (টেবিল ১)। এ ড্রাগগুলো ক্যান্সার সৃষ্টিকারক (carcinogenic and mutagenic) বলে ইউরোপ, আমেরিকাসহ অধিকাংশ দেশে নব্বই দশকে মৎস্যচাষে এগুলো নিষিদ্ধ করা হয়।

টেবিল ১: নাইট্রোফুরান ড্রাগ এবং মেটাবোলাইটসমূহ

নাইট্রোফুরান ড্রাগ	মেটাবোলাইট/ মার্কার রেসিডিউ	গাঠনিক সংকেত
ফুরাজোলিডন	AOZ (3- Amino-2-oxazolidinone)	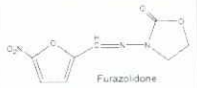
ফুরালটাডোন	AMOZ (3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazol)	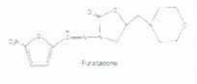
নাইট্রোফুরানটোয়াইন	AHD (1-Aminohydantoin)	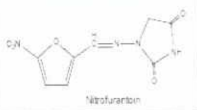
নাইট্রোফুরাজোন	SEM (Semicarbazide)	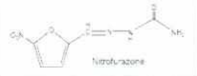

২. ক্লোরামফেনিকল (Chloramphenicol)

ক্লোরামফেনিকল একটি ব্রড স্পেকট্রাম এন্টিবায়োটিক। এটি তুলনামূলক সস্তা ও সহজপ্রাপ্য। এ কারণে এর ব্যবহারও অনেক বেশি। এর অতিসামান্য পরিমাণ উপস্থিতি মারাত্মক অ্যানিমিয়া (aplastic anaemia) সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণে ইউরোপ, আমেরিকাসহ অধিকাংশ দেশে নব্বই দশকে মৎস্যচাষে এটি নিষিদ্ধ করা হয়।

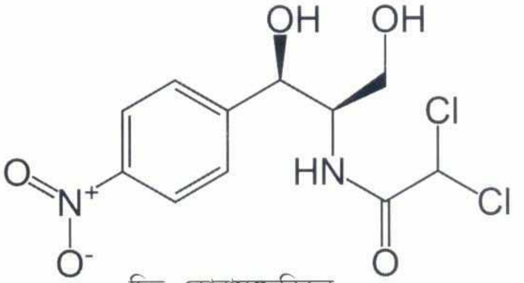

চিত্র: ক্লোরামফেনিকল

৩. ম্যালাকাইট গ্রিন (Malachite Green)

ম্যালাকাইট গ্রিন অক্সালেট ও হাইড্রোক্লোরাইড লবণ আকারে পাওয়া যায়। মৎস্যচাষে ম্যালাকাইট গ্রিন ব্যবহার হয় মূলত ছত্রাকজনিত রোগ চিকিৎসার জন্য। এ ধরনের চিকিৎসার পর ম্যালাকাইট গ্রিন সহজেই বর্জ্য আকারে নিঃসরণ হয়ে যায়, কিন্তু রেসিডিউ হিসেবে দীর্ঘদিন রয়ে যায় এর লিউকো মেটাবোলাইট। এটি প্রাণীর জেনেটিক বৈশিষ্ট্য বা ডিএনএ'র বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন ও ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে (mutagen and carcinogen)। এ কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আমেরিকাসহ বহু দেশে মৎস্যচাষে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ।

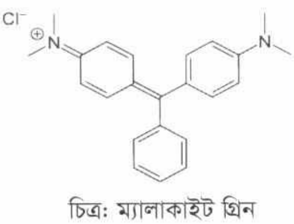

চিত্র: ম্যালাকাইট গ্রিন

৪. ক্রিস্টাল ভায়োলেট (Crystal Violet)

মৎস্যচাষে ক্রিস্টাল ভায়োলেট ব্যবহার হয় মূলত ছত্রাক (fungus) ও প্যারাসাইট নিয়ন্ত্রণের কাজে। ম্যালাকাইট গ্রিনের মতো এটিও পানিতে সরাসরি মাছের দেহে শোষিত হয় এবং পরবর্তীতে লিউকো মেটাবোলাইট হিসেবে দীর্ঘদিন মাছের পেশীতে থাকতে পারে। এটি ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আমেরিকাসহ বহু দেশে মৎস্যচাষে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ।

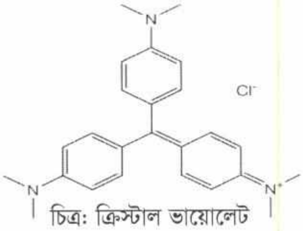

চিত্র: ক্রিস্টাল ভায়োলেট

যে সকল রাসায়নিক দ্রব্যের অনুমোদিত রেসিডিউ লিমিট রয়েছে

নিষিদ্ধ (zero tolerant) রাসায়নিক পদার্থের বাইরে অনেকগুলো ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে যেগুলোর রেসিডিউ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বহুবিধ ক্ষতি করতে পারে। তবে দীর্ঘদিনের গবেষণার মাধ্যমে এ রাসায়নিক রেসিডিউগুলোর সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য রাসায়নিক দ্রব্যসমূহের তালিকা ও সেগুলোর সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য সীমা নিচে দেয়া হলো (টেবিল ২)।

টেবিল ২: অনুমোদিত রাসায়নিক দ্রব্য এবং তাদের সর্বোচ্চ রেসিডিউ সীমা

গ্রুপ	রাসায়নিক দ্রব্য	সর্বোচ্চ রেসিডিউ সীমা
এন্টিবায়োটিক	টেট্রাসাইক্লিন	১০০ মা.গ্রা./কেজি
	অক্সি-টেট্রাসাইক্লিন	১০০ মা.গ্রা./কেজি
	ক্লোর-টেট্রাসাইক্লিন	১০০ মা.গ্রা./কেজি
এন্টিপ্যারাসাইটিক	ফ্লুবেনডাজল	৫০ মা.গ্রা./কেজি
ভারী ধাতু	লেড	০.৫ মা.গ্রা./কেজি
	মার্কারি	০.৫ মা.গ্রা./কেজি
	ক্যাডমিয়াম	০.০২ মা.গ্রা./কেজি
	কপার	৫ মা.গ্রা./কেজি
	আর্সেনিক	১ মা.গ্রা./কেজি
	জিঙ্ক	৫০ মা.গ্রা./কেজি
পেস্টিসাইড	অরগানোক্লোরিনস	৫০ মা.গ্রা./কেজি
	পিসিবি	৫০ মা.গ্রা./কেজি
	অ্যালড্রিন	০.০২ মা.গ্রা./কেজি
	ডিডিটি	২ মা.গ্রা./কেজি
	হেপ্টাক্লোর	২ মা.গ্রা./কেজি
	ডাইঅ্যালড্রিন	২ মা.গ্রা./কেজি

ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের অগ্রগতি

১. যুগোপযোগী আইনী কাঠামো: বস্তুত ২০০৮ সালের পূর্বে রেসিডিউ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে কোন জোরালো আইনী ভিত্তি ছিল না, আমদানিকারক দেশসমূহের নিয়মনীতি অনুসরণ করে আমাদের রাসায়নিক দূষণ দ্রব্যগুলোর রেসিডিউ পরীক্ষা, দূষণের উৎস শনাক্ত করা ও সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি কাজ করা হতো। ২০০৮ সালে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৯৭ এর সংশোধনের মাধ্যমে উন্নত বিশ্বের আইন-কানুন অনুসরণ করে মৎস্যচাষে বেশ কিছু রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয় এবং ব্যবহার উপযোগী রাসায়নিক দ্রব্যসমূহের সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এই বিধিমালাটি আরও যুগোপযোগী করে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০১১ প্রস্তাব করা হয়েছে যেখানে পূর্বের সকল অসম্পূর্ণতা দূর করা হয়েছে। বিধিমালা ছাড়াও জাতীয় রেসিডিউ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পলিসি গাইডলাইন ২০০৮ সাল হতে প্রতিবছর হালনাগাদ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন হতে অনুমোদন করা হচ্ছে। মৎস্যখাদ্যে রাসায়নিক রেসিডিউ নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০ প্রণীত হয়েছে এবং মৎস্যখাদ্য বিধিমালা ২০১১ ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি মৎস্য হ্যাচারিতে রাসায়নিক দ্রব্যের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০ পাশ করা হয়েছে। সে আলোকে মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১ প্রণয়নও করা হয়েছে। এ সকল আইন, বিধি ও গাইডলাইন অনুসরণের মাধ্যমে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যে রাসায়নিক দ্রব্যের দূষণ তথা রেসিডিউ নিয়ন্ত্রণে অনেক সাফল্য এসেছে। দেশের মৎস্য ও চিংড়ির রাসায়নিক দূষণ প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটি (NWC) ২০০৯ সাল থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২. জাতীয় রেসিডিউ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা (NRCP): মুলত ইউরোপীয় ইউনিয়নের চাহিদার কারণেই বাংলাদেশে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম আরম্ভ হয় বিগত দশকের গোড়ার দিকে। তাদের পরামর্শ অনুসারে দেশে একটি জাতীয় রেসিডিউ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা করা হয়। এর আওতায় প্রতিবছর নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘের/পুকুর হতে মাছ/চিংড়ি ও পানি সংগ্রহ করে উপরে বর্ণিত (টেবিল ১) কেমিক্যালসমূহের পরীক্ষা করা হয়। এই কাজটি করা হয় সম্পূর্ণ সরকারি উদ্যোগে। এর উদ্দেশ্য হলো পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে মাছ ও চিংড়িতে ক্ষতিকর কেমিক্যালের উপস্থিতি শূন্যমাত্রায় (zero level) বা অনুমোদিত পর্যায়ে নামিয়ে আনা। যদি এনআরসিপি হতে ধারাবাহিকভাবে কয়েক বছর প্রমাণ করা যায় যে, দেশে উৎপাদিত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যে নিষিদ্ধ/ক্ষতিকর দ্রব্য নেই

অথবা অনুমোদিত মাত্রার মধ্যে রয়েছে, তাহলে রপ্তানিপূর্ব পরীক্ষার প্রয়োজন নাও হতে পারে। বিশ্বের অনেক দেশেই পণ্য রপ্তানির পূর্বে নমুনা পরীক্ষা করতে হয় না। কারণ তারা এনআরসিপি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাসায়নিক দূষণের মাত্রা গ্রহণযোগ্য সীমায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বিগত কয়েক বছরে এনআরসিপি পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনায় বেশ অগ্রগতির চিত্র পাওয়া যায় (চিত্র ১)। ২০০৮ সালের ১৫.৬৯% এনআরসিপি নমুনায় নাইট্রোফুরান মেটাবলাইট AHD পাওয়া গিয়েছিল যা ২০১০ সালে প্রায় শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে। সকল নমুনায় ক্লোরামফেনিকল ও নাইট্রোফুরান মেটাবোলাইট উপস্থিতি ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১০ সালে কমে এসেছে।

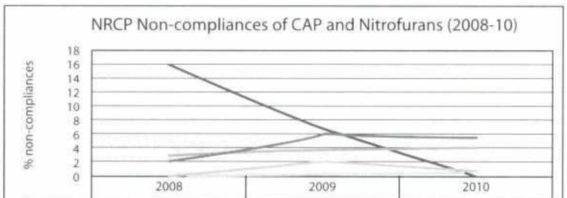

	2008	2009	2010
CAP	3.07	4.22	4.14
AOZ	0	1.74	0.83
AMOZ	0	0.25	0.55
AHD	15.69	6.71	0.27
SEM	2.15	5.72	5.8

চিত্র ১: জাতীয় রেসিডিউ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার আওতায় সংগৃহীত নমুনায় নাইট্রোফুরান ও ক্লোরামফেনিকল সংক্রান্ত নন-কম্প্লায়েন্সের শতকরা হারের তুলনামূলক বিবরণ (২০০৮-২০১০)

৩. রেসিডিউ পরীক্ষা ও ল্যাবরেটরি সুবিধা: ২০০৭ সালে মৎস্য অধিদপ্তরের মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি, ঢাকায় LC-MS/MS সিস্টেম স্থাপন হয়। এর পূর্বে বাংলাদেশে নাইট্রোফুরান ও ক্লোরামফেনিকল পরীক্ষার গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৯৯ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানিতব্য মৎস্যপণ্যে নাইট্রোফুরান মেটাবলাইট ও ক্লোরামফেনিকল পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। তখন এ বিষয়ে একমাত্র বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR) পরীক্ষাগারে এ ধরনের পরীক্ষার সুবিধা থাকায় রপ্তানিতব্য মৎস্যপণ্যে নাইট্রোফুরান মেটাবোলাইট ও ক্লোরামফেনিকল পরীক্ষাসমূহ সেখানে করা হতো। কিন্তু ২০০৫ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ফুড এন্ড ভেটেরিনারি অফিস (EU FVO) মিশন কর্তৃক সরেজমিনে ল্যাবরেটরি পরিদর্শন করে সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে রপ্তানিতব্য মৎস্যপণ্যে নাইট্রোফুরান মেটাবলাইট ও ক্লোরামফেনিকল পরীক্ষা সীমিত করে বিদেশের ল্যাবরেটরি হতে পরীক্ষা করা হতো। পরবর্তীতে মৎস্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে ২০০৭ সালে মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ (FIQC) ল্যাবরেটরি, ঢাকায় একটি LC-MS/MS সিস্টেম স্থাপন করা হয়। প্রথম দিকে মেথড ভ্যালিডেশন, মাননিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে দুর্বলতা থাকলেও ক্রমশ তা উত্তরণ করা সম্ভব হয়েছে। ২০১০ সালে দ্বিতীয় LC-MS/MS সিস্টেম একই ল্যাবে স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে FIQC ল্যাবরেটরি, ঢাকায় দুইটি LC-MS/MS, চট্টগ্রাম ও খুলনায় HPLC, ELISA ও AAS, BCSIR-এ LC-MS/MS, আনবিক শক্তি কমিশন ল্যাবের AAS এবং BARI ল্যাবে GCMS এর মাধ্যমে মানসম্মতভাবে এন্টিবায়োটিক, রঞ্জক দ্রব্য, হেভী মেটাল, পেস্টিসাইডসহ বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের রেসিডিউ পরীক্ষা করা হচ্ছে। ২০১১ সালের FVO মিশন বাংলাদেশের রেসিডিউ পরীক্ষা ব্যবস্থা তথা ল্যাবরেটরিগুলোর পরীক্ষা পদ্ধতি ও মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। আশার বিষয় হলো ইতোমধ্যে EU-UNIDO সহায়তায় BEST প্রকল্পের মাধ্যমে আরও দু'টি অত্যাধুনিক LC-MS/MS সিস্টেম FIQC ল্যাবরেটরি, ঢাকায় স্থাপন করার কাজ চলছে।

৪. ইউরোপীয় ইউনিয়নের র‍্যাপিড এলার্ট সিস্টেম ফর ফুড এন্ড ফিড (RASFF) বা র‍্যাপিড এলার্ট: ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের কোনো বন্দরে কোনো রপ্তানি পণ্য পৌঁছার পর বন্দর কর্তৃপক্ষ নিয়মতান্ত্রিকভাবে নমুনা সংগ্রহ করে তাদের ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করায়। এটি সাধারণত দৈবচয়ন ভিত্তিতে হয়, তবে বিশেষ ব্যবস্থার আওতায় একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক নমুনা তারা পরীক্ষা করতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশের ২০% পণ্য পরীক্ষার নিয়ম চালু রয়েছে। এই পরীক্ষায় যদি কোনো পণ্যে অননুমোদিত কোনো দ্রব্য পাওয়া যায় অথবা অনুমোদিত দ্রব্য অননুমোদিত মাত্রায় পাওয়া যায়, তাহলে কর্তৃপক্ষ ঐ পণ্যের নামে র‍্যাপিড এলার্ট জারী করে। র‍্যাপিড এলার্ট জারীকৃত পণ্য ফেরৎ এনে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ১৯৯৭ ও সংশোধিত ২০০৮ এর বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়।

বাংলাদেশের চিংড়িতে মূলত নাইট্রোফুরান থাকার কারণে

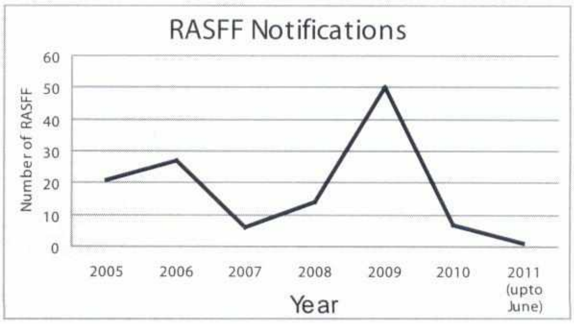

চিত্র ২: ইউরোপীয় ইউনিয়নের র‍্যাপিড এলার্ট সিস্টেমে বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের বিপরীতে ২০০৫ সাল হতে ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত নোটিফিকেশনের তুলনামূলক তথ্য

বেশ কয়েক বছর ধরে অনেকগুলো কনসাইনমেন্ট র‍্যাপিড এলার্টের আওতায় পড়েছে। তবে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার ফলে এ সংখ্যা গত বছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গেছে। ২০০৯ সালের ৫০টি র‍্যাপিড এ্যালার্ট থেকে ২০১০ সালে তা নেমে আসে মাত্র ৭টিতে (চিত্র ২)। বর্তমান বছরে অর্থাৎ ২০১১ সালের প্রথম ছয় মাসে মাত্র ১টি র‍্যাপিড এলার্ট জারী হয়েছে বাংলাদেশের চিংড়ির বিপরীতে। এই অগ্রগতি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।

৫. ইইউ এফভিও মিশন (EU FVO Mission) রিপোর্ট: ইউরোপীয় ইউনিয়নের ফুড এন্ড ভেটেরিনারি অফিস ১৯৯৭ সাল হতে বাংলাদেশে চিংড়ি শিল্পে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা মনিটর করার জন্য মিশন পরিচালনা করে আসছে। তাদের মিশনসমূহে স্বাস্থ্য, ট্রেসিবিলিটি, হ্যাসাপ প্রভৃতি বিষয় মনিটর করলেও রেসিডিউ নিয়ন্ত্রণ বিষয় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। ২০০৭, ২০০৮, ২০১০ ও ২০১১ সালের মিশনগুলো ছিলো প্রধানত মাছ ও চিংড়িতে রাসায়নিক রেসিডিউ মনিটরিং বিষয়ে। মিশনগুলোর রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মাছ ও চিংড়িতে রাসায়নিক দ্রব্যের রেসিডিউ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের ধারাবাহিক অগ্রগতি তাদের বিবেচনায় এসেছে এবং তারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। ২০১১ সালের মার্চ মাসে সম্পন্ন রেসিডিউ বিষয়ক মিশনে তাদের এই সন্তুষ্টির প্রতিফলন ঘটেছে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের মৎস্যপণ্যের উপর আরোপিত ২০% বাধ্যতামূলক পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যাহারের বিষয়টি বিবেচনা করছে।

ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ নিয়ন্ত্রণে করণীয়

এফভিও মিশনের প্রতিবেদন এবং আন্তর্জাতিক আইনকানুনের আলোকে বাংলাদেশের মৎস্যপণ্যে রাসায়নিক দ্রব্যের রেসিডিউ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং ইতোমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থা চলমান রাখা প্রয়োজন সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- রেসিডিউ-এর উৎস শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের স্বার্থে সকল মৎস্য ও চিংড়ি খামার/ঘের/পুকুর রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা।
- মৎস্যচাষে নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহার যাতে না হয়, সেজন্য মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা, ব্যবহারকারিদের মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।
- জাতীয় রেসিডিউ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার আওতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা এবং সংগৃহীত নমুনায় ক্ষতিকারক রেসিডিউ শনাক্ত হলে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ভেটেরিনারি ঔষধ বিক্রয় কেন্দ্র/দোকানসমূহে মৎস্যচাষের জন্য ক্ষতিকারক ও নিষিদ্ধ ঔষধসমূহের তালিকা দৃশ্যমান রাখা এবং সেগুলো বিক্রয় বন্ধে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা।
- ঔষধসমূহের মোড়কে উৎপাদন তারিখ, ব্যবহারের শেষ তারিখ এবং ব্যবহারের কতদিন পরে মাছ বা চিংড়ি ধরা নিরাপদ (withdrawal period) তা যথাযথভাবে প্রদর্শন।
- মৎস্যখাদ্য উৎপাদন পর্যায়ে যাতে কোনরূপ নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর দ্রব্য না মেশানো হয় তা নিশ্চিত করার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা।
- মৎস্যখাদ্য বা খাদ্য উপাদানে ব্যবহৃত উপকরণ আমদানি প্রচলিত আইন অনুযায়ী কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।
- রেসিডিউ পরীক্ষার সকল ল্যাবরেটরির পরিকাঠামো ISO ১৭০২৫ মানে উন্নীত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের চিংড়ি ও মাছের চাহিদা প্রতিদ্বন্দ্বী দেশসমূহ; যেমন-ভারত, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতির তুলনায় কম নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশি। ওসব দেশের ট্রেসিবিলিটি সিস্টেম, ল্যাবরেটরি সিস্টেম বাংলাদেশের তুলনায় অনেক দ্রুত আধুনিকায়ন হয়েছে। দেশের রপ্তানিতব্য মৎস্যপণ্যের গুণগতমানের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে রেসিডিউ নিয়ন্ত্রণ ও রেসিডিউ ব্যবস্থাপনা কার্যকর হলে ক্রেতাদের বিশ্বস্ততা অর্জন করা সম্ভব এবং আরও অনেক বেশি পরিমাণে রপ্তানি করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক বাজারের মতো অভ্যন্তরীণ বাজারে সরবরাহকৃত মাছ ক্ষতিকর রাসায়নিক রেসিডিউমুক্ত রাখার জন্য সমান গুরুত্ব পাচ্ছে না। রপ্তানি পণ্যের মতো অভ্যন্তরীণ বাজারের পণ্যে জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয় ও ট্রেসিবিলিটি নিশ্চিত করা জরুরি। ফুড সিকিউরিটির পাশাপাশি ফুড সেফটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে খাদ্য উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার সাথে নিরাপদ খাদ্য (safe food) ইস্যুকে সম্পৃক্ত করে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার।

১. উপপরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, ঢাকা।
২. গবেষণা কর্মকর্তা, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, ঢাকা।

সুন্দরবনে স্থায়িত্বশীল মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশল ও কার্যক্রম

মোঃ সিরাজুল করিম

সুন্দরবন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট যা গঙ্গা অববাহিকার নিম্নভাগে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ অংশ জুড়ে বিস্তৃত। সমগ্র সুন্দরবনের মোট ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের মধ্যে বাংলাদেশ সীমানায় রয়েছে ৬,০১৭ বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ প্রায় ৬০ শতাংশ এলাকা বিস্তৃত।

ছবি: সুন্দরবন এলাকার বনাঞ্চল ঘেষা জলাশয় যেখানে সামান্য চাষব্যবস্থাপনায় মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব

বাংলাদেশ সরকারের বন অধিদপ্তর বিগত ১৯৯৬ সনের দিকে সুন্দরবনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বনাঞ্চলকে বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অভয়াশ্রম এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে। অভয়াশ্রম ঘোষিত এই তিনটি এলাকা যথাক্রমে-

ক. সুন্দরবন (পূর্ব) বন্যপ্রাণী অভয়াশ্রম যা বাগেরহাট জেলার ৩১,২২৬ হেক্টর আয়তন নিয়ে বিস্তৃত

খ. সুন্দরবন (পশ্চিম) বন্যপ্রাণী অভয়াশ্রম যা সাতক্ষীরা জেলার ৭১,৫০২ হেক্টর আয়তন নিয়ে বিস্তৃত এবং

গ. সুন্দরবন (দক্ষিণ) বন্যপ্রাণী অভয়াশ্রম যা খুলনা জেলার ৩৬,৯৭০ হেক্টর আয়তন নিয়ে বিস্তৃত।

উপরে বর্ণিত তিনটি বন্যপ্রাণী অভয়াশ্রম এলাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মৎস্য ও চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনাময় প্রায় ১৭৫,৭২৪ হেক্টর জলাশয়কে মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে এনে কার্যকর স্থায়িত্বশীল উৎপাদন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেখানকার বর্তমান মৎস্য ও চিংড়ির উৎপাদন সহজেই দ্বিগুণ করা সম্ভব যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে।

সুন্দরবনের বৃক্ষলতা, পশুপাখি, মাছ ও চিংড়ি ইত্যাদি নানাবিধ প্রজাতির মধ্যে ৩৩৪ প্রজাতির গাছ, ৩১৫ প্রজাতির পাখি, ২১০ প্রজাতির মাছ, ৪৩ প্রজাতির শামুক-ঝিনুক, ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ, ১৩ প্রজাতির অর্কিড, ১১ প্রজাতির উভচর প্রাণী, ২৪ প্রজাতির চিংড়ি, ১৪ প্রজাতির কাঁকড়া ও ৮ প্রজাতির লবস্টার রয়েছে। এসব প্রাণী ছাড়াও সুন্দরবনে রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাঘ, হরিণ, ডলফিন, বানর, কুমির ইত্যাদি নানা প্রজাতির বন্যপ্রাণী

সংরক্ষিত তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে মোট সুন্দরবন অঞ্চলের ৬,০১৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে ১,৮৭৪ বর্গ কিলোমিটার মৎস্য ও চিংড়ি উৎপাদন সম্ভাবনাময় জলাশয় রয়েছে যা খুলনা বিভাগের মোট জলাশয়ের ৩১.১০ শতাংশ। সুন্দরবন এলাকায় ৪৫০টি নদী ও খাল রয়েছে যার মধ্যে ১৮টি খাল অভয়াশ্রম এবং মোট মৎস্যজীবীর সংখ্যা ১.৫০ লক্ষ। বর্তমানে সুন্দরবন এলাকার মাছের বার্ষিক উৎপাদন ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ মে.টন, চিংড়ি ও কাঁকড়ার বার্ষিক উৎপাদন ৩,৬০০ মে.টন। এসব মৎস্যসম্পদ মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে এনে কার্যকর স্থায়িত্বশীল চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রথম বছরেই উৎপাদন ও আর্থিক আয়কে দ্বিগুণ করা সম্ভব যাকে পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে তিনগুণ করা কোনোভাবেই দুঃসাধ্যের নয়।

একদিকে এই সুন্দরবনের প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদ কমে যাচ্ছে অন্যদিকে এই ক্রমহ্রাসমানতার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৎস্যজীবীর সংখ্যা যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে মৎস্যসম্পদের নবায়নযোগ্য জীববৈচিত্র্যের উপর। ফলে সেখানে নিয়োজিত মৎস্যজীবীর মাথাপিছু মৎস্য ও চিংড়ি আহরণের পরিমাণ কমে যাচ্ছে, তাদের মাঝে দেখা দিচ্ছে বেকারত্ব, দারিদ্র্য এবং অবনতি ঘটছে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার। এই অবস্থায় আন্তঃসেক্টর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদের কার্যকর স্থায়িত্বশীল চাষ ব্যবস্থাপনার কোন বিকল্প নেই।

সুন্দরবনে স্থায়িত্বশীল মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশল

মাছ ও চিংড়ির আবাসস্থল বিনষ্ট ও সঙ্কুচিত হওয়া, প্রাকৃতিক নার্সারিক্ষেত্র ধ্বংস হয়ে যাওয়া, সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর মাঝে কার্যকর স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা, জ্ঞানের স্বল্পতা, ক্ষতিকারক পন্থায় মাছ ও চিংড়ি আহরণ ইত্যাদি কারণে সুন্দরবনে মৎস্যসম্পদ দ্রুতগতিতে হ্রাস পাচ্ছে। সুন্দরবনের ক্রমহ্রাসমান মৎস্যসম্পদের উন্নয়নে বহুবিধ কৌশলের মধ্যে নিম্নলিখিত কৌশলগুলোকে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে।

১. সর্বোচ্চ সহনশীল পরিবেশবান্ধব মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য ফিরিয়ে আনার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২. মাছ ও চিংড়ির আবাসস্থলের উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যকর স্থায়িত্বশীল আবাসস্থল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সহনশীল ধারাবাহিক উৎপাদন আহরণ নিশ্চিতকরণ।

৩. খাঁচায় ও পেনে মাছ ও চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার মতো

বিকল্প চাষ ব্যবস্থাপনা কৌশলের অনুশীলন ও বিস্তৃতির মাধ্যমে কার্যকর স্থায়িত্বশীল ধারাবাহিক উৎপাদন আহরণ নিশ্চিতকরণ।

৪. বৃক্ষ, শস্য ও মৎস্য উৎপাদনের দ্বন্দ্বহীন সহায়ক সমন্বিত উৎপাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অনুশীলন ও বনভূমি, কৃষিজমি ও জলাশয়ের স্থায়িত্বশীল অঞ্চলিকরণ।

৫. মানবসম্পদ উন্নয়ন, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন, প্রয়োজনীয় তথ্যভাণ্ডার সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক কার্যক্রম জোরদার করা।

৬. সমন্বিত সংরক্ষিত প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ সহনশীল ও কার্যকর পন্থায় আন্তঃসেক্টরের অংশগ্রহণমূলক উৎপাদন এবং আহরণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

সুন্দরবনে স্থায়িত্বশীল মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

নবায়নযোগ্য মৎস্যসম্পদ আমাদের উৎপাদন অর্থনীতিকে সচল রাখে যা প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট কোন উপায়ে বিনষ্ট হতে দেয়া কাঙ্ক্ষিত নয়। সুন্দরবনে নবায়নযোগ্য মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণার্থে নানাবিধ কার্যক্রমের কতিপয় নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক. লোনাপানির মাছ ও চিংড়ির মজুদ সংরক্ষণ

কার্যকর স্থায়িত্বশীল পন্থায় লোনাপানির মাছ ও চিংড়ির প্রাকৃতিক মজুদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে আহরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে-

১. **মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা:** মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা মাছ ও চিংড়ির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্যে একটি কার্যকর উৎপাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। স্থায়িত্বশীল পন্থায় ও পদ্ধতিতে লোনাপানির সম্ভাব্য সুবিধাজনক এলাকায় মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নবায়নযোগ্য মজুদ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে করে সেখানে পরিবেশবান্ধব সর্বোচ্চ সহনশীল পরিমাণে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন এবং আহরণ সম্ভব হয়।

২. **চিংড়ির জুভেনাইল ও মা চিংড়ি আহরণ নিয়ন্ত্রণ ও নিষিদ্ধকরণ:** মাঠ পর্যায়ের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, অনিয়ন্ত্রিত পন্থা ও পদ্ধতিতে জুভেনাইল চিংড়ি/চিংড়ির পোনা ও মা চিংড়ি আহরণ লোনা পানির প্রাকৃতিক চিংড়ির মজুদকে দিনে দিনে নিঃশেষ-এর মাধ্যমে উৎপাদন-অর্থনীতিকে বিঘ্নিত করে আসছে। শুধু তাই নয় এই চিংড়ির জুভেনাইল বা পোনা আহরণের সময় অসংখ্য সাদা মাছের পোনার মৃত্যু ঘটিয়ে থাকে। একটি চিংড়ির জুভেনাইল বা পোনা ধরার সময় প্রায় ৩০ থেকে ৫০টি সাদা মাছের পোনা ধ্বংস হয়। তাই লোনাপানির মাছ ও চিংড়ির নবায়নযোগ্য মজুদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে এই চিংড়ির জুভেনাইল ও মা চিংড়ি আহরণ বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে বন্ধ করার ব্যবস্থা নিয়ে স্থায়িত্বশীল উৎপাদন ধারা বজায় রাখা প্রয়োজন।

খ. মৎস্যজীবীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি

সুন্দরবন এলাকার দরিদ্র মৎস্যজীবীগণ অভাবের তাড়নায় যেমনি ক্ষতিকারক পন্থায় মাছ ও চিংড়ি আহরণ করে তেমনি জ্ঞান-দক্ষতার অভাবেও সেই প্রাকৃতিক সম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা ও আহরণ করতে পারে না। তাই নিম্নোক্ত পন্থায় তাদের কর্মদক্ষতা বাড়াতে পারলে সুন্দরবন এলাকার মাছ ও চিংড়ির বর্তমান উৎপাদনকে দ্বিগুণ করা সম্ভব। যেমন–

১. **যৌক্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবহারে গণসচেতনতা সৃষ্টি:** সুন্দরবন এলাকার প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের জন্য সেখানকার সম্পৃক্ত জনগণের মাঝে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে অনুপ্রেরণা জাগাতে পারলে প্রাকৃতিক সম্পদের অংশীদারিত্বমূলক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সহায়ক হবে। স্থানীয় পর্যায়ে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে বর্তমান মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

২. **প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নে উদ্বুদ্ধকরণ:** সুন্দরবন এলাকার সকল প্রাকৃতিক সম্পদের মতো মৎস্যসম্পদও দেশ ও জনগণের সম্পদ তাই এর সাথে সম্পৃক্ত জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ, উন্নয়ন সাধন এবং নিশ্চিত করতে হবে সম্পদের সর্বোচ্চ সহনশীল ব্যবহার।

৩. **কার্যকর ও স্থায়িত্বশীল মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ:** সুন্দরবন এলাকার প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদ নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতির পাশাপাশি সেখানকার সম্পৃক্ত জনগণের ক্ষতিকারক নানাবিধ কার্যক্রমেও নাবয়নযোগ্য মৎস্যসম্পদের ক্ষতি সাধন হচ্ছে। এসব ক্ষতির কিছু কারণ হচ্ছে যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও আহরণ সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব। তাই কার্যকর ও স্থায়িত্বশীল মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যমান মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও স্থায়িত্বশীল সম্পদ আহরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৪. **স্বাস্থ্য ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণ:** সুন্দরবন এলাকার মৎস্যজীবীদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য শিক্ষার অভাবে কর্মদক্ষতা দেখাতে পারে না। ফলশ্রুতিতে সেখানকার মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন ও আহরণে আসে প্রমাণিত ব্যর্থতা। তাই স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

গ. বিকল্প উৎপাদন ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ-অনুশীলন

কোনো একক পদ্ধতি অনুসরণ করে কেউ পুরোপুরি সফলতা লাভ করতে পারে না, প্রয়োজন প্রচলিত পদ্ধতির সাথে বিকল্প উৎপাদন ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ-অনুশীলন। সুন্দরবন এলাকার মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন আহরণ কাজেও তেমনি কিছু বিকল্প উৎপাদন ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ-অনুশীলন অত্যাবশ্যক। যেমন–

১. **সমাজভিত্তিক খাঁচায় মাছ চাষ:** সুন্দরবন এলাকার নদীনালা ও অন্যান্য সম্ভাব্য জলাশয়ে খাঁচায় মাছচাষ ব্যবস্থাপনার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যার মাধ্যমে সেখানকার জলাশয়ের কার্যকর পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা করা সম্ভব।

২. **সমাজভিত্তিক বৃহদাকার বদ্ধ জলাশয় ব্যবস্থাপনা:** সুন্দরবন এলাকায় যে সকল বৃহদাকার বদ্ধ জলাশয় রয়েছে যেখানে সমাজভিত্তিক মাছ ও চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বর্তমান উৎপাদন ধারাকে অনেকাংশেই বাড়িয়ে নেয়া সম্ভব। আর তা করতে পারলে দরিদ্র মৎস্যজীবী যারা অভাবের তাড়নায় অনিয়ন্ত্রিত ক্ষতিকারক পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদের আহরণ করে থাকে তা রোধ করা ও তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব।

৩. **ক্ষতিকর নয় এমন মাছ ধরার সরঞ্জামের ব্যবহার:** সুন্দরবন এলাকার জলাশয়ে ক্ষতিকর মাছ ধরার সরঞ্জামের ব্যবহার নবায়নযোগ্য মৎস্যসম্পদের সীমাহীন ক্ষতিসাধন করে থাকে। এই সম্পদ সংরক্ষণের স্বার্থে ক্ষতিকারক নয় এমন মাছ ধরার সরঞ্জামের ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ-উন্নয়ন করা সম্ভব।

৪. **বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নসাধন:** সুন্দরবন এলাকার মৎস্যজীবীরা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের আহরিত মাছ ও চিংড়ির যৌক্তিক বাজারমূল্য পায় না। তাই সেসব এলাকায় মৎস্যজাত পণ্যের বাজারব্যবস্থার উন্নয়নসাধনের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের সহায়তা প্রদান করা গেলে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন-সমৃদ্ধি আনয়ন সম্ভব যা তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে উৎসাহিত করবে।

৫. **সক্ষম ও বিত্তবান মৎস্যজীবীদের বহিঃসমুদ্রে মাছ ধরতে উদ্বুদ্ধ করা:** সুন্দরবন এলাকায় বিদ্যমান মৎস্যসম্পদের তুলনায় সেখানে মৎস্যজীবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় সম্পদের উপর অসহনীয় চাপ সৃষ্টি করেছে যা কমিয়ে আনা প্রয়োজন। তাই সক্ষম ও বিত্তবান মৎস্যজীবীদের বহিঃসমুদ্রে মাছ ধরার জন্য উদ্বুদ্ধ করে প্রাকৃতিক নবায়নযোগ্য মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ-উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ. সুন্দরবনে মৎস্যসম্পদের কো-ম্যানেজমেন্ট পরিচালনা

সুন্দরবন এলাকায় কো-ম্যানেজমেন্ট পরিচালনায় বিদ্যমান নানাবিধ প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনাই এখানে বিবেচ্য। সুন্দরবন এলাকার যাবতীয় জলাশয়ের মালিকানা বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের যেখানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কোনো প্রকার কার্যকর উৎপাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই সুন্দরবন এলাকার জলাশয়ের কো-ম্যানেজমেন্ট পরিচালনার কৌশল ও পদক্ষেপসমূহ জরুরি বিবেচনায় নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ আবশ্যক:

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সাথে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে সুন্দরবন এলাকার নদী-নালা, খালসহ সমস্ত জলাশয়ে মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষমতা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কাছে ন্যস্ত করতে হবে।

২. সুন্দরবন এলাকার প্রায় স্বাদু থেকে লবণাক্ত সমস্ত জলাশয়ের বর্তমান অবস্থান-আয়তন ও পরিবেশ-প্রকৃতি অনুসারে জলাশয়ের শ্রেণীবিন্যাস করে সে অনুযায়ী জলাশয়ের কার্যকর স্থায়িত্বশীল কো-ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সাথে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমস্ত বনজ এবং মৎস্যসম্পদের কার্যকর স্থায়িত্বশীল সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণে উভয় মন্ত্রণালয়ের গ্রহণযোগ্য নীতিমালার আওতায় সুন্দরবন এলাকার সমস্ত জলাশয়ের কো-ম্যানেজমেন্ট চালু ও পরিচালনার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. সুন্দরবন এলাকার মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা করে তাদের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক উৎপাদন ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. সুন্দরবন এলাকাস্থ জলাশয়ে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন-আহরণ কার্যক্রম যাতে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কোন কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করতে না পারে সে লক্ষ্যে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা তদারকির জন্যে উভয় মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে স্থানীয় ও জাতীয় তদারকি কমিটি গঠন করতে হবে।

সুন্দরবন আমাদের দেশের এক অনন্য অহংকার যার প্রাকৃতিক সম্পদ ও পর্যটনমূল্য দেশের অর্থনীতিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। সুন্দরবন এলাকার প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদের কার্যকর স্থায়িত্বশীল পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনার জন্যে প্রস্তাবিত কৌশলগুলো অবলম্বন করা গেলে নবায়নযোগ্য মৎস্যসম্পদের ক্ষতির সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পেয়ে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত), মৎস্য অধিদপ্তর

সহনশীল ইলিশ উৎপাদন : বর্তমান অবস্থা ও করণীয়

এ বি এম জাহিদ হাবিব[১] ও ড. নির্মল চন্দ্র রায়[২]

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। বাঙালির সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আর গর্বের সাথে মিশে আছে ইলিশের স্বাদ, গন্ধ আর রূপ। সারা পৃথিবীতে আহরিত মোট ইলিশের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগই আসে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ থেকে। আর এ কারণেই গর্বের সাথে বলতে পারি বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য এ প্রাকৃতিক সম্পদ ইলিশের একচেটিয়া অধিকারী। অত্যন্ত সুস্বাদু ও জনপ্রিয় এ মাছ অনাদিকাল থেকেই আমাদের জাতীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও আমিষ জাতীয় খাদ্য সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। একক প্রজাতি হিসেবে দেশের মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত মাছের প্রায় ১২ শতাংশ আসে শুধু ইলিশ থেকে এবং জিডিপি-তে এর অবদান শতকরা ১ ভাগ (মৎস্য অধিদপ্তর, ২০০৯-১০)।

২০১০-১১ অর্থবছরের মে মাস পর্যন্ত ইলিশের উৎপাদন পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩.৩৪ লক্ষ মে.টন, যার বাজার মূল্য প্রায় ৮,৩৫০ কোটি টাকা (২৫০ টাকা কেজি হিসেবে)। উৎপাদিত ইলিশের মে ২০১১ পর্যন্ত ৮,৩২১ মে.টন বিদেশে রপ্তানি করে প্রায় ৩৩৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। কাজেই দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে ইলিশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইলিশ দেখতে যেমন সুন্দর, খেতে যেমন সুস্বাদু, পুষ্টিতেও তেমনি অতুলনীয়। এ মাছে অপেক্ষাকৃত উচ্চমাত্রায় আমিষ, চর্বি, শর্করা ও খনিজ পদার্থ বিদ্যমান। ইলিশ মাছের চর্বিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ও ডি থাকে এবং ওমেগা-৩ নামক অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড রয়েছে, যা মানুষের রক্তের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

উপকূলীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা নির্বাহে এর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রায় ৪.৫ লক্ষ লোক ইলিশ আহরণে সরাসরি নিয়োজিত এবং ২০-২৫ লক্ষ লোক পরিবহন, বিক্রয়, জাল ও নৌকা তৈরি, বরফ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, রপ্তানি ইত্যাদি কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত।

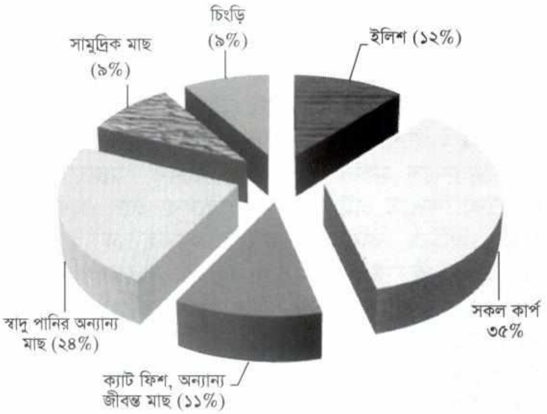

দেশের জনসখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে অধিক সংখ্যক লোকের নির্বিচারে জাটকা ও ডিমওয়ালা ইলিশ আহরণ, জাল নৌকার সংখ্যা বৃদ্ধি ও যান্ত্রিকায়ন, অবৈধ কারেন্ট জালের ব্যবহার, নদ-নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস ও গতিপথ পরিবর্তন, প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস, পলি ভরাট, জলজ পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে ইলিশ উৎপাদন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই ঐতিহ্যবাহী ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর সাম্প্রতিক সময়ে 'জাটকা রক্ষা কর্মসূচি' এবং 'জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্প' এর মাধ্যমে জাটকা সংরক্ষণ, ডিমওয়ালা মাছ রক্ষা করে অবাধ প্রজননের সুযোগ সৃষ্টি, মৎস্য সংরক্ষণ আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন, দরিদ্র জেলেদের আপদকালীন খাদ্য সহায়তা প্রদান ও বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা

ইলিশ সাগরের মাছ হলেও প্রজনন মৌসুমে (আগস্ট-অক্টোবর) ডিম ছাড়ার জন্য উপকূলীয় মোহনা ও নদীর উজানে চলে আসে এবং ডিম ছাড়ার পর আবার সাগরে ফিরে যায়। এসময় নদীর মোহনায় উৎপাদিত হয় ইলিশের লক্ষ লক্ষ রেণু পোনা, যা নদ-নদীতে বিচরণ করে জাটকায় রূপান্তরিত হয়। আমাদের দেশে নভেম্বর-মে মাস পর্যন্ত ইলিশ জাটকা অবস্থায় ৯ ইঞ্চির নিচে থাকে। এসময় জাটকা ধরা নিষেধ থাকা সত্ত্বেও নির্বিচারে প্রচুর পরিমাণে জাটকা ধরা হয়। মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ (সংশোধিত ২০০৩) এর বিধান অনুযায়ী নভেম্বর হতে মে মাস পর্যন্ত জাটকা ধরা, ক্রয়-বিক্রয়, হেফাজতে রাখা এবং পরিবহন আইনত নিষিদ্ধ

করা হয়েছে। অথচ প্রায়শই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জাটকা ধরা হচ্ছে এবং হাটে-বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। বিভিন্ন তথ্য সূত্রে জানা যায় যে, ইলিশ অভয়াশ্রম হিসেবে চিহ্নিত, ৪টি জেলার (ভোলা, পটুয়াখালী, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর) নদ-নদীতে ৬০% জাটকা বিচরণ করে থাকে এবং এর একটা বিরাট অংশ অবৈধভাবে ধরা হয়ে থাকে।

জাটকা আহরণে নিয়োজিত জেলে সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা প্রধানত জাটকা আহরণের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। জাটকা আহরণকারী জেলেরা বলেন, 'ইলিশ পাই না তাই পেটের দায়ে জাটকা ধরি'। আবার ভোক্তাগণ বলেন, 'ইলিশ পাই না তাই ইলিশের স্বাদ মেটানোর জন্য বাধ্য হয়ে জাটকা কিনি'। অন্যদিকে মৎস্য ব্যবসায়ীরা বলেন, আমরা ইচ্ছা করে জাটকা কিনতে চাই না, কিন্তু জেলেরা এনে দেয় তাই বাধ্য হয়ে জাটকা কিনি। প্রকৃতপক্ষে আমরা কেউই ত্যাগ স্বীকারে রাজি নই। তাই বলা যায়, জাটকা সংরক্ষণে বহুবিধ সমস্যার মধ্যে অন্যতম সমস্যা হচ্ছে আর্থসামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের অভাব। এ ছাড়াও নদনদী সংকোচন, ব্যাপকভিত্তিক কারেন্ট জাল উৎপাদন ও ব্যবহার, নদীর গতিপথ পরিবর্তন, উজানে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ, পানিদূষণ ও বর্জ্য নিষ্কাশন, কর্মসংস্থানের অভাব, জেলেদের দৈন্যতা, জাটকা আহরণকারী জেলেদের সরকারি অপর্যাপ্ত ভর্তুকি, জলাশয়ে পলি ভরাট, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত চাহিদাজনিত অতিআহরণ, সামগ্রিক জনসচেতনতা ও দেশপ্রেমের অভাব, আইন প্রয়োগকারী ও তদারকি সংস্থার জনবল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাব, রাজনৈতিক প্রভাব, আইনের দুর্বলতা ও জটিলতা, বাজেট স্বল্পতা, দারিদ্র্য ও আয় সংকোচন, মহাজনী ফাঁদ ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ কারণে বর্তমানে ইলিশের সহনশীল উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

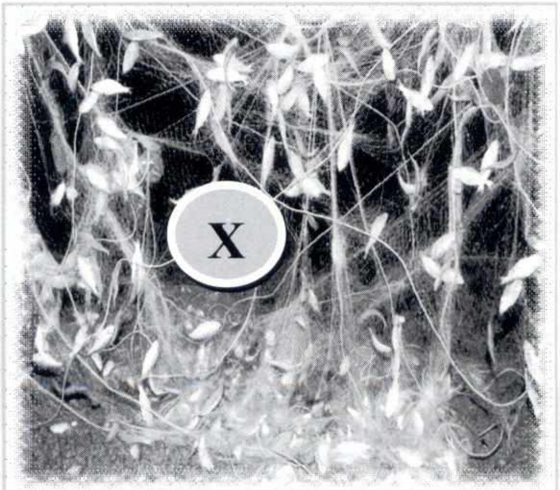

ইলিশ উন্নয়নে ব্যবস্থাপনা কৌশল ও করণীয়

ইলিশ ও জাটকা আহরণে নিয়োজিত মৎস্যজীবী ও ব্যবসায়ীগণ এ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ সুফলভোগী। এ সম্পদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রত্যক্ষ সুফলভোগীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। তাঁদেরকে নিবিড়ভাবে ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে সম্পৃক্ত করতে হবে। জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রা বিশ্লেষণ, বিদ্যমান সম্পদ চিহ্নিতকরণ এবং দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে দীর্ঘমেয়াদে বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইলিশের উৎপাদন জলজ পরিবেশ ও নদ-নদীতে পানি প্রবাহের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের জলজ পরিবেশের ক্রমশ পরিবর্তন হচ্ছে। সম্প্রসারিত শিল্পায়ন ও কলকারখানার বর্জ্য যথাযথভাবে দূষণ মুক্তকরণের ব্যবস্থা না করে সরাসরি নদ-নদীতে ফেলার কারণে দেশের জলজ পরিবেশ ক্রমাগতভাতে দূষিত হচ্ছে। ফলে ইলিশসহ দেশের অন্যান্য মৎস্যসম্পদের জন্য হুমকি সৃষ্টি হচ্ছে। দেশের সকল স্তরে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। এ লক্ষ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ বৃদ্ধিসহ সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনে ইলিশ মাছের অবদান ও গুরুত্ব বিবেচনা করে এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে ধারাবাহিকভাবে এসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন আরো জোরদার করতে হবে।

ইলিশ সম্পদের স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য ১৬টি কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রধান ৬টি কর্মকৌশল মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অবশিষ্ট কর্মকৌশলসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আগামীতে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া হবে। ইলিশের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখা ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত কার্যব্যবস্থা ও কৌশল অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক:

- ডিমওয়ালা ইলিশ ও ইলিশের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ;
- জাটকা সংরক্ষণ অর্থাৎ জাটকা আহরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা;
- প্রাকৃতিকভাবে ছোট আকারের ইলিশ প্রতিপালন করে বড় মাছ ধরা;
- ইলিশ মাছের প্রজাতিগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ইলিশ মাছের অতিআহরণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ;
- ইলিশ মাছের আবাসস্থল ও পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা;
- ইলিশ মাছের আহরণ পরিসংখ্যান নির্ণয় পদ্ধতির উন্নয়ন করা;
- প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা;
- ইলিশসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা বৃদ্ধি;
- ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতার উদ্যোগ গ্রহণ;

- ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষ জনবল সৃষ্টি, জনবল বৃদ্ধিকরণ;
- ইলিশ ও জাটকা জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি;
- ইলিশ জেলেদের জীবন ও জাল নৌকার জন্য বীমা ব্যবস্থার প্রচলন ও সুদমুক্ত ঋণ প্রদান;
- ইলিশ মাছ পরিবহন, বাজারজাতকরণের পদ্ধতি উন্নয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণ;
- ইলিশ মাছের বিভিন্ন প্রোডাক্ট তৈরি ও রপ্তানি বৃদ্ধি; এবং সকল স্তরের জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে বর্তমানে পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ

- সরকার ঘোষিত ইলিশ অভয়াশ্রমসমূহে নিষিদ্ধকালীন সময়ে মাছ ধরা কঠোরভাবে প্রতিরোধ করা তথা অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;
- জাটকা নিধন রোধে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ পুলিশ ও র‌্যাব, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড সমন্বিতভাবে নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত মোট সাত মাস নদ-নদী, মাছ ঘাট, হাট-বাজারে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও বিশেষ অভিযান/ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেছে। উল্লেখ্য ২০১০-১১ অর্থবছরে জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্প এলাকায় জাটকা রক্ষা কার্যক্রম আরো বেগবান করার লক্ষ্যে প্রকল্পের অর্থায়নে দ্রুতগামী ট্রলার ভাড়া করে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রমে অভিযান পরিচালনার কাজে নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে প্রশংসনীয় ফল লাভ করা গেছে।
- ইলিশের প্রধান চারটি প্রজননক্ষেত্রে ডিমওয়ালা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ আইন বাস্তবায়ন। ভরা প্রজনন মৌসুম অর্থাৎ আশ্বিনের ভরা পূর্ণিমার জো-তে প্রধান প্রধান প্রজননক্ষেত্রে ইলিশের অবাধ প্রজননের সুযোগ দেয়ার নিমিত্ত ১৫-২৪ অক্টোবর ১০ দিন উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বর্তমান সরকার আশ্বিনের ভরা পূর্ণিমার সাথে সঙ্গতি রেখে আইনটি আরও বাস্তবমুখী করার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে ভরা প্রজনন মৌসুমে সারাদেশব্যাপী ১১ দিন ইলিশ আহরণ, বিপণন, পরিবহন ও মজুদ রাখা নিষিদ্ধের প্রস্তাব করা হয়েছে।

- জাটকা রক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে জাটকা সমৃদ্ধ ১৫টি জেলার ৮৫টি উপজেলায় ২৮৭,৮২৪টি জেলে পরিবার সমন্বয়ে সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবীদের একটি খসড়া তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে, যার ভিত্তিতে বিভিন্ন সহায়ক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০০৯-১০ অর্থবছরে জাটকা সমৃদ্ধ ১০টি জেলার ৫৭টি উপজেলায় ১,৬৪,৭৪০ জন জাটকা আহরণে বিরত মৎস্যজীবী পরিবারের মধ্যে পরিবার প্রতি মাসিক ৩০ কেজি হারে ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত ৪ মাসের জন্য ১৯৭৬৮.৬০ মে. টন খাদ্যশস্য প্রদান করা হয়েছে। জাটকা সমৃদ্ধ ১০টি জেলা হচ্ছে চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা, শরীয়তপুর ও মুন্সিগঞ্জ;
- ২০১০-১১ অর্থবছরে ভিজিএফ কার্যক্রম পূর্বের ১০টি জেলাসহ আরও ৫টি নতুন জেলায় সম্প্রসারিত করা হয়েছে। নতুন জেলাসমূহ হলো নোয়াখালী, বাগেরহাট, মানিকগঞ্জ, সাতক্ষীরা ও চট্টগ্রাম। নতুন ৫টি জেলার ২৬টি উপজেলায় আরো ২১,৫২৪ জন জেলে পরিবরাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে ২০১০-১১ অর্থবছরে ভিজিএফ আওতাভুক্ত ১৫টি জেলার মোট ৮৫টি উপজেলায় ভিজিএফ সুফলভোগীর সংখ্যা হয়েছে ১৮৬,২৮৪ জন এবং ভিজিএফ খাদ্যশস্যের পরিমাণ ১৪,৪৭০.৬৪ মে.টন। উল্লেখ্য যে, দেশব্যাপী খাদ্যনিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে এবছর পরিবার প্রতি মাসে ২০ কেজি হারে ভিজিএফ চাল প্রদান করা হয়েছে;
- জাটকা রক্ষা কর্মসূচি ও জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রম ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১০টি জেলার ৫৭টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে (অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহ চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা, শরীয়তপুর ও মুন্সিগঞ্জ)। এ খাতে বরাদ্দ ছিল মোট ৫.০০ কোটি টাকা এবং সুফলভোগীর সংখ্যা ছিল ১৪,৭৪৬ জন। জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি সমাপ্তির পর ২০১০-১১ অর্থবছরে শুধুমাত্র জাটকা সংরণ প্রকল্পের আওতায় ৪টি জেলার ২১টি উপজেলায় বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রমে ৫.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৬,৮২৫ জন সুফলভোগীদের মাঝে উপকরণাদি বিতরণ করা হয়েছে।

- ❑ বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য মনোনীত সুফলভোগীদের বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রম ফলপ্রসূ করার নিমিত্ত বিভিন্ন ট্রেডে ২ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ❑ মৎস্য অধিদপ্তর ও সিএনআরএস-এর যৌথ উদ্যোগে চাঁদপুর জেলার সদর ও মতলব উত্তর উপজেলার জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান এর কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে;
- ❑ গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং জাটকা রক্ষা কর্মসূচি আরও অর্থবহ করার লক্ষ্যে বিগত ৪ হতে ১০ এপ্রিল 'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১১' উদ্‌যাপিত হয়েছে। এবছর পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়ায় ইলিশ সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে খ্যাত মহিপুর মৎস্য বন্দরে জাটকা সংরণ সপ্তাহ ২০১১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ সকল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সরকারের নীতি নির্ধারণীমহল, জনপ্রতিনিধিসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

- ❑ বিএফআরআই-এর মাধ্যমে নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করে জাটকা রক্ষা ও ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের ফলাফল নিরূপণ ও সে মোতাবেক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

ইলিশের সামগ্রিক উৎপাদন ও রপ্তানি আয়

- ❑ ইলিশ উৎপাদনের গতিধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বিগত ২০০১-০২ সালের তুলনায় ২০০২-০৩ সালে দেশে ইলিশ উৎপাদন প্রায় ১০% হ্রাস পেয়েছিল। ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখাসহ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ২০০৩ সাল হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, ফলে ২০০১-০২ সালের তুলনায় ২০০৬-০৭ সালে ইলিশ মাছের উৎপাদন প্রায় ৮১,০০০ মে.টন বা ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মসূচি পূর্ববর্তী বছরে (২০০২-০৩) ইলিশের উৎপাদন ছিল ১.৯৯ লক্ষ মে.টন, যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে ৩.১৩ লক্ষ মে.টন। বিগত ৭ বছরে ৫.৯৬ লক্ষ মে.টন বর্ধিত ইলিশ উৎপাদিত হয়েছে, যার বাজার মূল্য প্রায় ১৪,৯০০ কোটি টাকা (প্রতি কেজি ২৫০ টাকা হিসাবে)।
- ❑ ২০১০-১১ অর্থবছরের মে মাস পর্যন্ত ইলিশ উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩.৩৪ লক্ষ মে.টন যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ৮,৩৫০ কোটি টাকা (প্রতি কেজি গড়ে ২৫০ টাকা হিসাবে)। এ বছর ইলিশের প্রাপ্যতা ছিল সারা বাংলাদেশে চোখে পড়ার মত। মোট আহরিত ইলিশের মধ্যে ২০১১ এর মে মাস পর্যন্ত ৮,৩২১ মে.টন রপ্তানি করে আয় হয়েছে ৩৩৪ কোটি টাকা (১ ডলার=৭০ টাকা হিসেবে)।

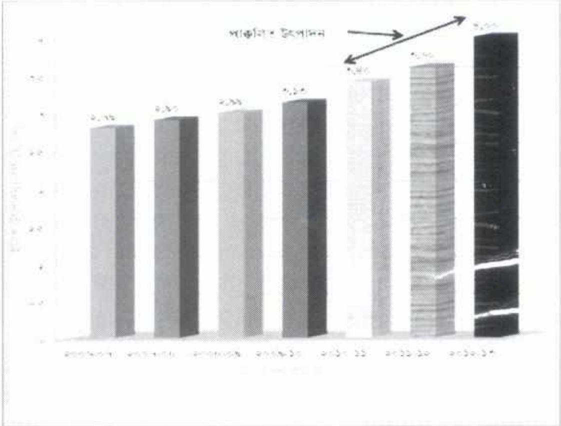

ইলিশ মাছের সহনশীল উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য সর্বাগ্রে জাটকা সংরক্ষণ, ডিমওয়ালা মাছ রক্ষা, অবাধ প্রজনন সুবিধা সৃষ্টি এবং এতদ্‌সংক্রান্ত কাজে জেলেদের নিবৃত্ত করার জন্য আপদকালীন পর্যাপ্ত খাদ্য সহায়তা প্রদান ও বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি অত্যাবশ্যক। পাশাপাশি জেলেদের দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব পরিবর্তন করা প্রয়োজন। যাতে তাদের মধ্যে এ উপলব্ধি আসে যে, জাটকা রক্ষার ফলে তারাই বেশি লাভবান হবেন।

আগামীতে ইলিশের উৎপাদন আরও বৃদ্ধির প্রয়াসে কার্যকর ও বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে তৎপর হওয়া অত্যাবশ্যক। আগামী ২০১১-১২ অর্থবছরে দেশে ৪.০ লক্ষ মে.টন ইলিশ উৎপাদন এবং ৫০০ কোটি টাকা রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যা যা প্রয়োজন সেভাবে কর্মপন্থা নির্ধারণে এগিয়ে যেতে হবে। বিশেষজ্ঞগণের মতে দেশে ৫.০ লক্ষ মে.টন ইলিশের সহনশীল উৎপাদন হওয়ার পাশাপাশি রপ্তানিও বৃদ্ধি পাবে।

১. প্রকল্প পরিচালক, জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর
২. সহকারী পরিচালক, জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর

দারিদ্র্য দূরীকরণে নিমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্প : সম্ভাবনা ও করণীয়

এম আই গোলদার[১], মোঃ আরিফ হোসেন[২] ও মোঃ জুবায়দুল আলম[৩]

উত্তরাঞ্চলের মানুষের মাঝে একসময় নিমগাছি বলতে মৎস্য বিভাগের মৎস্য প্রকল্প বুঝাতো অর্থাৎ নিমগাছি ফিসারি অতি পরিচিত একটি নাম। স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে তাঁদের জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার ও বৃটিশ সরকারের (ওডিএ) আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় সত্তরের দশকে নিমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ ও তাড়াশ এবং পাবনা জেলার ভাঙ্গুরা ও চাটমোহর উপজেলার প্রায় ৬৭৪.৭৬ হে. আয়তনের ৭৮৩টি সরকারি পুকুর-দীঘিই ছিল প্রকল্পের মূল অবলম্বন। প্রকল্প শুরুর প্রাক্কালে এ সমস্ত পুকুর-দীঘি জঙ্গলাকীর্ণ ও জলজ আগাছায় ভরপুর ছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা হাজামজা পতিত অবস্থায় মৎস্যচাষের অনুপযোগী ছিল। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক এ সমস্ত পুকুর দীঘির কচুরিপানা ও জলজ আগাছাসহ অন্যান্য উদ্ভিদ অপসারণের পর পুকুর সংস্কার ও পুনঃখনন করে মাছচাষের উপযোগী করতে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের সুবিধার্থে রায়গঞ্জ উপজেলার নিমগাছিতে প্রায় ২৩.০ একর জমির উপর প্রকল্পের পৃথক অফিস চত্বর, আবাসিক চত্বর ও হ্যাচারি কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়। দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, রেণু ও পোনা উৎপাদন, মৎস্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও হস্তান্তর এবং মৎস্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন করে স্থানীয় আদিবাসী ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নই ছিল প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। ১৯৮৪ সালে প্রকল্পের সকল উন্নয়ন কাজ শেষে মৎস্য অধিদপ্তরের অভিজ্ঞ জনশক্তির মাধ্যমে মৎস্য বিষয়ক প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং প্রদর্শনী খামার স্থাপন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম চলমান ছিল।

১৯৮৬ সালে মৎস্য অধিদপ্তরের এ প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়নের পূর্বেই সরকারের সিদ্ধান্তে হঠাৎ করে নিমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমসহ সকল অবকাঠামো গ্রামীণ ব্যাংক-কে ২৫ বছরের জন্য ইজারা প্রদান করা হয়। প্রত্যাশা ছিল গ্রামীণ ব্যাংক সুফলভোগীদের দল গঠন ও মৎস্যচাষে সম্পৃক্ত করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ফলপ্রসূ অবদান রাখবে। গ্রামীণ ব্যাংক দীর্ঘ সময়ে সুফলভোগী দল গঠন করে সরকারি পুকুর-দীঘিতে মাছচাষ করতে সক্ষম হয়েছে এবং এলাকায় মাছের উৎপাদনও বৃদ্ধি হয়েছে একথা অনস্বীকার্য। স্থানীয় সুফলভোগী ও জনসাধারণ থেকে জানা যায় গ্রামীণ ব্যাংক মৎস্যচাষ, উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনায় নিজস্ব কর্মীবাহিনীর ওপরই বেশি নির্ভর করেছেন। 'যৌথ পদ্ধতিতে' মাছচাষে সমস্ত উৎপাদন উপকরণসহ যাবতীয় ব্যয় গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বহন করেছেন এবং সকল আয়-ব্যয়ের হিসেব শেষে শুধুমাত্র লভ্যাংশের অর্ধাংশ সুফলভোগীরা ও অবশিষ্টাংশ গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশন পেয়েছেন। স্থানীয়ভাবে সুফলভোগীরা এক অর্থে পাহারাদারের ভূমিকা পালন করেছেন এবং মাছ আহরণ ও বিপণন শেষে নগদ কিছু অর্থ পেয়ে খুশি হয়েছেন। কিন্তু স্থানীয় সুফলভোগী দল স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পেয়েছে এমনটি মনে হয়নি। তবে গ্রামীণ ব্যাংক এ বিশাল জলসম্পদ ব্যবহার করে পরবর্তীতে গ্রামীণ মৎস্য ও পশুসম্পদ ফাউন্ডেশন নামে পৃথক অঙ্গসংগঠন গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। সুদীর্ঘ ২৫ বছর ধরে প্রকল্পটি ঘিরে গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ গ্রামীণ মৎস্য ও পশুসম্পদ ফাউন্ডেশনের কলেবর বৃদ্ধিতে অধিক মনোযোগী হয়েছে। দরিদ্র সুফলভোগীদের দারিদ্র্য বিমোচন তথা আর্থসামাজিক অবস্থার কতটুকু উন্নয়ন ঘটেছে তা মূল্যায়ন সাপেক্ষ। ২০১১ সালের ২০ জানুয়ারি চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় বাস্তব পরিস্থিতির বিবেচনায় স্থানীয় দরিদ্র ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার কথা বিবেচনা করে বর্তমান সরকার চুক্তি নবায়ন না করে প্রকল্পটি মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করেছেন।

প্রকল্পটি হস্তান্তরের পর এলাকার মাছের উৎপাদনের ধারাকে অব্যাহত রাখতে জনবল সঙ্কটের মধ্যেও মৎস্য অধিদপ্তর তাৎক্ষণিকভাবে জনবল পদস্থ করে ও অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে নিমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্পের হ্যাচারি ইউনিটের উৎপাদন কাজ সচল রেখেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ২০১১ উৎপাদন সালে ৩০০.০০ কেজি রেণু ও ৫.০০ লক্ষ (১০-১৪ সেমি) সাইজের পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন সরকারি খামার থেকে ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্পের আওতায় উৎপাদিত প্রাকৃতিক উৎসের ব্রুডমাছ সংগ্রহ করে গুণগত ও মানসম্মত রেণু ও পোনা উৎপাদনের কাজ অব্যাহত রয়েছে এবং এ পর্যন্ত অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে।

নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা

অপার সম্ভাবনার নিমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্পের খাসপুকুরসহ সমুদয় স্থাপনার সুষ্ঠু ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা এবং প্রায় ৮-১০ হাজার সুফলভোগী পরিবারের অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনমানের অধিকতর উন্নয়নের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুমোদিত হয়েছে।

এ নীতিমালার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নরূপ:

ক. সরকার নিয়ন্ত্রণে ব্যবহারযোগ্য জলাশয় ব্যতিরেকে অন্য জলাশয়ের চারপার্শ্বে বসবাসরত পরিবার প্রতি একজন করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে (০.৫০ একর পর্যন্ত জমির মালিক) প্রতি একরের জন্য ৬ জন অর্থাৎ বিঘা প্রতি ২ জন হিসেবে সুফলভোগী সদস্য নির্বাচিত হবেন। মৎস্যজীবী, মুক্তিযোদ্ধা, বিধবা ও হতদরিদ্রগণ সুফলভোগী দলে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন।

খ. প্রতিটি জলাশয়ে সুষ্ঠুভাবে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার জন্য

সাধারণ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত ৭ সদস্যবিশিষ্ট ৩ বছর মেয়াদী সুফলভোগী দল পরিচালনা কমিটি থাকবে। এ কমিটির নামে নিকটবর্তী তফসিলী ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব থাকবে যা যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

গ. সুফলভোগী দল পরিচালনা কমিটি দ্বারা স্থানীয়ভাবে টেকসই সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে এবং জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে যথাক্রমে উপজেলা ও জেলা সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ সদস্যসচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। এ কমিটি মূলত সুফলভোগী দল গঠন, অনুমোদন, বিরোধ নিষ্পত্তি, ঋণ প্রাপ্তিতে সহযোগিতাসহ সার্বিক প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করবে।

নীতিমালাটি বাস্তবায়িত হলে সুফলভোগী দল জলাশয় হতে প্রাপ্ত আয়ের উপর পূর্বের শতকরা ৫০ ভাগের স্থলে ১০০ ভাগ অধিকার লাভ করবে। সুফলভোগী দলকে শুধুমাত্র নির্ধারিত হারে পুকুরের বন্দোবস্তের জন্য সরকারি রাজস্ব প্রদান করতে হবে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় কৌলিতাত্ত্বিক গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুডমাছ উৎপাদন, রেণু ও পোনা সরবরাহ নিশ্চিত হবে। এ বিশাল জলরাশিকে টেকসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত করে স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে।

সমস্যা ও করণীয়

- ইতোপূর্বে চারটি উপজেলায় বিস্তৃত পুকুরগুলোকে ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ১৪টি ইউনিটে বিভক্ত করা হয়। উক্ত ইউনিটে বিদ্যমান স্থাপনাদি ও অফিসঘর সামান্য মেরামত করলে ব্যবহারোপযোগী করা সম্ভব। তাছাড়া নিমগাছিতে রয়েছে রেস্ট হাউজ, আবাসিক ভবনসহ পৃথক অফিস ভবন ও প্রয়োজনীয় স্থাপনাদি। সরকারি এ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে টেকসই মৎস্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করে এ অঞ্চলের মাছের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব।
- নিমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্পের বিদ্যমান জলরাশি ও অবকাঠামো ব্যবহার করে অধিকতর সুযোগ সুবিধা সম্বলিত একটি আধুনিকমানের মৎস্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা হলে বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, সম্প্রসারণকর্মী ও প্রশিণক্ষার্থীবৃন্দ হাতে কলমে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনার কলাকৌশল শিখতে পারবে ফলে মৎস্য সেক্টরের দক্ষ জনবলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।
- দীর্ঘদিন আগে প্রকল্পভুক্ত খননকৃত অনেকগুলো পুকুর প্রায় ভরাট হতে চলেছে।
- বেশ কিছু পুকুর বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞ আদালতে মামলাধীন রয়েছে এবং কিছু কিছু পুকুর বেদখলেও রয়েছে। বেদখলকৃত পুকুরগুলো প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সরকারের পক্ষে দখলে নেয়া এবং মামলাধীন পুকুরগুলোর মামলা পরিচালনার ব্যবস্থাও করা দরকার।
- বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় উত্তরাঞ্চলের বেশির ভাগ পুকুরে সারা বছর পর্যাপ্ত পানি থাকে না। ফলে বেসরকারি হ্যাচারি মালিকগণ প্রায়শ নিজস্ব পুকুরে উন্নতমানের ব্রুড সংরক্ষণ করতে পারেন না। প্রজনন মৌসুমে অনেকেই পার্শ্ববর্তী চাষির পুকুরের বিক্রয়যোগ্য (টেবিল ফিস) মাছকে ব্রুড হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। চাষিরা বাধ্য হয়ে নিম্নমানের রেণু থেকে উৎপাদিত পোনা ব্যবহার করছে। ফলে মাছ কৌলিতাত্ত্বিক গুণাগুণ হারাচ্ছে এবং জাতীয় মৎস্য উৎপাদনে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।
- এ অঞ্চলের অধিকাংশ পুকুর-দীঘি শুকনো মৌসুমে শুকিয়ে যায় বা গভীরতা কমে ব্রুড প্রতিপালনে উপযুক্ততা হারায়। কিন্তু খরামৌসুমেও এ প্রকল্পভুক্ত পুকুর-দীঘিতে সারা বছর ব্রুড মাছের জন্য উপযুক্ত গভীরতায় পানি থাকে। তাছাড়া বেশ কিছু পুকুর আয়তনেও বড় (যেমন জয়সাগর-১৬৭ বিঘা, রুদ্রদীঘি-৭৯ বিঘা, প্রতাপদীঘি-৭৩ বিঘা ইত্যাদি) হওয়ায় ব্রুড উৎপাদনের উপযোগী। ফলে প্রাথমিকভাবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় এসব পুকুরে গুণগত মানের প্রাকৃতিক উৎসের ব্রুডমাছ উৎপাদন করে সরকারি মৎস্য খামার ও বেসরকারি হ্যাচারি মালিক/উদ্যোক্তাদের মাঝে সরবরাহ করে উন্নতমানের রেণু ও পোনা উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব।
- নিমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্পের পুকুরসহ সমুদয় স্থাপনার সুষ্ঠু ব্যবহার, ব্যবস্থাপনার জন্য সম্প্রতি অনুমোদিত নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা বাস্তবায়নে জেলা/উপজেলা জলাশয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তার জন্য প্রকল্পের অধীনে ইতোপূর্বে রাজস্ব বাজেটের আওতায় সৃষ্ট পদসমূহ পুনর্বহাল, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এসব পুকুর পুনঃখনন করা দরকার এবং বাস্তবতার নিরিখে নতুন পদও সৃষ্টি করা দরকার।
- সরকারি জলাশয়ের ওপর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে দরিদ্র সুফলভোগীদেরকে রক্ষা করতে সুফলভোগী সমিতির অনুকূলে স্বল্প সুদে সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ঋণ সহায়তা প্রদান এবং মৎস্য অধিদপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ও সম্প্রসারণ সেবা অব্যাহত রাখা জরুরি।

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্পের অভীষ্ট দরিদ্র জণগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন হবে এবং দেশের মাছের চাহিদা পূরণে এ উদ্যোগ সফল হবে এ প্রত্যাশা সকলের।

১. উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
২. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর
৩. প্রকল্প সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর

পাঙ্গাসের পুকুরের তলানি ব্যবহার করে ব্যাগ গার্ডেনিং

ড. মুহাম্মদ মাহফুজুল হক (রিপন)

পৃথিবীতে 'অ্যাকোয়াকালচার' অর্থাৎ মাছচাষের মাধ্যমে মাছ উৎপাদনকারী প্রধান ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। আশির দশকে যেখানে সিংহভাগ মাছ প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে আহরণ করা হতো সেটা পরিবেশ বিপর্যয় এবং অন্যান্য মানবসৃষ্ট কারণে ব্যাপকভাবে কমে যায়। মাছ উৎপাদনের এই বিশাল ঘাটতি পূরণে বর্তমানে প্রায় ৫০ শতাংশ মাছ বিভিন্ন জলাশয়ে নানাবিধ অ্যাকোয়াকালচার পদ্ধতির মাধ্যমে আসে। মাছচাষের এ বিপ্লবের পিছনে অনেকগুলো নিয়ামকের ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। তার মধ্যে প্রজাতিভেদে উচ্চ ফলনশীলতার দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে থাই পাঙ্গাস (*Pangasianodon hypophthalmus*)। এর ফলশ্রুতিতে নব্বইয়ের দশকে দেশে বাণিজ্যিকভাবে পাঙ্গাস চাষ শুরু হয়ে বর্তমানে তা এক বিশাল শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বিভিন্ন সূত্র হতে অনুমান করে বলা যায় যে দেশে মোট পাঙ্গাসের উৎপাদন বছরে ৩ - ৪ লক্ষ মে.টন।

বাংলাদেশে যে সমস্ত প্রচলিত মাছচাষ পদ্ধতি রয়েছে তার মধ্যে পাঙ্গাস চাষ একটি নিবিড় চাষ প্রক্রিয়া। এ চাষ প্রক্রিয়ায় হেক্টর প্রতি ৬০,০০০-৭০,০০০ পোনা ছাড়া হয়। মাছের উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৫০ থেকে ৬০ মে.টন পর্যন্ত হয়ে থাকে। নিবিড় চাষ প্রক্রিয়ায় প্রতি কেজি পাঙ্গাস উৎপাদন করতে কমপক্ষে দুই কেজি পিলেট খাবার লাগে। সে হিসেবে বছরে হেক্টর প্রতি খাদ্য ব্যবহার হয় প্রায় ১০০,০০০ থেকে ১২০,০০০ কেজি যা প্রতি বর্গমিটারে ১০-১২ কেজি। মাটির উপর ১০-১২ কেজি খাবার রাখলে ১ বর্গমিটার জায়গাকে প্রায় ১/২ ইঞ্চি পুরু করে আবৃত করে। সরবরাহকৃত খাদ্যের অব্যবহৃত অংশ, মাছের বিষ্ঠা ও অন্যান্য জৈব উপাদান পুকুরের তলদেশে জমা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে পাঙ্গাসের খাদ্যের মধ্যে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন রয়েছে তার ৩০% মাছের দেহে গৃহীত হয় এবং বাকি ৭০% নাইট্রোজেন বিভিন্ন যৌগ হিসেবে পুকুরের তলানিতে রূপান্তরিত হয় (চিত্র ১)। গবেষণার ফলাফল ও বিভিন্ন সূত্র থেকে হিসেব করে দেখা যায়, এক হেক্টর পুকুরে জমাকৃত মোট নাইট্রোজেনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০৩১ কেজি যা ৮৭৬৩ কেজি ইউরিয়ার সমতূল্য (সারণি ১)।

এ তলানির জৈবিক পদার্থের উপর অনুজীবের কর্মকাণ্ড ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। এতে করে পুকুরের পানিতে অক্সিজেন ঘাটতির সাথে সাথে অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি হয়। ফলে মাছের উপর পীড়ন (stress) সৃষ্টি হয়, মাছের বৃদ্ধি কমে যায়, মাছ রোগাক্রান্ত হয়, পরিণামে মাছ মরে চাষির আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়।

এ তলানি চাষিরা নিয়মিতভাবে পুকুর হতে সরাতে পারেনা কারণ তলানি ফেলার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার অভাব ও এতে শ্রমিক খরচও অত্যন্ত বেশি লাগে। এজন্য জমাকৃত তলানি পুকুরের পরিবেশ ও মাছের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদনশীলতার জন্য এক ধরনের বাধা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

সারণী ১: হেক্টরপ্রতি পাঙ্গাসের পুকুরের তলানিতে জমাকৃত মোট নাইট্রোজেন ও ইউরিয়ার পরিমাণ

প্রতি ২ কেজি খাদ্যে হারানো নাইট্রোজেনের পরিমাণ	৬৭.২ গ্রাম
প্রতি বর্গমিটারে (১২ কেজি খাদ্য হিসেবে) জমাকৃত নাইট্রোজেনের পরিমাণ	৬৭.২ X ৬ = ৪০৩.২ গ্রাম
প্রতি শতাংশে জমাকৃত নাইট্রোজেনের পরিমাণ	৪০৩.২ X ৪০.৪৮ = ১৬৩২১.৫৪ গ্রাম
প্রতি হেক্টরে জমাকৃত নাইট্রোজেনের পরিমাণ	(১৬,৩২১.৫৪ X ২৪৭)/১০০০ = ৪০৩১.৪২ কেজি
ইউরিয়াতে ৪৬% নাইট্রোজেন থাকে, সে হিসেবে ৪০৩১.৪২ কেজি নাইট্রোজেন পেতে হলে ইউরিয়ার পরিমাণ দাঁড়ায়	৮৭৬৩.৯৬ কেজি
৮৭৬৩.৯৬ কেজি ইউরিয়া সারের বর্তমান বাজার মূল্য	৮৭৬৩.৯৬ X ২০ = ১,৭৫,২৭৯.২০ টাকা

পাঙ্গাসের পুকুরের তলানি বিশ্লেষণ ও ব্যাগে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ পরীক্ষণ

তলানি সরানোর এ সমস্যা সমাধানের জন্য এর উৎপাদনশীল ব্যবহারের নিমিত্ত সুইডেনভিত্তিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর সাইন্স (আইএফএস) এর সহায়তায় বিল্ডিংয়ের ছাদে ব্যাগে পাঙ্গাসের পুকুরের শুকনো তলানি ভর্তি করে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ প্রক্রিয়া পরীক্ষণ করা হয়। ব্যাগে কম্পোস্ট সার ব্যবহার করে সবজি চাষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত রয়েছে। ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে কম্পোস্ট সার ভর্তি ব্যাগ, সবজি চাষের জন্য বাজারে বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি হয়। বাড়ির ছাদের উপরে ব্যাগে সবজি চাষ করে ভাল ফল পাওয়া যায়।

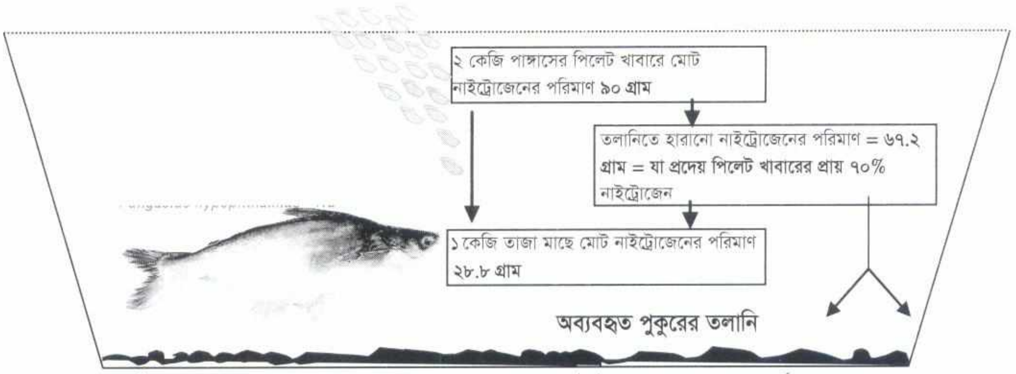

চিত্র ১: পাঙ্গাস চাষে প্রদেয় খাদ্য হতে পুকুরের তলায় নাইট্রোজেন জমা হওয়ার বর্তমান অবস্থা

গবেষণার শুরুতে পাঙ্গাসের পুকুরের তলানি ময়মনসিংহের ত্রিশালের ধানীখোলা গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা হয়। এরপর তলানিকে ছায়াময় ও শুষ্ক স্থানে শুকানো হয়। শুকনো তলানি ব্যাগে ভর্তি করে ব্যাগ পদ্ধতিতে সবজি চাষের জন্য বস্তায় তিন ধরণের ট্রিটমেন্ট (তিনটি করে রেপ্লিকেশনসহ) ব্যবহার করা হয়। প্রথমটিতে ব্যাগপ্রতি ১০০% পাঙ্গাসের পুকুরের তলানি (ট্রিটমেন্ট-১), দ্বিতীয়টিতে ৫০% তলানি ও ৫০% সাধারণ মাটি (ট্রিটমেন্ট-২), এবং তৃতীয়টিতে ৬০% সাধারণ মাটি, ৪০% গোবর, ৫০ গ্রাম টিএসপি ও ৫০ গ্রাম এমপি সার (ট্রিটমেন্ট-৩) ব্যবহার করা হয়। ব্যাগে ভর্তিকৃত শুকনো তলানির নমুনা নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের মৃত্তিকা গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করা হয়। বিশ্লেষণে তলানিতে ০.৩০% নাইট্রোজেন ও ৩.১৫% জৈবিক কার্বন পাওয়া যায়। তাছাড়া শুকনো তলানিতে অন্যান্য পুষ্টি যেমন ফসফরাস ও পটাসিয়ামের উপস্থিতিও ছিল সন্তোষজনক (সারণি ২)। পরীক্ষায় প্রতীয়মান হয় পাঙ্গাসের পুকুরের শুকনো তলানি সরাসরি কম্পোস্ট হিসেবে ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের ফসল ফলানো সম্ভব। পাঙ্গাসের পুকুরের তলানির নাইট্রোজেনের পরিমাণ (০.৩০%) সাধারণ কার্প মিশ্রচাষের পুকুরের তলানির নাইট্রোজেনের পরিমাণের (০.১৪%) দ্বিগুণ। অধিকন্তু পাঙ্গাসের পুকুরের তলানিতে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে তার পরিমাণ প্রচলিত গবাদিপশুর গোবর ও ফসলের উচ্ছিষ্ট দিয়ে তৈরি কম্পোস্টের নাইট্রোজেনের (০.৪-০.৫%) কাছাকাছি। এ ধরনের কম্পোস্ট তৈরি করতে অতিরিক্ত অবকাঠামো, জায়গা, কাঁচামাল, শ্রমিক ও সময়ের প্রয়োজন হয়।

ব্যাগ গার্ডেনিং পদ্ধতিতে পরীক্ষামূলক সবজি হিসেবে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর জাত বারি-১৪ ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি ব্যাগে দুটি করে টমেটোর চারা রোপণ করা হয়। চারা রোপণের ১৮ দিনের মধ্যে গাছে ফুল আসে এবং টমেটো ধরা শুরু করে। প্রতিটি চারার গড় বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল অত্যন্ত সন্তোষজনক এবং ১০০% পাঙ্গাসের তলানির ব্যাগে গাছের বৃদ্ধি ছিল অত্যন্ত দ্রুত। তুলনামূলকভাবে তিনটি ট্রিটমেন্টের মধ্যে পাঙ্গাসের পুকুরের তলানিতে টমেটো গাছের বৃদ্ধি ছিল বেশি এবং ফলও ধরে সবার আগে। কিন্তু ১০০% পাঙ্গাসের পুকুরের তলানির ব্যাগে ও ৫০% পাঙ্গাসের পুকুরের তলানি এবং ৫০% সাধারণ মাটির ব্যাগের গাছের বৃদ্ধির মধ্যে কোন তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য ছিল

সারণি ২ঃ শুকনো পাঙ্গাসের পুকুরের তলানির রাসায়নিক ও ভৌতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

বৈশিষ্ট্যসমূহ	ট্রিটমেন্টসমূহ		
	ট্রিটমেন্ট-১	ট্রিটমেন্ট-২	ট্রিটমেন্ট-৩
পিএইচ	৬.৮৬±০.০৪	৬.৮৬±০.০৩	৭.১৪±০.০২
জৈবিক কার্বন (%)	৩.১৫±০.০৪	১.৫৬±০.০৫	৪.১৫±০.০৭
মোট নাইট্রোজেন (%)	০.৩০±০.০০	০.১৪±০.০০	০.৩৬±০.০১
সহজলভ্য ফসফরাস (পিপিএম)	১১৫.৬৩±০.৬৮	১০২.৩৩±১.০৩	১৫৬.৬৬±১.০৩
বিনিময়যোগ্য- পটাসিয়াম (পিপিএম)	১০৬.৮৩±৪.৩১	৬৫.৪৮±৩.১৬	৪০২.৫৩±৬.৩১
সহজলভ্য সালফার (পিপিএম)	৮৬.০৬±০.৬৬	৫১.২৯±০.৪৩	৩১.১৭±০.৬৬
বালি (%)	২৫.৭১±০.৫৮	২৭.৭১±০.৫৮	৩৬.৩৭±০.৫৮
সিল্ট (%)	৬৬.০০±০.০০	৬২.০০±০.০০	৪৬.০০±০.০০
ক্লে (%)	৮.২৯±০.৫৮	১০.২৯±০.৫৮	১৭.৬৩±০.৫৮
গঠনবিন্যাস	কাদা দোআঁশ	কাদা দোআঁশ	দোআঁশ

টমেটোর চারা রোপণ - ৬ মার্চ ২০১১

গাছে ফুল আসে- ২৪ মার্চ ২০১১

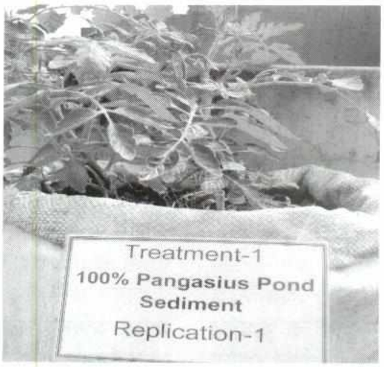

টমেটো আহরণ- ১৫ মে ২০১১

চিত্র ২: ব্যাগে টমেটো উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপসমূহ

না। এর মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সাধারণ মাটির সাথে পাঙ্গাসের পুকুরের তলানি ব্যবহার করে মাটির উর্বরতা সহজেই বাড়ানো যায় এবং পরিবহন খরচ অর্ধেকে নামিয়ে আনা সম্ভব। গবেষণার এক মাসের মাথায় টমেটো গাছে রোগ দেখা যায়। রোগ নিরাময়ের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ গ্রাম রোভরাল দ্রবীভূত করে টমেটো গাছে স্প্রে করা হয়। নিয়মিত টমেটো আহরণ শেষে হিসেব করে দেখা যায় পাঙ্গাসের পুকুরের তলানি ব্যবহার করে ব্যাগ-প্রতি গড়ে প্রায় ৩ কেজি টমেটো উৎপাদিত হয়েছে। তিন কেজি গ্রীষ্মকালীন টমেটোর বাজার মূল্য শীতকালীন টমেটোর চেয়ে অনেক বেশি হবে এবং এতে শুধুমাত্র ব্যাগ ক্রয়ের জন্য ৫ টাকা খরচ হয়েছে।

ব্যাগের আকৃতি নিরূপণ ও এর বিপণন

এ গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এটা বলা যায় যে পাঙ্গাসের পুকুরের তলানির ব্যাগ সবজি চাষের জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বিপণন করা যেতে পারে। ব্যাগের আকার ও আকৃতি সহজে পরিবহন বা হ্যান্ডেলিং করার উপযোগী হতে হবে। এজন্য ব্যাগের আকার ছোট করে আনুভূমিকভাবে ছাদে স্থাপন করা হয় এবং প্রতি ব্যাগে ৩ টি করে চারা রোপণ করা হয়। এতে দেখা যায় একটি চারার বৃদ্ধি ভাল হয় এবং অন্য দুটির বৃদ্ধি ততটা সন্তোষজনক হয়নি। কিন্তু একটি চারার ফলন ছিল অত্যন্ত আশাপ্রদ। সমন্বিত অ্যাকোয়াকালচার-হর্টিকালচার পদ্ধতিতে ব্যাগ গার্ডেনিং এর এরকম উন্নয়মুখী সম্ভাবনা উপলব্ধি করে এর একটি ব্র্যান্ড তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। যাকে ইতোমধ্যে BAU BIO-BAG নামে নামকরণ করা হয়েছে। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক কোন গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে পাঙ্গাসের তলানি ব্যবহার করে ব্যাগ গার্ডেনিংকে আরো ব্যাপক গবেষণার আওতায় এনে বৃহত্তর পরিসরে সম্প্রসারণের কাজ চলছে। ইতোমধ্যেই কিছু এনজিও BAU BIO-BAG সম্প্রসারণ কাজে আগ্রহ প্রকাশ করছে।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বাড়তি বসতি ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কারণে এ দেশ বছরে প্রায় ৮০,০০০ হেক্টর ফসলি জমি হারাচ্ছে। ফলে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি পৃথিবীর স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মত বাংলাদেশেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ কারণে খাদ্য উৎপাদনের জন্য সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদ ও অব্যবহৃত জায়গা বা জমির ব্যবহারের বিকল্প উপায় খুঁজে বের করতে হবে। সম্ভাব্য বিকল্পগুলোর মধ্যে পাঙ্গাসের পুকুরের তলানি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাগ গার্ডেনিং করে সবজি উৎপাদন হতে পারে একটি লাগসই প্রযুক্তি। এ পদ্ধতির সম্ভাব্যতা দেখে বিশিষ্ট মাৎস্য বিজ্ঞানীগণ পাঙ্গাসের পুকুরের তলানিকে কৃষি ক্ষেত্রে সারের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন খরচ বহুলাংশে কমানো, উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং পুকুরের স্বাস্থ্য বা লিমনোলজিক্যাল পরিবেশ উন্নত করা চাষিদের জন্য একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেন। যুক্তরাজ্যের স্টার্লিং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমন্বিত মাৎস্যচাষ বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. ডেভিড লিটিল পাঙ্গাসের পুকুরকে 'জৈব সার কারখানা' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। পাঙ্গাসের পুকুরের তলানি ব্যবহার করে ব্যাগ গার্ডেনিং করে শুধু টমেটোই নয় আরো অন্যান্য সবজি ফলানো সম্ভব এবং এর সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ হতে পারে:

১. পাঙ্গাসের পুকুর শুকিয়ে প্রতি ২-৩ বছর অন্তর অন্তর ৩-৬ ইঞ্চি পুরু পরিমাণ তলানি কাদা আকারে উত্তোলন করা সম্ভব।
২. পুকুরের তলানি শুকিয়ে অল্প খরচে ব্যাগ কিনে তাতে তলানি ভর্তি করে বিভিন্ন সবজির চারা রোপণ করে একে বাণিজ্যিকভাবে বিপণন করা যেতে পারে। এ কাজে পাঙ্গাস চাষ এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্র মহিলারা সহজেই অংশগ্রহণ করে তাদের জীবন-জীবিকা উন্নয়নে স্বাবলম্বী হতে পারে।
৩. শহর বা উপশহরে বসবাসরত জনগোষ্ঠী এ পদ্ধতি ব্যবহার করে বাড়ির ছাদে বা আঙ্গিনায় টমেটো ও অন্যান্য সবজি চাষ করে পরিবারের পুষ্টি চাহিদা সহজেই মেটাতে পারে।
৪. সমন্বিত মাছচাষ-কৃষিতে ইউরিয়া সারের খরচ একেবারে শূন্যে আনা সম্ভব।
৫. অজৈব সার তৈরি ও পরিবহনে প্রচুর পরিমাণে অনবায়নযোগ্য খনিজ পদার্থ সাশ্রয়ের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের তীব্রতা কিছুটা হলেও কমানো সম্ভব।

সহযোগী অধ্যাপক, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ব্যবস্থাপনায় ভিটিএমএস প্রযুক্তির ব্যবহার

এবিএম আনোয়ারুল ইসলাম[১], মোঃ শফিকুল ইসলাম[২] ও মোঃ আতিয়ার রহমান[৩]

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও জনগোষ্ঠীর আমিষ চাহিদায় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উল্লেখযোগ্য যোগান ও অবদান রয়েছে। আদিকাল থেকেই নানা ধরনের দেশীয় নৌকা ও সনাতনী জাল-সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে উপকূলীয় অঞ্চল ও সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ করা হলেও বিগত চার-পাঁচ দশক ধরে কাঠের তৈরি যান্ত্রিক নৌযান ও বৃহদাকারের অত্যাধুনিক ট্রলার বহর দিয়ে মাছ ধরা হচ্ছে। অন্যদিকে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও উপকূলীয় এলাকায় 'ঘের' বা খামারে চাষ করার জন্য প্রাকৃতিক উৎস থেকে বাগদা চিংড়ির পোনা আহরণ অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে অন্যান্য চিংড়ি, মাছ ও জলজ প্রাণিবৈচিত্র্যের ওপর হুমকির সৃষ্টি হয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত আহরণের কারণে প্রায় ৪৭৫ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ ও ৩৫৬ প্রজাতির চিংড়িসহ সম্ভাবনাময় এ প্রাকৃতিক জলজসম্পদ ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে। 'আইনবহির্ভূত মৎস্য আহরণ'(illegal fishing) সামুদ্রিক প্রতিবেশকে নষ্ট করে দেয়। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো থেকেও বেআইনী, নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত ও গোচরবিহীন (Illegal, Unregulated & Unreported-IUU Fishing) মৎস্য আহরণ বন্ধ করার তাগিদ দেয়া হচ্ছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের যুক্তিসঙ্গত আহরণের জন্য আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিনির্ভর পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থার (Monitoring, Control and Surveillance-MCS) প্রবর্তন আবশ্যক। 'ভিশন-২০২১, বাংলাদেশ ঃ সমৃদ্ধ আগামী' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় ভিটিএমএস (Vessel Tracking Monitoring System-VTMS) প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এমসিএস কর্মকাণ্ড জোরদারকরণ এবং জলযান নিবন্ধন ও মাছ ধরার অনুমতি প্রদানে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রত্যয় রয়েছে। পাশাপাশি সমুদ্রগামী নৌযানে কর্মরত মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নিমিত্ত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন ও সার্বিকভাবে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় স্যাটেলাইট প্রযুক্তির ব্যবহার কার্যকর করা যাবে।

এমসিএস কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন বছরে ৫.১৭ লক্ষ মে. টন যা মোট মৎস্য আহরণের প্রায় ১৮%। আবার সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনের ৭% আসে আধুনিক ট্রলার বহর থেকে ও বাকি ৯৩% আহরিত হয় দেশীয় অযান্ত্রিক/যান্ত্রিক নৌযানের মাধ্যমে। সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে ১৭৪টি ট্রলার ও প্রায় ৪৪,০০০টি দেশীয় নৌযান নিয়োজিত রয়েছে; জাল-সরঞ্জামাদির সংখ্যাও প্রায় ১,২৩,০০০টি। মৎস্য আহরণে বিভিন্ন ক্ষতিকর জাল-সরঞ্জামাদি যেমন- কারেন্ট জাল, ছোট ফাঁসের ফাঁস জাল, বেহুন্দি জাল, ঘের জাল, বিষ প্রয়োগ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার ট্রলার বহরেও জালের শেষ প্রান্তে ফাঁসের আকার আইনানুগভাবে যথাযথ না রাখা, বঙ্গোপসাগরে ৪০ মিটারের কম গভীরতায় ও ঘোষিত 'মেরিন রিজার্ভ (Marine Reserve)'-এ মৎস্য শিকার ইত্যাদি কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ। মৎস্য শিকারের উদ্দেশ্যে বন্দর ত্যাগ করার পর বাণিজ্যিক ট্রলার বহর সমুদ্রে কখন কোথায় অবস্থান করে তা সরেজমিনে দেখার বা জানার কোন ব্যবস্থা মৎস্য অধিদপ্তরের নেই। চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় দেশের একমাত্র 'সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট' রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর, নৌবাণিজ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, নৌবাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের জনবল, অর্থবল ও প্রযুক্তিগত সামর্থ্যের স্বল্পতার কারণে স্থলে বা সমুদ্রসীমায় টহল পরিচালনা বা তদারকি যথেষ্ট নয়। আকাশপথে তদারকির কোন ব্যবস্থা নেই।

বর্তমানে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরে বাণিজ্যিক ট্রলারবহর কর্তৃক সরবরাহকৃত 'আহরণ তথ্য' ও আনুষঙ্গিক উপাত্ত থেকে সামুদ্রিক মৎস্যের বার্ষিক উৎপাদন নির্ণয় করা হয়ে থাকে। 'বহু-প্রজাতি ও বহু-মাত্রিক আহরণ পদ্ধতি'র সামুদ্রিক তথা উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরণের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জটিল। বর্তমানে 'বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প' এর মাধ্যমে একটি অত্যাধুনিক ও বহুমুখী মৎস্য জরিপ ও গবেষণা জাহাজ ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান আছে। আগামী ২০১২ সালে উক্ত জাহাজ তৈরি হবে এবং এটি দিয়ে পরবর্তী অন্তত দুই দশক আমাদের সমুদ্রসীমায় প্রয়োজনীয় জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণ সহজতর হবে।

ভেসেল ট্র্যাকিং মনিটরিং সিস্টেম (ভিটিএমএস)

বাংলাদেশে প্রথমবারের মত 'বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প'-এর মাধ্যমে চট্টগ্রামের পতেঙ্গাস্থ মেরিন ফিসারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্টে স্থাপিতব্য 'নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র' থেকে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় মাছ ধরায় নিয়োজিত ট্রলারবহর/মৎস্য নৌযানের গতিবিধি সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত অত্যাধুনিক স্যাটেলাইট প্রযুক্তিনির্ভর ভেসেল ট্র্যাকিং মনিটরিং সিস্টেম বা ভিটিএমএস পদ্ধতি সংযোজনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এতে পর্যায়ক্রমে ট্রলার বহর ও অন্যান্য যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান সহযোগে মৎস্য আইন অনুযায়ী অনুমতিপ্রাপ্ত নির্ধারিত এলাকায় ও নির্দিষ্ট সময়ে মৎস্য আহরণ করাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাৎক্ষণিক তথ্য সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে।

ভেসেল ট্র্যাকিং মনিটরিং সিস্টেম (ভিটিএমএস) এক ধরনের নৌযান পরিবীক্ষণ পদ্ধতি (Vessel Monitoring System) যে পদ্ধতিতে মাছ ধরায় নিয়োজিত ট্রলারবহর/মৎস্য

নৌযানের গতিবিধি তাৎক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় ও রেকর্ড করা যায়। এ পদ্ধতিটি বাংলাদেশের মৎস্য ব্যবস্থাপনায় সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন। সমুদ্রে মৎস্য নৌযানসমুহের অবস্থান স্বয়ংক্রিয়ভাবে চিহ্নিত (plot) করার উপযোগী নৌযান পরিবীক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার সারা বিশ্বেই দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নৌযানসমূহে আধুনিক স্যাটেলাইট যোগাযোগের যন্ত্রপাতি ও Global Positioning System (GPS)-এর যন্ত্রপাতি বসানো হয় যেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে। পূর্ব-নির্ধারিত 'বিরতি' বজায় রেখে নৌযানের অবস্থান, দিক, গতি, গতিবিধি ও পরিচিতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশেষ 'বার্তা' মারফত কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কেন্দ্রে বা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে স্থাপিত পর্দায় (monitor) প্রতিফলিত হয়ে থাকে। তবে শুধু লাইসেন্সকৃত নৌযানসমূহ যেগুলোতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (যেমন-compliant) বসানো রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে VMS উপযোগী। সমুদ্রে সরাসরি নজরদারি করার সময় রাডার ও অন্যান্য 'নৌযান চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি'র (vessel detection system) দ্বারা লাইসেন্সবিহীন অবৈধ মৎস্য আহরণকারী নৌযানগুলোকে চিহ্নিতকরণের ও বৈধ নৌযানসমূহের দলিলপত্র ও মেয়াদ পরীক্ষার ক্ষেত্রে VMS-এর উপযোগিতা রয়েছে।

সমুদ্রে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত নৌযানসমূহে যে সব যন্ত্রপাতি বসাতে হয় সেগুলোকে কখনো 'ভিএমএস' আবার কখনোবা 'এএলসি (automatic location communicators)' বলা হয়। এগুলোতে নিদেনপক্ষে একটি জিপিএস এ্যান্টেনা ও রিসিভার, একটি কম্পিউটার এবং ঐ নৌযান হতে স্থলভাগে অবস্থিত কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেলের সাথে যোগাযোগের জন্য উপযুক্ত একটি ট্রান্সমিটার ও এ্যান্টিনা বসানো থাকে। বিভিন্ন ধরনের ভিএমএস সফটওয়ার ও যন্ত্রপাতি রয়েছে যা দিয়ে 'ভ্যাসেল ট্র্যাফিক ভিওয়ার'-এর ইলেকট্রনিক চার্টে নৌযানের অবস্থান দৃশ্যমান করা যায়।

ভিএমএস ইউনিটগুলো প্রধানত জিপিএস-এর মাধ্যমে নৌযানটির অবস্থান ও সময়ের তথ্যাদি প্রেরণ (rely) করে। কিছু ব্যাক-আপ প্রযুক্তি রয়েছে (যেমন- LORAN), যেগুলো স্যাটেলাইট (যেমন- Inmarsat, Iridium, Argos, ORBCOMM বা Qualcomn) সিস্টেমগুলোকে ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেলে অবস্থিত মনিটরিং সিস্টেমে পাঠিয়ে দেয়। কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেন্টারে রক্ষিত রিসিভার সিস্টেমের সফটওয়ারএর মাধ্যমে সমুদ্রে অবস্থানগত নৌযানটির অবস্থান, সময়, গতি ও গতিবিধি সরাসরি ভিএমএস/এএলসি হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে নির্ণয় করা যায়। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের মনিটরিং সেন্টারগুলোতে বিভিন্ন মাত্রার বুদ্ধিবৃত্তিক সফটওয়ার (software intelligence) রয়েছে যেগুলো মৎস্য ব্যবস্থাপনা, আইনের প্রয়োগ এবং সমুদ্রে নৌযান ও নাবিকদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য 'অনুসন্ধান ও উদ্ধার (search and rescue)' কার্যক্রমের স্বার্থে কাজে লাগানো যায়।

প্রধানত স্বয়ংক্রিয়ভাবে নৌযানের অবস্থান, ক্যাচ রিপোর্ট ও ইফোর্ট ডেটা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মৎস্য ব্যবস্থাপনায় উপকারী আনুষঙ্গিক তথ্যসমূহ প্রেরণের জন্য VMS প্রোগ্রাম প্রস্তুত করা হয়। ইলেকট্রনিক ফিসিং লগবই-এর ব্যবহার Catch statistics-এর জন্য সহজ এবং নৌযানে নাবিকদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে Catch Data লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় যা দিয়ে আপনাআপনি VMS রিপোর্টের সাথে সত্যিকার ও চলতি উপাত্ত দেওয়া যায়। লগ বইয়ের একটি মানসম্পন্ন ও আদর্শ ছক (standard format) ব্যবহার করা হলে তা 'কম্পিউটার সফটওয়ার' ব্যবহারের মাধ্যমে এক ভাষা থেকে বিভিন্ন ভাষায় সহজে অনুবাদযোগ্য হয় এবং মৎস্যবিষয়ক পরিদর্শকসহ সংশ্লিষ্টরা তা বুঝতে সক্ষম হন।

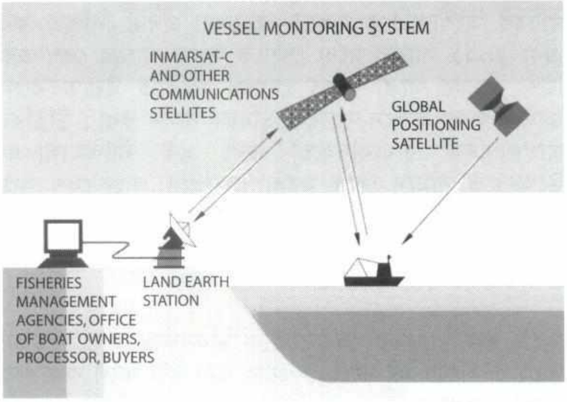

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ কর্তৃক পতাকারাষ্ট্রের (flag state) নিজস্ব জাতীয় জলসীমায় ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় UNCLOS সনদ অনুসারে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র বা সংস্থার সাথে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য তাদের নৌযানসমূহের কার্যাবলী সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করা; IUU নিয়ন্ত্রণ করার জন্য VMS-কে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল (Tools) হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং মৎস্য সম্পদের মালিকানা প্রদানের ক্ষেত্রে এটিকে শর্ত হিসেবে রাখার জন্য পতাকা-রাষ্ট্রসমূহকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এমতাবস্থায়, 'বাংলাদেশ মেরিন ফিসারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প'-এর আওতায় VTMS স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় মৎস্য সম্পদ আহরণের জন্য সমন্বিত ও আধুনিক এমসিএস পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা গেলে সরকার কর্তৃক গৃহীত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার স্বপ্ন সফল হবে।

১. জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর
২. সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর
৩. সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্যখাতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

মনিষ কুমার মণ্ডল

'দ্রুততার সাথে মানসম্পন্ন সেবা জনগণের দোরগোড়ায়'- বর্তমান সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার। বাংলাদেশের সংবিধান এর অনুচ্ছেদ ১৯ অনুসারে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা, মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বিলোপ করা, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করার সুস্পষ্ট নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার আইসিটি (ICT) নীতিমালা ২০০৯ প্রণয়ন করেছেন। এ নীতিমালার উদ্দেশ্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে একটা স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিতামূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করা, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত করা, সামাজিক ন্যায়পরায়নতা বৃদ্ধি করা, সরকারি-বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বে সুলভে জনসেবা প্রদান নিশ্চিত করা এবং ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ত্রিশ বছরের মধ্যে উন্নত দেশের সারিতে উন্নীতকরণের জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। উল্লিখিত সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং এই নীতিমালা-এর উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে। কাজটি বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্প মৎস্য অধিদপ্তরকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে।

মূলত মৎস্য খাতের সেবাসমূহকে মানসম্পন্ন এবং দ্রুততার সাথে জনগণের খুব কাছে নেওয়ার জন্য ৪টি ধাপে কাজ করা হচ্ছে। প্রথমত মৎস্য দপ্তরের সেবাসমূহ নির্বাচন করা, দ্বিতীয়ত সেবাসমূহের তথ্য সংগ্রহ যেমন- সেবার ধরন, কোনো ধরনের জনগণ সেবাটি পেতে আগ্রহী, সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কতটি বিভাগ জড়িত, সেবা প্রদানকারী ইত্যাদি, তৃতীয়ত সেবাসমূহের সেবামূল্য পর্যালোচনা। এক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য বিভাগের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কতটা ব্যয় নিয়ন্ত্রণ সম্ভব, সেবাটি মৎস্য বিভাগ কতটা জনগণের কাছে নিয়ে যেতে পারবে, সেবাটি কতটা সহজলভ্য হবে, সেবাটি পেতে জনগণের কতটা সময় বাঁচবে এবং সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে বহুমুখী দ্বার উন্মুক্ত করা যাবে কি-না। চতুর্থত সেবাসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত, সেবাটির ব্যাপকতা ও জনগণের অধিক প্রয়োজনীয়তা এবং সেবাটি প্রদানে জটিলতা কমানো সম্ভব কি-না, বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা হয়েছে। উক্ত ৪টি কাজ সুসম্পন্ন করা হলে মৎস্য অধিদপ্তরে অটোমেশন প্রক্রিয়া যেমন এক ধাপ এগিয়ে যাবে, বিজনেস প্রসেস-এ আসবে আমূল পরিবর্তন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে রাখতে পারবে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা।

ইতোমধ্যে এ রোডম্যাপের অংশ হিসেবে মৎস্য অধিদপ্তরে স্থাপন করা হয়েছে আইসিটি শাখা, নির্মাণ করা হয়েছে তথ্য বহুল ওয়েবসাইট, যা থেকে যে কেউ, যে কোনো সময়, দেশের যে কোনো প্রান্তে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ সংক্রান্ত চিত্র, মৎস্য দপ্তরের কার্যাবলী, মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান, মাছের রোগবালাই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাসহ বাংলাদেশে ব্যবহারযোগ্য মৎস্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে পারেন। তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের কাছে মৎস্য দপ্তরের সেবা পৌঁছে দেবার জন্য এক্সেস টু ইনফরমেশন (এ টু আই) প্রকল্পের আওতায় পাইলট ভিত্তিতে দশটি গ্রামে এবং দশটি উপজেলা সদর দপ্তরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মৎস্য তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এফআইসিসি)। এ টু আই প্রকল্পের আওতায় দশজন উদ্যোক্তাকে বিনামূল্যে কম্পিউটার সামগ্রী (ডেস্কটপ কম্পিউটার, ডিজিটাল ক্যামেরা, মোবাইল ফোন, স্ক্যানার, ওয়্যারলেস মডেম, প্রিন্টার, ওয়েব ক্যামেরা, জেনারেটর, চেয়ার, টেবিল, আলমিরা, বাই-সাইকেল) প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র যেমন গ্রামীণ জনগণের কাছে মৎস্যখাতের তথ্য এবং সেবাকে সহজলভ্য করেছে, তেমনি উদ্যোক্তা সৃষ্টি করতে পেরেছে তাঁর কর্মসংস্থান। মৎস্য অধিদপ্তরীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য তৈরি করা হচ্ছে ডেটাবেজ যা অধিদপ্তরের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এছাড়া বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদের ডিজিটাল ডেটা প্রস্তুতের প্রক্রিয়া অধিদপ্তরের বিবেচনাধীন আছে।

মৎস্য অধিদপ্তরে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেবাসমূহের উৎকর্ষ বিধান প্রাথমিক পর্যায়ে, মৎস্য অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং আন্তরিকতায় খণ্ডিত সাফল্যও অর্জিত হয়েছে। তবে এ রোডম্যাপের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন অব্যাহত প্রচেষ্টা এবং সকল বিভাগের পারস্পরিক সহযোগিতা। একটা স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিতামূলক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মৎস্য অধিদপ্তরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এ রোডম্যাপের কোনো বিকল্প নেই। দক্ষ জনশক্তির অভাব, অপ্রতুল অবকাঠামো এবং অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা রোডম্যাপ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে আসবে। তবে এক্ষেত্রে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (PPP) এবং Business Process-এর পরিবর্তন হতে পারে প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের বিকল্প ব্যবস্থা। সর্বোপরি মৎস্য অধিদপ্তরের অটোমেশন প্রক্রিয়া শুধুমাত্র অধিদপ্তরটির বিষয় নয় অথবা এককভাবে বাস্তবায়নও সম্ভব নয়, কারণ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হয়। সম্পৃক্ত সকল বিভাগের সহযোগিতা এবং পারস্পরিক উত্তরণ অব্যাহত সাফল্য অর্জনের পথে মূল চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করবে।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণে এনএটিপি কার্যক্রম ও ফলাফল

মোঃ গোলজার হোসেন[১], খ. মাহবুবুল হক[২] ও এ কে এম আমিনুল্লাহ ভূঞা[৩]

মৎস্য উৎপাদনে আহরিত এবং চাষকৃত এ দু'টি ক্ষেত্রের মধ্যে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (এনএটিপি), (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)-এর বিচরণ মূলত চাষকৃত মৎস্য ক্ষেত্রে। চাষ করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করাই এ ক্ষেত্রের একমাত্র উপজীব্য বিষয়। মৎস্যচাষে চাষির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন মৎস্যচাষ প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তির চাহিদা মাফিক উপকরণাদি সরবরাহ নিশ্চিত করা। বাংলাদেশে চাষযোগ্য জলাশয়ের পরিমাণ কেবল বিশালই নয়, বিভিন্ন প্রকারেরও। চাষযোগ্য বিভিন্ন প্রকার জলাশয়ের জন্য বিভিন্ন আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে চাষিদের উপযোগী লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন যেমন বিজ্ঞানী/গবেষকদের জন্য চ্যালেঞ্জের বিষয়, তেমন উদ্ভাবিত বা আবিষ্কৃত লাগসই প্রযুক্তি যথাযথভাবে কাঙ্ক্ষিত চাষিদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া অর্থাৎ কার্যকরভাবে প্রযুক্তি হস্তান্তর আর একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। শেষোক্ত এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এনএটিপি ২০০৮ সাল থেকে দেশের ২৫টি জেলার ১২০টি উপজেলায় কাজ করে আসছে।

সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ

এনএটিপির মৎস্যচাষ প্রযুক্তির সার্বিক সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ায় এতদুদ্দেশ্যে গৃহীত কার্যাবলীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকরণ একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। সনাতন প্রক্রিয়ায় এটি সাধারণত Top to Bottom অর্থাৎ সম্প্রসারণ বা প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের দেওয়া প্রক্রিয়ায় সম্প্রসারণের কাজটি চলে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, প্রক্রিয়াটি কিছুটা দ্রুতগতিসম্পন্ন হলেও এর মূল উদ্দেশ্যটি অর্থাৎ মাঠ পর্যায়ের চাষিদের চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি বিষয় এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নির্ধারিত হয় না। ফলে প্রযুক্তি যথেষ্ট লাগসই না হওয়া এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের অসম্পৃক্ততার কারণে আশানুরূপ ফলোদয় হয় না। এ দু'টি কারণে বিদ্যমান সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া কাঙ্ক্ষিত ফললাভে সফল হয় না। তদুপরি, মাঠ পর্যায়ের চাষিদের অসম্পৃক্ততার কারণে প্রক্রিয়াটি টেকসইও হয় না।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সম্প্রসারণ বিশেষজ্ঞগণ Top-Down দৃষ্টিভঙ্গির উল্টোটি নিয়ে ভেবেছেন। অর্থাৎ মাঠ পর্যায়ে চাহিদার (প্রযুক্তি এবং সম্প্রসারণ প্রক্রিয়াগত) ভিত্তিতে সম্প্রসারণের প্রাথমিক রূপরেখা দাঁড় করানো এবং কেবল সেটিই (Bottom up approach) জাতীয় ভিত্তিতে রূপান্তরিত করা। এ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণ তাদের আর্থসামাজিক, প্রযুক্তিগত বিবেচনা এবং স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে নিজেদের চাহিদার রূপরেখা তৈরি করবেন। সরকার সে রূপরেখা রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে এনে একে কাঠামোগত এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আর্থিক ও প্রায়োগিক সহায়তা দেবেন। এ উপলব্ধির বাস্তবরূপ পুরো সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ। গ্রাম থেকে আরম্ভ করে ইউনিয়ন, জেলা ইত্যাদির প্রতিটি পর্যায়ে একীভূত হয়ে জাতীয়ভাবে সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলবে। এনএটিপি এ উপলব্ধির তাত্ত্বিক রূপটিকে ব্যবহারিক রূপ দেয়ার প্রয়াস পেয়েছে। সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে এনএটিপি পদ্ধতির ব্যবহারিক রূপটি নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হলো:

১. সাংগঠনিক

সাংগঠনিক কার্যক্রম আরম্ভ হয় একেবারে গ্রাম পর্যায় থেকে, CIG (Common Interest Group) ও PO (Producer Organization) গঠনের মাধ্যমে। এখানে প্রতিটি ইউনিয়নে গ্রামভিত্তিক দু'টি মৎস্য সিআইজি গঠন করা হয়। প্রতিটি সিআইজিতে আগ্রহী এবং একই স্বার্থসংশ্লিষ্ট ১৫ জন নারী-পুরুষ সমন্বিত দল গঠন করা হয়। সিআইজি'র স্বার্থ রক্ষায় ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সিআইজি'র সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদ নিয়োজিত আছে। দলগত ভিত্তিতে সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করে সিআইজিদের নিয়ে পরবর্তীতে PO (Producer Organization) গঠন করা হয় যা ক্রমান্বয়ে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠে। উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সফল বাজারজাত করার ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার উদ্দেশ্যে PO-কে উপযোগী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

২. প্রযুক্তি সম্প্রসারণ

এ ব্যাপকভিত্তিক কাজটি সম্পাদিত হয় নিম্নোক্ত বিবিধ কার্যাবলীর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে:

ক. জনবল গঠন
খ. প্রযুক্তি নির্বাচন
গ. প্রশিক্ষণ
ঘ. ইউনিয়ন মাইক্রো-এক্সটেনসন প্লান প্রণয়ন
ঙ. উন্নত মৎস্যচাষ প্রযুক্তি প্রদর্শনী
চ. মাঠ দিবস পালন
ছ. প্রকাশনা
জ. মেলা বাস্তবায়ন
ঝ. অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর
ঞ. ফিয়াক স্থাপন ও পরিচালনা

অগ্রগতি

বর্তমানে প্রকল্পের প্রথম ফেইজের (২০০৭-২০১২ সন) চতুর্থ বছরের কার্যক্রম চলছে। ২০০৭-০৮ সালের প্রস্তুতিমূলক বছরটি বাদ দিলে ৩টি অর্থবছরে সম্প্রসারণ

প্রক্রিয়ার সার্থক বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রমের অগ্রগতির সংক্ষিপ্তরূপ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক. সিআইজি গঠন
বর্তমানে প্রকল্প এলাকাভুক্ত ১৩৩৫টি ইউনিয়নে ১৩৩৫ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লিফ কর্মরত। এলাকায় চাষিদের সুবিধার্থে তাদেরকে সাইকেল ও কারিগরি সহায়তাদানে সক্ষম করে তোলার অংশ হিসেবে পানির গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য 'কিট বক্স' দেয়া হয়েছে। ১৩৩৫টি ইউনিয়নে ২৬৭০টি সিআইজি গঠনের মাধ্যমে প্রায় ৪০,০৫০ জন চাষিকে সিআইজিভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি সিআইজিতে কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়েছে।

খ. প্রযুক্তি সম্প্রসারণ

১. জনবল
লিফ (**LEAF-Local Extension Agent for Fisheries**): সকল লিফকে ইতোমধ্যে মৎস্যচাষ ও সম্প্রসারণ কর্মে উপযুক্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এছাড়া পানির গুণাগুণ পরীক্ষায় পারদর্শী করার জন্য তাদেরকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সিআইজি চাষি: এযাবৎ ৪০,০৫০ জন সিআইজিভুক্ত চাষিকে মৎস্যচাষ বিষয়ে ৩ বার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। মাইক্রো-এক্সটেনশন পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ও প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সিআইজি কার্যকরী পরিষদের নেতৃবৃন্দকে নেতৃত্ব প্রদান বিষয়ে তিন দিনব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্ষেত্র সহকারী: প্রকল্প থেকে নিয়োজিত ১২০ জন ক্ষেত্র সহকারী (প্রতি উপজেলায় ১জন করে) এবং রাজস্ব খাতের ১২০ জন ক্ষেত্র সহকারীকে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এর আলোকে মৎস্যচাষ ও সম্প্রসারণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

সম্প্রসারণ কর্মকর্তা: প্রকল্প হতে প্রকল্পভুক্ত উপজেলাসমূহের প্রত্যেকটিতে ১ জন সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাদেরকে মৎস্যচাষ, সম্প্রসারণ ও পিআরএ (Participatory Rural Appraisal) বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়েছে।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা: প্রকল্পভুক্ত ১২০টি উপজেলার সকল উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে দু'দফায় প্রকল্প পরিচিতি ও পিআরএ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

২. প্রযুক্তি নির্বাচন
এ কাজটি প্রধানত সিআইজিভুক্ত চাষিগণ নিজেদের অভিজ্ঞতা ও আর্থসামাজিক অবস্থা, স্থানীয় বাজার চাহিদা এবং স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য উপকরণগত সুযোগ-সুবিধার আলোকে করে থাকেন। প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রকল্প তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করার ও প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাদির বৃহৎ পরিসর উন্মোচন করেছে।

৩. ইউনিয়ন মাইক্রো এক্সটেনশন পরিকল্পনা প্রণয়ন
১৩৩৫টি ইউনিয়নে বিগত দু'বছরে দু'বার মাইক্রো এক্সটেনশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সেসাথে স্থানীয় সিআইজি চাষিগণ কারিগরি সমস্যাদি চিহ্নিত করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণার্থে প্রকল্প কার্যালয়ে পাঠায়েছেন। চিহ্নিত সমস্যাদি পরবর্তী কার্যব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনে পাঠানো হয়েছে।

৪. প্রদর্শনী
২০০৮-০৯ অর্থবছরে নিম্নোক্ত ৪টি বিষয়ে ৯৪টি প্রদর্শনী বাস্তবায়িত হয়।

(১) কার্প-গলদা মিশ্রচাষ
(২) মনোসেক্স তিলাপিয়া চাষ
(৩) থাই কই চাষ
(৪) রুই জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ

২০০৯-১০ অর্থবছরে ১০টি বিষয়ে মোট ৯৬৬টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। প্রযুক্তিসমূহের নাম ও প্রযুক্তিভিত্তিক প্রদর্শনীসমূহের সংখ্যা দেয়া হলো:

(১) মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ	- ৫৪৮টি
(২) রুই জাতীয় মাছ ও গলদা চিংড়ি চাষ	- ২৪২টি
(৩) রুই জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	- ৭৭টি
(৪) থাই কই চাষ	- ৪৬টি
(৫) রুই জাতীয় পোনার নার্সারি	- ২৩টি
(৬) গিফট (তিলাপিয়া) চাষ	- ২০টি
(৭) বাগদা ও রুই জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	- ৬টি
(৮) পাঙ্গাস মাছ চাষ	- ২টি
(৯) শিং মাছ	- ১টি
(১০) গলদা পোনা নার্সারি	- ১টি

৫. মাঠ দিবস: প্রযুক্তিভিত্তিক মৎস্যচাষ প্রদর্শনীর ফলাফল স্থানীয় আগ্রহী চাষিগণের মাঝে তুলে ধরা এবং উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে এ যাবৎ প্রায় পাঁচ শতাধিক মাঠ দিবস উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে পালন করা হয়েছে, যা এলাকায় মৎস্যচাষ সম্প্রসারণে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে।

৬. প্রকাশনা

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল: কেন্দ্রীয়ভাবে এ পর্যন্ত ৭টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণীত হয়েছে যা বিভিন্ন ধরনের জনবল প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি উপজেলা তাদের স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী সিআইজি চাষিদের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করেছে।

বুকলেট: প্রকল্প পরিচিতি তুলে ধরার জন্য ১টি বুকলেট প্রণীত হয়েছে।

লিফলেট: লিফ, ফিয়াক বিষয়সমূহ তুলে ধরার জন্য দু'টি লিফলেট প্রকাশিত হয়েছে।

পোস্টার: লিফ, ফিয়াক ও মৎস্য সপ্তাহ বিষয়ে এযাবৎ ৩টি পোস্টার প্রকাশিত হয়েছে।

অন্যান্য: এছাড়া চাষিদের জন্য পুকুর রেকর্ড বই, ফিয়াকে ব্যবহৃতব্য পরামর্শ পত্র মুদ্রিত হয়েছে। টেলিভিশনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের নিকট ফিয়াককে পরিচিত করার জন্য একটি টিভি স্পট এবং প্রকল্পের সার্বিক কর্মকাণ্ডের ওপর সংক্ষিপ্ত ডকুমেন্টারি নির্মিত ও প্রচারিত হয়েছে।

৭. মেলা: উপজেলা ও জেলায় কৃষি মেলায় অংশগ্রহণ ছাড়াও সরকারি পর্যায়ে কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত মৎস্য মেলায় প্রকল্প অংশগ্রহণ করেছে। ২০১০ সালে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলায় প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত স্টলটি শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচিত হয়ে পদক প্রাপ্ত হয়।

৮. অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর: মোট ৯৪টি উপজেলাভিত্তিক অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রায় ৪,৪০০ জন সিআইজি চাষি, প্রায় ১,০৫০ জন লিফ, ৯৪ জন পোনা ব্যবসায়ীসহ উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। সফরের উল্লেখযোগ্য বিষয়াদি ছিল অন্য এলাকায় সফল চাষিদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য স্থাপনা পরিদর্শন ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান নিজ এলাকায় বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৯. ফিয়াক: এ পর্যন্ত প্রায় ৬০০টি ফিয়াক চালু করা সম্ভব হয়েছে। মূলত ইউনিয়ন কমপ্লেক্স ভবনের অভাবেই অবশিষ্ট কেন্দ্রসমূহ চালু করা সম্ভব হয় নি। চালু কেন্দ্রসমূহে পরামর্শ বইসহ যথেষ্ট সংখ্যক মৎস্যচাষ সংক্রান্ত লিফলেট, পুস্তিকা সরবরাহ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট লিফগণ সপ্তাহের পূর্ব নির্ধারিত দিন ও সময়ে উপস্থিত থেকে সিআইজি চাষি ছাড়াও এলাকার আগ্রহী অন্যান্য মৎস্যচাষিদের মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি ও মাছচাষে পরামর্শ প্রদান করে থাকেন।

ফলাফল

উপর্যুক্ত যাবতীয় সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে টেকসইভাবে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখা। এটি হয় দু'ভাবে, হরাইজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল-এ উভয়বিধ সম্প্রসারণের ফলে। হরাইজন্টাল মানে উন্নত মৎস্যচাষের আওতায় আসা জলাশয়ের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়ে যাওয়া এবং ভার্টিক্যাল অর্থাৎ বিদ্যমান জলাশয়ে মাছের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। এ উভয়বিধ প্রক্রিয়াতেই এনএটিপি সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার প্রচেষ্টা জোরদার রয়েছে।

প্রচেষ্টার সাথে সম্পৃক্ত জনবল এখন দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রকল্প এলাকাভুক্ত গ্রাম পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মৎস্যচাষি এখন সুসংগঠিত ও উন্নত মৎস্যচাষের জন্য পরিকল্পনার ভিত্তিতে মাছচাষে সক্ষম। প্রদর্শনীসমূহের মাধ্যমে নতুন নতুন চাষি (Adopter Neighbor Farmers) সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়েছে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সিআইজি চাষিসহ এলাকার সাধারণ চাষিদেরকে হাতে-কলমে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পের প্রথম ধাপের (Phase-১) শেষ বছরে সমুদয় কার্যক্রমের ব্যাপকভিত্তিক সার্বিক মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। এটি সমাপ্ত হলে জাতীয় উৎপাদনে প্রকল্পের প্রভাব আরও সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হবে। তবে প্রাথমিকভাবে যে ফলাফল পাওয়া গেছে তা সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. প্রদর্শনী

প্রদর্শনী মাছ চাষের প্রভাব দু'রকম- উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি গ্রাহকচাষি (adopter) সৃষ্টি। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে পরিচালিত ৯৪টি প্রদর্শনীতে নিম্নরূপে বর্ধিত উৎপাদন আগ্রহী চাষিদের সামনে তুলে ধরা হয় (সারণি ১ ও ২)

সারণি ১: প্রদর্শনী কার্যক্রমের (২০০৮-০৯) উৎপাদন বৃদ্ধির মাত্রা

প্রযুক্তি	উৎপাদন (মে.টন/হে.)		শতকরা বৃদ্ধি
	পূর্বে	প্রদর্শনীতে	
১. কার্প-গলদা মিশ্রচাষ	১.৯১	৪.১৭	১১৮.৬০
২. মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ	৩.৪২	৭.৫২	১২০.০৬
৩. থাই কই চাষ	৪.৫৩	৫.৮১	২৮.২০
৪. রুই জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	১.৯১	৪.০০	১০৯.৮৬
মোট	**২.৯৪**	**৫.৩৭**	**৯৪.১৮**

সারণি ২: প্রদর্শনী কার্যক্রমের (২০০৮-০৯) আয়-ব্যয়ের অনুপাত

প্রযুক্তি	গড় ব্যয় টাকা/হে.	মোট গড় আয় টাকা/হে.	গড় প্রকৃত আয় টাকা/হে.	আয়/ব্যয় অনুপাত
১. কার্প-গলদা মিশ্রচাষ	২৪৩৬৩৭.৮৩	৪৪৯৯৫৭.৭৯	২০৬৩১৯.৯৭	১.৮৫
২. মনোসেক্স তিলাপিয়া চাষ	৩৭৩০৮৬.৮২	৬৬৩০৬০.৬৫	২৮৯৯৭৩.৮২	১.৭৮
৩. থাই-কই চাষ	৪৫১৬৭৫.০০	৮৩৮৩২৯.৩৩	৩৮৬৬৫৪.৩৩	১.৮৬
৪. রুই জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	১৭৮৬৭২.৫০	৩০০০৭৫.৫০	১২১৪০৩.০০	১.৬৮
মোট	**৩৩৪০৩০.২২**	**৬০০৭৮০.৪৩**	**২৬৬৭৫০.২০**	**১.৮০**

প্রদর্শিত সফল প্রযুক্তি নতুন গ্রাহক (Adopter) সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। নিম্নে এর মাত্রা উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৩: প্রতিবেশী কর্তৃক প্রদর্শিত নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের মাত্রা

প্রযুক্তি	প্রতিবেশী নতুন গ্রাহকের সংখ্যা	প্রযুক্তি প্রতি গ্রাহক সংখ্যা	প্রতিবেশী নতুন গ্রাহকের মোট জলায়তন (শতক)	প্রতিবেশী নতুন গ্রাহকদের জলায়তের গড় আয়তন (শতক)
১. কার্প-গলদা মিশ্রচাষ	২৪৩৬৩৭.৮৩	৪৪৯৯৫৭.৭৯	২০৬৩১৯.৯৭	১.৮৫
২. মনোসেক্স তিলাপিয়া চাষ	৩৭৩০৮৬.৮২	৬৬৩০৬০.৬৫	২৮৯৯৭৩.৮২	১.৭৮
৩. থাই কই চাষ	৪৫১৬৭৫.০০	৮৩৮৩২৯.৩৩	৩৮৬৬৫৪.৩৩	১.৮৬
৪. রুই জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ	১৭৮৬৭২.৫০	৩০০০৭৫.৫০	১২১৪০৩.০০	১.৬৮
মোট	**৩৩৪০৩০.২২**	**৬০০৭৮০.৪৩**	**২৬৬৭৫০.২০**	**১.৮০**

২. চাষি পর্যায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি

সকল সম্প্রসারণ কার্যক্রম বিশেষ করে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী হেতু প্রকল্পভুক্ত চাষিদের (সিআইজিভুক্ত) উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে এটি আশা করা হচ্ছে। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের (Phase-1) শেষ বৎসরে এ বিষয়ে সংগৃহীত তথ্যাদি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন।

এখন পর্যন্ত ৫৫৩ জন সিআইজি চাষির কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এখন পরিবর্তিত উন্নত মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার কারণে হেক্টর প্রতি উৎপাদন পূর্বের (প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির আগে) মৎস্য উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৩২৪৮ কেজি থেকে প্রকল্প সংশ্লিষ্টতার কারণে এখন তা বৃদ্ধি পেয়ে হেক্টর প্রতি ৪৪২৭ কেজিতে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির হার ১১৭৯ কেজি। এ থেকে ১২০টি উপজেলার ২৬৭০টি সিআইজির উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ায় বিকেন্দ্রীকরণের কাজ টেকসইভাবেই এগিয়ে চলেছে। মাঠ পর্যায়ের চাষিদের সমন্বিত প্রচেষ্টাকে উৎপাদনের মূল ধারায় প্রবাহিত করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান পর্যায় (Phase-1) শেষে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় চাষিগণ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরভাবে মাছ চাষ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় সক্ষম হয়ে স্থিতিশীল উৎপাদন বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের এবং জাতীয় আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারবেন এবং এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হবে এ কথা দৃঢ় প্রত্যয়ে ব্যক্ত করা যায়।

১. পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)
২. সহকারী পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)
৩. ট্রেনিং এন্ড কমিউনিকেশন এক্সপার্ট, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)

কার্প জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদনে হ্যাচারি ও খামারের জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থা

এ এস এম রাশেদুল হক

বিগত বছরগুলোতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে হ্যাচারি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মাছের রেণু পোনা উৎপাদনে বিপুল পরিমাণগত সাফল্য অর্জিত হলেও এর গুণগত উন্নয়নের পরিবর্তে ব্যাপক অবনতি হয়েছে। দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য সেক্টরের এ বিপুল সাফল্যের পিছনে হ্যাচারি ও মৎস্য খামারের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে কার্প জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদনে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে হ্যাচারি ও নার্সারির সংখ্যা যথাক্রমে ৮৫৪ ও ৮,৮৮১টি। এসব হ্যাচারি ও নার্সারি থেকে গত বছর রেণু উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪৫৯.৮০ মে.টন এবং পোনা মাছ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৯৬০০১ লক্ষটি (ডিওএফ, ২০০৯-১০)। দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে বেসরকারি পর্যায়ে এসব হ্যাচারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেসরকারি এসব হ্যাচারি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বর্তমানে দেশের রেণুর চাহিদার প্রায় পুরোটাই পূরণ হচ্ছে। কিন্তু রেণুর পরিমাণগত সাফল্য অর্জিত হলেও এর গুণগতমানের অবনতির কারণে দৈহিক বৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। মৎস্য গবেষক ও বিশেষজ্ঞগণ রেণু ও পোনার গুণগতমানের অবনতির পিছনে অনেকগুলো কারণ চিহ্নিত করেছেন। এর মধ্যে আন্তঃপ্রজনন সমস্যা, অপরিণত ও খর্বাকৃতি মাছ প্রজনন, অপরিকল্পিত সঙ্করায়ন, ব্রুড মাছের ঋণাত্মক নির্বাচন, নিম্নমানেরপোনা সংগ্রহ ও প্রতিপালন ইত্যাদি অন্যতম। রেণু ও পোনা মাছের গুণগতমান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে হ্যাচারি ও খামারের জৈবনিরাপত্তার বিষয়টি বর্তমানে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে।

জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থা

জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থা হ্যাচারিতে মাছের রোগ-জীবাণু প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিহত করে এবং এর বিস্তার রোধ করে। খামারের ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধি, জৈব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করে হ্যাচারিতে মাছের রোগ-জীবাণু নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিহত করাই হ্যাচারির জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থা। খামারে রোগ মুক্ত মাছের ব্যবহার, হ্যাচারি ও খামারে বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত পানি ব্যবহার, হ্যাচারির বিভিন্ন চৌবাচ্চা ও ওভারহেড ট্যাঙ্ক নিয়মিত জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার এবং ওভারহেড ট্যাঙ্ক ও হ্যাচারিতে পানি সরবরাহের পাইপলাইন জীবাণুমুক্ত ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা অত্যন্ত জরুরি। এছাড়া মাছকে পরিমাণমত ও নিয়মিত জীবাণুমুক্ত সুষম খাবার প্রদান, পুকুরের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী মাছ প্রতিপালন, হ্যাচারির ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী রেণু উৎপাদন, খামার ও হ্যাচারিতে মাছের রোগ-জীবাণু প্রবেশ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করাই হ্যাচারির জৈবনিরাপত্তার মূল উদ্দেশ্য।

কার্প হ্যাচারি ও খামারের জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থা

কার্প হ্যাচারি ও খামারের জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থায় নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক

১. হ্যাচারির ভৌত অবকাঠামো ব্যবস্থা

হ্যাচারি এমন স্থানে হতে হবে যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে এবং সকল ধরনের হ্যাচারি পরিচালনার ব্যবস্থাদি বিদ্যমান। একটি ভাল মানের হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদনের যে সব সুযোগ-সুবিধাদির প্রয়োজন তার সব কিছুই থাকতে হবে। যেমন- মাছ পরিশোধন ও হ্যাচারিতে খাপখাইয়ে নেয়ার জন্য আলাদা চৌবাচ্চা (quarantine, acclimatization), ব্রিডিং ও হ্যাচিং সার্কুলার ট্যাঙ্ক, রেণু প্রতিপালনের ট্যাঙ্ক, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের সুব্যবস্থা, ওভারহেড ট্যাঙ্কের পানিতে অক্সিজেন মিশানোর সুব্যবস্থা, আলাদা হ্যাচারি ভবন, অফিস ভবন, বাসভবন, স্টোর রুম ইত্যাদি। হ্যাচারির চারিধারে উচ্চ বেস্টনী প্রাচীর থাকতে হবে যাতে কেউ হ্যাচারিতে প্রবেশ করতে না পারে। তাছাড়া হ্যাচারি সংলগ্ন খামারের চারধারে নিরাপত্তা বেস্টনী প্রাচীর থাকতে হবে যাতে গরু-ছাগল ও অননুমোদিত লোকজন খামারে প্রবেশ করতে না পারে। এসব সুযোগ সুবিধা হ্যাচারিতে রোগ-জীবাণু প্রবেশের ঝুঁকি কমায় এবং হ্যাচারি ও খামারের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করে। খামারের মাছ পুকুর ও অন্যান্য পুকুরগুলো এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যাতে পুকুরগুলো সব সময় পরিশোধন করার ব্যবস্থা থাকে। বাইরের মাছ খামারে প্রবেশ করার পর তা হ্যাচারিতে নিয়ে জীবাণুমুক্ত করা অতীব জরুরি।

২. হ্যাচারিতে জীবাণুমুক্ত পানি ব্যবহার

ভাল ও উন্নতমানের রেণু উৎপাদনের জন্য হ্যাচারিতে অক্সিজেন মিশ্রিত জীবাণুমুক্ত বিশুদ্ধ পানি অত্যন্ত জরুরি। নিম্নমানের পানি ব্যবহারে হ্যাচারিতে অস্বাভাবিক পরিমাণে রেণুর মৃত্যু ঘটে এবং নিম্নমানের ও বিকলাঙ্গ রেণু উৎপাদন হয়। আমাদের দেশের প্রায় সব হ্যাচারিগুলো ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে অগভীর নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। আর্সেনিক ও আয়রন মুক্ত পানি হ্যাচারিতে ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক। এ বিষয়ে হ্যাচারিতে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নামিয়ে আনার বিষয়টি বিবেচনায় আনা যেতে পারে এবং জৈবনিরাপত্তার ক্ষেত্রে পানিতে সহনীয় মাত্রায় আয়রন ও আর্সেনিকের উপস্থিতি পরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। থাইল্যান্ড বা অন্যান্য দেশের সরকারি ও বেসরকারি হ্যাচারিগুলোতে প্রাকৃতিক উৎসের পানি (পুকুর, লেক, খাল, জলাধার) সর্বাধিক ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে হ্যাচারিতে ব্যবহারযোগ্য পানি জীবাণুমুক্ত, বিশুদ্ধ এবং

অক্সিজেন মিশ্রিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। জৈব ব্যবস্থাপনায় পানি ফিল্টার, কৃত্রিম ব্যবস্থাপনায় পানিতে বাতাস মিশ্রণ এবং পানি জীবাণুমুক্ত করার মাধ্যমে হ্যাচারিকে জৈবনিরাপত্তার আওতায় আনা প্রয়োজন।

ছবি: গাইবান্ধা সরকারি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারের পানি জৈব ব্যবস্থাপনায় ফিল্টার করা ও পানিতে অক্সিজেন মিশ্রণের প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হলো

৩. মাছ নির্বাচন

উন্নত ও ভাল জাতের মাছ নির্বাচনই হচ্ছে উন্নতমানের রেণু উৎপাদন ও মানসম্মত রেণু উৎপাদনের চাবিকাঠি। হ্যাচারিতে সংগ্রহের সময় প্রাকৃতিক বা জ্ঞাত উৎস থেকে অরিজিনাল বন্যজাতের ব্রুড মাছ সংগ্রহ করে হ্যাচারিতে এনে রোগ-জীবাণু পরীক্ষান্তে জীবাণু মুক্ত করে ব্রুড মাছ পুকুরে অবমুক্ত করা উচিত। হ্যাচারিতে পরিপক্ব ও সবল স্বাস্থ্যবান ব্রুড মাছকে প্রজনন কাজে নির্বাচন করা উচিত। এক্ষেত্রে মাছের আকার, ওজন, পূর্ণ পরিপক্বতা, মাছের বয়স, স্ত্রী-পুরুষ মাছের আনুপাতিক হার সবার আগে বিবেচনায় আনতে হবে। ব্রুড মাছকে প্রজনন কাজে ব্যবহারের পর তা সঠিক চিকিৎসা দিয়ে অন্য একটি খালি ব্রুড পুকুরে স্থানান্তর করে নিয়মিত ও পরিমাণমত সুষম খাদ্য দিতে হবে। আন্তঃপ্রজনন রোধকল্পে হ্যাচারিতে একটি সুপরিকল্পিত নির্বাচিত প্রজনন প্রক্রিয়া, প্রজনন নকশা অনুযায়ী সম্পন্ন করা উচিত। এক্ষেত্রে মাছের বংশপরম্পরার (heritability) ও কৌলিতাত্ত্বিক বৈষম্যের (genetic variability) সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকবে যার ফলে আন্তঃপ্রজনন সমস্যা দূর হবে।

৪. ডিম ও রেণু

হ্যাচারিতে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা সহজ এমন ইনকিউবেশন ইউনিট থাকতে হবে যাতে ব্রুড মাছ থেকে ভাল ডিম ও স্পার্ম সংগ্রহ করে তা ভালভাবে মিশ্রণ সম্পন্ন করা যায় এবং ইনকিউবেশন ইউনিটের ফানেল বা সার্কুলার ট্যাঙ্কে পরিমিত পরিমাণ ডিম ও রেণু লালন করা যায়। নতুবা এখান থেকে তৈরি পোনা দৈহিকভাবে দুর্বল ও বিকলাঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সার্কুলার ট্যাঙ্কে ডিম দেয়ার পূর্বে ইনকিউবেশন ইউনিটটি স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে (পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহারের মাধ্যমে)। অতঃপর জীবাণুমুক্ত সার্কুলার ট্যাঙ্কের অক্সিজেন মিশ্রিত বিশুদ্ধ পানিতে নিষিক্ত ডিম অবমুক্ত করতে হবে এবং সার্কুলার ট্যাঙ্কে নিয়মিত ও পরিমাণমত পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহারের মাধ্যমে ফাংগাসের সংক্রমণ থেকে রেণুকে মুক্ত রাখতে হবে। ডিম থেকে রেণু ফুটে বের হবার পর তা যত্নসহকারে সার্কুলার ট্যাঙ্কে জীবাণুমুক্ত অবস্থায় প্রতিপালন করতে হবে।

৫. হ্যাচিং ট্যাঙ্কের পানির তাপমাত্রা

হ্যাচারি বোতল বা সার্কুলার ট্যাঙ্কের পানির তাপমাত্রা সবসময় যাতে ২২-২৮ ডিগ্রি সে. বজায় থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। পানির উচ্চ তাপমাত্রায় হ্যাচিং ট্যাংকের নিষিক্ত ডিম ও রেণু নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া অতি গরমে হ্যাচারির পানি যেন উত্তপ্ত না হয় তার জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রার পানি ওভারহেড ট্যাঙ্কে উত্তোলন করতে হবে এবং হ্যাচারিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

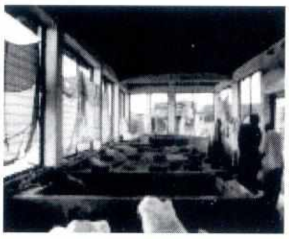

ছবি: গাইবান্ধা সরকারি মৎস্য হ্যাচারিতে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত বাতাস প্রবেশের সুব্যবস্থা

৬. ব্রুড মাছের পরিচর্যা ও সুষম খাদ্য প্রয়োগ

হ্যাচারিতে যে পরিমাণ ব্রুড মাছ প্রজনন কাজে ব্যবহার করা হবে তার চেয়ে ১০% বেশী ব্রুড মাছ খামারে লালন পালন করা প্রয়োজন। তবে ব্রুড মাছের পরিমাণ নির্ধারিত হবে হ্যাচারির উৎপাদন ক্ষমতার উপর। অনুসন্ধানে দেখা গেছে খামারে যে পরিমাণ ব্রুড মাছ প্রতিপালন করা হয় তার ২% হারিয়ে যায়, ৫% যথাসময়ে পরিপক্বতা লাভ করে না এবং ৩% পরিপূর্ণ প্রজনন করে না। ব্রুড মাছকে নিয়মিত পরিচর্যা এবং সুষম খাদ্য প্রয়োগ না করার ফলে এরূপ হয়ে থাকে। তাই ব্রুড মাছকে ২৫-৩৫% আমিষ সমৃদ্ধ সুষম খাদ্য ভিন্ন সময় বিভিন্ন মাত্রায় (৩-৫% হারে) প্রয়োগ করা প্রয়োজন। ভাল মানের রেণু প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্রুড মাছকে অবশ্যই উন্নতমানের জীবাণু মুক্ত সুষম খাদ্য প্রয়োগ করা জরুরি। ব্রুড মাছকে গুণগত মানসম্মত ও পুষ্টিকর সুষম খাদ্য না দিলে দুর্বল ও বিকলাঙ্গ রেণু উৎপন্ন হয় এবং পোনা অবস্থায় রোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। ভাল মানের খাবার শুস্ক, ঠাণ্ডা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন স্টোর রুমে সংগ্রহ ও মজুদপূর্বক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পাত্রে রেখে ব্রুড মাছকে তা খাওয়ানো প্রয়োজন। এছাড়াও pH ও অক্রিজেন উপযুক্ত মাত্রায় রাখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৭. হ্যাচারিতে ব্যবহৃত উপকরণাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও জীবাণুমুক্তকরণ

হ্যাচারিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, বাসনপত্র ও বিভিন্ন উপকরণাদি সব সময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে জীবাণু মুক্ত করে প্রজনন কাজে ব্যবহার করা প্রয়োজন। নতুবা হ্যাচারিতে রোগ-জীবাণু বিস্তার ঘটার সম্ভাবনা থাকে। প্রতি উৎপাদন চক্রের পর হ্যাচারিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, বাসনপত্র ও বিভিন্ন উপকরণাদি জীবাণুনাশক দ্বারা পরিশোধন করার পর তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গায় সংরক্ষণ করা জরুরি। ওভারহেড ট্যাঙ্ক, পানি সরবরাহের পাইপলাইন ও অক্সিজেন মিশ্রণের টাওয়ার হ্যাচারি চলাকালে প্রতিমাসে একবার পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা জরুরি নতুবা রোগ বিস্তার ঘটার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে এবং ওভারহেড ট্যাঙ্কে শেওলা জন্মে।

৮. হ্যাচারি বিল্ডিং এ সর্বসাধারণের চলাচল নিষিদ্ধকরণ

হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন চলাকালে অনুমোদিত কর্মকর্তা/কর্মচারী ছাড়া সর্বসাধারণের চলাচল নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে। হ্যাচারিতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে জীবাণু মুক্ত পোষাক, জীবাণুমুক্ত জুতা ও মুখোস বা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করা জরুরি। হ্যাচারিতে প্রবেশের মুখে জীবাণুমুক্তকরণের জন্য ফুটবাথ এর ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন যাতে রোগ-জীবাণুর বিস্তার না ঘটে।

৯. হ্যাচারিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহার

হ্যাচারি পরিচালনার সময় বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যাদি (যেমন- ফরমালিন, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, ইত্যাদি), হরমোন, এ্যান্টিবায়োটিক পরিমিত পরিমাণ ও নির্দিষ্ট মাত্রায় ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। তাই দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত ব্যাক্তি দ্বারা হ্যাচারি পরিচালনা করা অতীব জরুরি। নতুবা কম বা বেশী মাত্রায় রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহারের ফলে রেণুর মৃত্যু অথবা হ্যাচারি জীবাণু মুক্ত নাও হতে পারে এবং রোগ-জীবাণু বিস্তারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

১০. রেকর্ড সংরক্ষণ

হ্যাচারি পরিচালনার যাবতীয় কার্যক্রম বিজ্ঞানসম্মত এবং হিসাব-নিকাশ ভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন। ভাল হ্যাচারি ব্যবস্থাপনার জন্য খামারের ব্রুড সংগ্রহ থেকে শুরু করে সকল কর্মকাণ্ড রেকর্ডভুক্ত রাখা দরকার। ব্রুড মাছকে হরমোন ইনজেকশন নির্দিষ্ট মাত্রায় ও নির্ধারিত সময়ের ব্যবধানে একাধিকবার প্রয়োগ করতে হয় বিধায় হ্যাচারি পরিচালনার যাবতীয় কাজকর্মের রেকর্ড সংরক্ষণ করা একান্ত জরুরি।

সুতরাং, হ্যাচারিতে গুণগত মানসম্মত উন্নত জাতের রেণু ও পোনা তৈরির জন্য হ্যাচারির জৈবনিরাপত্তা একান্ত প্রয়োজন। মাছের রোগ-জীবাণু বিস্তার রোধকল্পে হ্যাচারি ও খামারে জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করলে রোগ-জীবাণু সংক্রমণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব।

চিত্র: প্রস্তাবিত জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থাযুক্ত একটি কার্প হ্যাচারির ডিজাইন

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রংপুর

অণুপুষ্টিজনিত অপুষ্টি পূরণে ছোটমাছের গুরুত্ব ও উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল

ড. বিনয় কুমার বর্ম্মন[১], মো: মোকাররম হোসেন[২] ও ড. মনজুরুল করিম[৩]

বাংলাদেশের দু'কোটিরও বেশি মানুষ অণুপুষ্টি বা মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট (ভিটামিন-এ, আয়রন, ক্যালসিয়াম এবং জিঙ্ক) ঘাটতির শিকার। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী শিশু এবং গর্ভবতী মহিলারা অধিকহারে এ ঘাটতির ঝুঁকির মুখে রয়েছে। এর মধ্যে ভিটামিন এ এবং আয়রন ঘাটতির মাত্রা ব্যাপক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ভিটামিন-এ'র ঘাটতির ব্যাপকতা এবং আয়রনের ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতার (অ্যানিমিয়া) হার আফ্রিকা ও অণুপুষ্টি বিদ্যমান থাকে । এ সকল মাছ সাধারণত পুরোটাই খাওয়া হয় বিধায় অণুপুষ্টি বেশি পাওয়া যায়। কারণ এদের মাথা, অঙ্গপ্রতঙ্গ, হাড়, ইত্যাদি ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-এ, আয়রন ও জিঙ্ক সমৃদ্ধ (চিত্র ১) ।

জলজসম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের শর্করা সমৃদ্ধ প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকায় মাছ একটি অপরিহার্য উপাদান। আমাদের শরীর মাছের এসব পুষ্টি উপাদানকে

সারণি ১: বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী শিশু এবং গর্ভবতী মহিলাদের আয়রন ঘাটতিজনিত অ্যানিমিয়ার ব্যাপকতা এবং ভিটামিন এ'র ঘাটতির তুলনামূলক বিবরণ:

অঞ্চল	আয়রনজনিত অ্যানিমিয়ার ব্যাপকতা (%) (এ)		ভিটামিন ঘাটতিজনিত ব্যাপকতা (%) (বি)	
	প্রাক-বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী শিশু	গর্ভবতী মহিলা	প্রাক-বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী শিশু	গর্ভবতী মহিলা
এশিয়া	৪৭.৭	৪১.৬	৩৩.৫	১৮.৪
আফ্রিকা	৬৪.৪	৫৫.৮	৪১.৬	১৪.৩
ল্যাটিন আমেরিকা/ক্যারিবিয়ান	৩৯.৫	৩১.১	১৫.৬	২.০
ওশেনিয়া	২৮.০	৩০.৪	১২.৬	১.৪
গ্লোবাল	৪৭.৪	৪১.৮	৩৩.৩	১৫.৩

উৎস: (এ) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (২০০৮), (বি) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (২০০৯)

এশিয়ায় তুলনামূলকহারে বেশি (সারণি ১)। খাদ্যাভ্যাস, দরিদ্রতা, খাদ্য গ্রহণে সামাজিক বিধিনিষেধ এবং অর্থ উপার্জনের সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক পরিবারকে প্রধানত ভাতের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। যদিও প্রায় ৬৯% ভাগ শক্তি ভাত থেকে আসে কিন্তু প্রয়োজনীয় অণুপুষ্টি সরবরাহের দিক থেকে তা অপ্রতুল। ইউনিসেফ (২০০৮) এর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে বয়সের তুলনায় কম ওজনের (underweight), বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত (stunting) এবং শারীরিক ক্ষয়প্রাপ্ত (wasting) শিশু যথাক্রমে ৪১%, ৪৩% এবং ১৭% যা বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক। বিভিন্ন সামাজিক কারণে বাংলাদেশে পুরুষের তুলনায় মহিলা ও মেয়ে শিশুরা অধিকহারে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও অণুপুষ্টিজনিত অপুষ্টির শিকার।

ছোটমাছ অণুপুষ্টির ভাল উৎস

খাবারে ছোটমাছের অধিক পরিমাণে ব্যবহার গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা এবং ছোট শিশুদের অপুষ্টি দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। ছোটমাছের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে মলা, দারকিনা, ঢেলা ইত্যাদিতে অধিক পরিমাণে উদ্ভিজ পুষ্টি উপাদানের তুলনায় অধিক কার্যকরভাবে শুষে নেয়। অধিকন্তু অন্য খাবারের আয়রন এবং জিঙ্ক শুষে নেয়ার কাজেও মাছের পুষ্টি উপাদান সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী যতটুকু মাছ খায় তার মধ্যে বড় মাছ এবং অন্যান্য প্রাণিজ খাদ্য (ডিম, মাংস, দুধ, ফলমূল) এর তুলনায় ছোটমাছ বেশি খায়। গবেষণায় দেখা যায় যে, এমনকি যারা অত্যন্ত গরীব তাদের খাদ্যেও ছোটমাছের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তারা যে সকল মাছ খায় তার প্রায় ৬৯% ভাগই ছোট মাছ (দারকিনা, পুঁটি, কাঁচকি, টাকি. গচি) (Barman *et al.*, ২০১১)। তাছাড়া ছোটমাছ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সমহারে বণ্টন করার জন্য সুবিধাজনক।

ছোটমাছ ও পুষ্টিবিষয়ক শিক্ষা

ছোট মাছের অণুপুষ্টিকে পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করার জন্য এর অপচয় রোধ করা প্রয়োজন। সাধারণত এসকল মাছ খাওয়ার জন্য তৈরির (কাটাবাছা, ধোয়া, রান্না) সময় পুষ্টির অপচয় হয়ে থাকে। মাছের মাথা ও পেটের অংশ কেটে ফেলে দেয়া, বারবার ধোয়া, দীর্ঘ সময় ধরে রান্না করার ফলে এ অপচয় বেশি হয়ে থাকে।

প্রায় ক্ষেত্রেই ছোট শিশুরা অণুপুষ্টি সমৃদ্ধ ছোট মাছ গলায় কাঁটা লাগার ভয়ে খেতে চায় না। এজন্য সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ছোটমাছকে প্রক্রিয়াজাত করে শিশুদের গ্রহণ উপযোগী করা একান্ত প্রয়োজন। দেখা গেছে যে, আধাসিদ্ধ ছোট মাছকে বেটে খিঁচুড়ির সাথে মিশিয়ে রান্না করে শিশুকে খুব সহজেই এ মাছ খাওয়ানো যায়। ছোট মাছ ও পুষ্টিবিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে প্রচলিত জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় করা হলে তা পরিবারের সদস্যদের অণুপুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাবার নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

ছোট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল

বাংলাদেশে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে পুকুর এবং ধানক্ষেতে কার্প জাতীয় মাছ, গলদা চিংড়ি ও ছোট মাছ (মলা, পুঁটি, ঢেলা, দারকিনা) একত্রে সফলভাবে চাষ করা যায়। ছোটমাছ কার্পজাতীয় মাছের উৎপাদনকে ব্যাহত করে না বরং তাদের একত্রে চাষ সামগ্রিক উৎপাদন, আয় এবং পারিবারিকভাবে মাছ খাওয়ার পরিমাণকে বাড়িয়ে দেয় (Roos. *et al.*, 2002; Wahab *et al.*, 2008)।

এক গবেষণায় পুকুরে মলা, গলদা চিংড়ি ও কার্প (সিলভার, রুই, কাতলা ও মৃগেল) একত্রে চাষ করে ১৫৫ দিনে প্রতি হেক্টরে মোট ২৫৫৬ কেজি মাছের উৎপাদন পাওয়া যায়। উৎপাদিত মাছের মধ্যে মলা ২৮৬ কেজি, গলদা চিংড়ি ১৮৪ কেজি এবং কার্পের উৎপাদন ২০৮৬ কেজি। এক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে মাছের পোনার মজুদ ঘনত্ব ছিল: মলা ২০,০০০টি, গলদা চিংড়ি জুভেনাইল ৩,৭৫০টি এবং কার্প ৭,৫০০টি। সম্পূরক খাবার হিসাবে খৈল এবং কুঁড়া ১:২ অনুপাতে প্রতিদিন মাছের শরীরের ওজনের ৩% হারে ব্যবহার করা হয়। এজন্য পুকুর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়। মলার সাথে গলদা চিংড়ি ও কার্প জাতীয় মাছ চাষে হেক্টরে ৬৩,০০০.০০ টাকা ব্যয় করে ১,৩৬,০০০.০০ টাকা আয় হয়। নীট আয় হয় ৭৩,০০০.০০ টাকা (Kunda *et al.*, 2010)। যেহেতু ছোটমাছের চাহিদা ও বাজার মূল্য দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই এর বাণিজ্যিক চাষেরও ব্যাপক সম্ভবনা রয়েছে।

গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, উন্মুক্ত জলাশয় (প্লাবনভূমি, হাওর, বিল), বাঁওড় ও বড় পুকুর দিঘিতে উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ছোটমাছের অধিক উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। এর ফলে দরিদ্র পরিবারের খাদ্য ও আয় দুটোই সংস্থান হতে পারে। সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ আরোপ, অভয়াশ্রম স্থাপন, সংরক্ষণ, উৎপাদন ও আয়ের সমবন্টন, গরিব জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেয়া ইত্যাদি কার্যক্রম এক্ষেত্রে অধিক কার্যকর কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

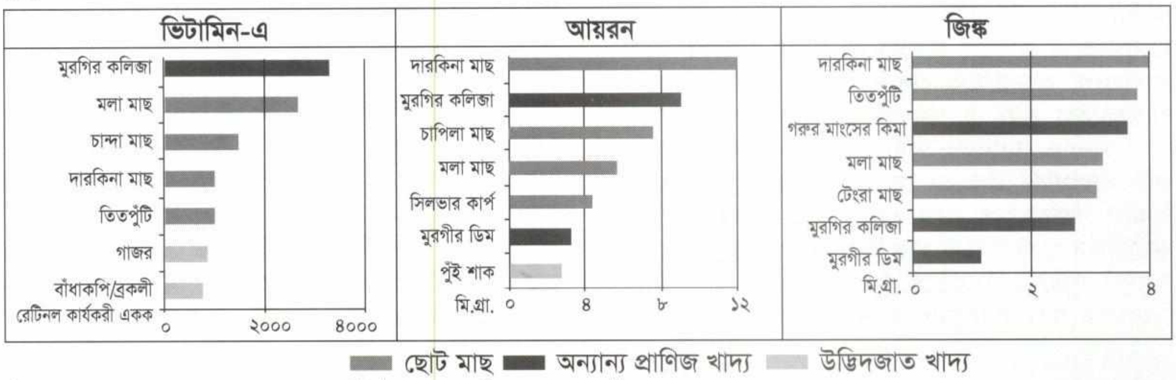

চিত্র ১: মাছ এবং অন্যান্য খাদ্যের অণুপুষ্টি উপাদান (প্রতি ১০০ গ্রাম কাঁচা ভোজ্য অংশ)
উৎস: Roos (2001), USDA (2005)

বর্তমান কার্যক্রম

অণুপুষ্টিজনিত অপুষ্টি পূরণে ছোটমাছের গুরুত্ব ও উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়কে বিবেচনা করে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যেই বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মৎস্য অধিদপ্তর 'চিহ্নিত অবয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা ও দেশীয় ছোট মাছ সংরক্ষণ প্রকল্প' এর মাধ্যমে সারা দেশে ছোটমাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

ছোট মাছ ও পুষ্টির বিষয়টিকে অগ্রাধিকার বিবেচনা করে ওয়ার্ল্ডফিস সেন্টার বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে এর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সম্প্রতি মৎস্য বিভাগ ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ইফাদের আর্থিক সহযোগিতায়

'ছোটমাছ ও পুষ্টি প্রকল্প' উত্তরাঞ্চলের রংপুর, দিনাজপুর জেলায় ও হাওর অঞ্চলের সুনামগঞ্জ জেলায় সরাসরি ২,০০০ পরিবারের সাথে পুকুর ও উন্মুক্ত জলাশয়ে ছোট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও পারিবারিক পুষ্টির বিষয় নিয়ে কাজ করছে। ইউএসএআইডির (USAID) আর্থিক সহযোগিতায় ওয়ার্ল্ডফিস সেন্টার আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (IRRI), আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র (CMMYIT), অন্যান্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের সাথে ৫ বছর মেয়াদের 'সিসা (Cereal System Initiative for South Asia - CSISA) - বাংলাদেশ প্রকল্প' বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরাসরি ৬০,০০০ পরিবারের সাথে কাজ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। এ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে অণুপুষ্টি সমৃদ্ধ ছোটমাছ উৎপাদন ও পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা ও সম্প্রসারণ একটি অন্যতম কার্যক্রম। এছাড়াও ওয়ার্ল্ডফিস সেন্টার ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ ও নেপালে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইডিই (IDE) বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (IRRI), আর্ন্তজাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র (CMMYIT), বাংলাদেশ ও নেপালের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে 'কৃষি ও পুষ্টি সম্প্রসারণ প্রকল্পের' মাধ্যমে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বাস্তবায়নের কাজ শুরু করতে যাচ্ছে। সর্বোপরি ওয়ার্ল্ডফিস সেন্টার ছোট মাছ উৎপাদন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অণুপুষ্টি পূরণের বিষয়টিকে মূল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ায় বাস্তবায়নের জন্য আগত বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। আশা করা যায় যে, ওয়ার্ল্ডফিস সেন্টার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গৃহীত এসকল কার্যক্রম বাংলাদেশে ছোট মাছের ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে শীঘ্রই অণুপুষ্টি জনিত অপুষ্টি পূরণের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে।

অণুপুষ্টিজনিত অপুষ্টি ঘাটতি পূরণকল্পে ছোট মাছের বিভিন্ন প্রজাতির সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির ক্ষেত্রে স্থায়িত্বশীলতা ও স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ প্রযুক্তির প্রয়োগ করতে হবে। খাদ্য হিসেবে ছোট মাছ আহার, তার পুষ্টিসংক্রান্ত বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, ধৌতকরণ এবং রান্নার পদ্ধতি বিষয়ে আরও তথ্য-উপাত্ত প্রয়োজন। ছোট মাছের গুরুত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা, অধিক পরামর্শ এবং পুষ্টিশিক্ষা আমাদের খাবারের বৈচিত্র্য বাড়িয়ে দিয়ে অণুপুষ্টিজনিত অপুষ্টি গ্রহণের প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে। মাঠ পর্যায়ে অণুপুষ্টিজনিত পুষ্টি চাহিদা পূরণে গৃহীত উদ্যোগসমূহের ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে হবে। বিশেষত মহিলা ও শিশুদের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে অণুপুষ্টিজনিত অপুষ্টি ঘাটতি পূরণে অণুপুষ্টিজনিত পুষ্টি সমৃদ্ধ ছোটমাছ ব্যবহারের প্রচেষ্টা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হচ্ছে কিনা তাও পর্যালোচনা করতে হবে।

ওয়ার্ল্ডফিস সেন্টার, বাংলাদেশ ও সাউথ এশিয়া অফিস, ঢাকা

গ্রামীণ মৎস্যখাতের উন্নয়ন: পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর ভূমিকা

ড. সুলতান মাহমুদ

'মাছে-ভাতে বাঙালি' এ সনাতন প্রবাদ বাক্যটি আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য, বাঙালি মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমিষের যোগান দেয়ার পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক আর্থসামাজিক অগ্রগতি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সর্বোপরি, দারিদ্র্য বিমোচনে মৎস্যসম্পদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্যখাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভাবনাময় এ খাতের ভূমিকা জাতীয় অর্থনীতিতে ক্রমান্বয়ে গতি সঞ্চার করে। দেশের কৃষিজ আয়ের প্রায় ২৩ শতাংশ এবং রপ্তানি আয়ের প্রায় ৩ শতাংশ আসে মৎস্য উপখাত থেকে। উল্লেখ্য, আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৫৮ শতাংশ যোগান দেয় মাছ। দেশের প্রায় ১.২৫ কোটি লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবিকার জন্য মৎস্যসেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত। প্রায় ১৩ লক্ষ মৎস্যজীবী মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করছে।

দেশের সামগ্রিক মৎস্য উন্নয়ন তথা দক্ষিণাঞ্চলের অপার সম্ভাবনাময় মৎস্যসম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও উন্নয়নকে সামনে রেখে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মৎস্য বিজ্ঞানী ও গবেষক তৈরির লক্ষ্য নিয়ে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পবিপ্রবি) এর অধীনে মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ প্রতিষ্ঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও অগ্রসর চিন্তার ফসল হিসেবে বিবেচিত। সঙ্গত কারণেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের রয়েছে অনেক দায়বদ্ধতা।

বাংলাদেশের মৎস্যখাতের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের পানিসম্পদ নানা জীববৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। দেশের আনাচে-কানাচে রয়েছে অনেক পুকুরদীঘি, ডোবানালা, খালবিল, নদীনালা, হাওর, বাঁওড় ও প্লাবনভূমি। তাছাড়া রয়েছে বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলসম্পদ। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের আয়তন প্রায় ৪০.২৫ লক্ষ হেক্টর (৮৬.৫%) এবং অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ের আয়তন প্রায় ৬.২৮ হেক্টর (১৩.৫%)। বৈচিত্র্যময় এ পানিসম্পদের মত আমাদের মৎস্য প্রজাতির সংখ্যা এবং বৈচিত্র্যেও অনন্য। আমাদের মিঠাপানিতে রয়েছে ২৬৫ প্রজাতির সুস্বাদু মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি আর মোহনা ও সমুদ্রে আছে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ ও ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি।

গত ১০ বছরে মাছের উৎপাদন বেড়েছে ৬৩%। এ উৎপাদন উন্মুক্ত জলাশয়ে আশানুরূপ (৫০%) বৃদ্ধি পেলেও দেশের নদনদী ও সমুদ্রবক্ষ হতে মাছ আহরণ সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পায়নি। সেক্ষেত্রে উন্নততর প্রযুক্তি প্রয়োগ, সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড নিবিড়করণ ও চাহিদামাফিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ফলে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন প্রবৃদ্ধি লক্ষণীয়। তবে বিগত বছরগুলোতে দেশের মৎস্য উৎপাদন বাড়লেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী আমিষের যোগান দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

মৎস্যনির্ভর গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে চিহ্নিত দিকসমূহ এবং আমাদের করণীয়

মাছের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ ও প্রান্তিক চাষিদের কর্মসংস্থান মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষের সাথে সম্পৃক্ত কর্মজীবী মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দেশের কর্মক্ষম যুবশক্তিকে আত্মকর্মসংস্থানের আওতাধীন করা, খাদ্যনিরাপত্তা তথা প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এ খাতের গুরুত্বকে বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত 'দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র'-এ সামগ্রিক বিবেচনায় কৃষি খাতের আওতাধীন মৎস্য উপখাতকে অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমান সরকার ঘোষিত দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্য উপখাতের সুনির্দিষ্ট অবদান নিশ্চিত করার কৌশল হিসেবে নানামুখী লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন- অভ্যন্তরীণ ও মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দরিদ্র মৎস্যজীবী ও প্রান্তিক মৎস্য চাষিদের আয় বৃদ্ধি, ধানক্ষেত ও নিম্ন জলাভূমিতে অধিকতর মৎস্য উৎপাদন, উপকূলীয় এলাকায় মৎস্যচাষ জোরদারকরণ ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ, দেশি ও বিদেশি বাজারে মৎস্য, মৎস্যজাত পণ্যসহ চিংড়ির গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, মৎস্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ। এক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার নিমিত্ত দেশের মৎস্য উৎপাদনের মূল ক্ষেত্রসমূহের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে আশু পদক্ষেপ বাঞ্ছনীয়।

দেশের অভ্যন্তরীণ পানিসম্পদ দূষণ ও অবক্ষয়ের জন্য প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণসমূহ দায়ী। প্রাকৃতিক কারণসমূহের মধ্যে নদীর গতিপথ পরিবর্তন, নাব্যতা কমে যাওয়া, পলিমাটিতে জলাভূমি ভরাট, হাওর ও বিলের গভীরতা হ্রাস, প্লাবনভূমির সাথে সংযোগ খাল ভরাট ও সংকুচিত হওয়া এবং খরা বা অনাবৃষ্টির কারণে জলাশয় সংকোচন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি মানবসৃষ্ট কারণের মধ্যে নদী, খাল ও বিল-এ পানি সেচে আবাদ, সেচকাজে অতিরিক্ত পানি ব্যবহার, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ তৈরি, শিল্পবর্জ্য দ্বারা পানিদূষণ, অপরিকল্পিত কাঁচাপাকা রাস্তা নির্মাণ, অতিমাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার এবং মৎস্য প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র বিনষ্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষ ও অন্যান্য মাছ চাষের ক্ষেত্রে গুণগত মানসম্পন্ন চিংড়ি পোনা ও উৎপাদন সামগ্রীর অপ্রতুলতা, উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশগত অবক্ষয়, চিংড়ির রোগবালাই, ভূমির আন্তঃঘাত ব্যবহারের সংঘর্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে চিংড়ি চাষি ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের স্বল্পতা, সামগ্রিকভাবে মৎস্য উপখাতের উন্নয়নের পরিপন্থী। একই সাথে বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসম্পদ উন্নয়নে মাছের মজুদ সম্পর্কে যথাযথ তথ্য ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব, অবৈধ জালের ব্যবহার, উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণের অভাব ও সর্বোপরি আধুনিক মানসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও পরিবহনের অপ্রতুলতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দারিদ্র্য বিমোচনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যকে সামনে রেখে মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা ও আগামী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অনুসৃত নীতিমালার আলোকে আশুকরণীয় উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বিপুল জনগোষ্ঠীর উৎকৃষ্ট প্রাণিজ আমিষের যোগানের পাশাপাশি মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সব শ্রেণীর অভীষ্ট জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে রুপালীবিপ্লব সাধনে সম্মিলিত প্রচেষ্টা বিশেষভাবে জরুরি। মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে গতি সঞ্চারের জন্য হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব অবহিতকরণ, লাভজনক মাছ চাষের পাশাপাশি দেশীয় ছোট প্রজাতির মাছের চাষ ও সংরক্ষণ, মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে গণসচেতনতা বৃদ্ধি, নিরাপদ মৎস্য ও চিংড়ি সংরক্ষণ ও বিপণন, জলজ পরিবেশের উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে মৎস্য ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব দূরীকরণে কর্মকৌশল নির্ধারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন একান্তভাবেই কৃষিনির্ভর। দেশের মৎস্য ও চিংড়ি চাষ জাতীয় পুষ্টি নিরাপত্তা, গ্রামীণ কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাম্প্রতিককালে ব্যাপক অবদান রাখছে। এ ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় ও উপকূলীয় এলাকায় আধা-লবণাক্ত জলাশয়ে মৎস্য ও চিংড়ির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক লাগসই পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি প্রয়োগ করে মৎস্য ও চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে তা সংরক্ষণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা উন্নয়নের নিমিত্ত অভ্যন্তরীণ বাজার ও রপ্তানি বাণিজ্যে নিরাপদখাদ্য সরবরাহের বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনও জরুরি। দেশের সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এর উৎপাদন ও সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতিকে চাঙা করা যেতে পারে। সর্বোপরি মৎস্যখাতে সার্বিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষতা সাধন তথা মাছ ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং গ্রাম্য দরিদ্র মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধনই মৎস্যখাতের উন্নয়ন পরিকল্পনার মৌলিক কৌশল হিসেবে বিবেচ্য।

মৎস্যখাতের উন্নয়নে দক্ষিণাঞ্চল ও পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ

দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য, মৎস্য সেক্টরের সুষম উন্নয়ন তথা আধুনিক মৎস্য চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ, অব্যাহত প্রবৃদ্ধি অর্জন ইত্যাদি বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও সারাদেশে 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১১' উদ্‌যাপিত হচ্ছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় দক্ষিণাঞ্চলের অপার মৎস্যসম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও উন্নয়নের মাধ্যমে সিডর, আইল্যা কবলিত এ অঞ্চলও হতে পারে মৎস্য উৎপাদনের এক সম্ভাবনাময় চারণভূমি। কারণ বৈচিত্র্যতার দিক থেকে মৎস্যচাষের অনগ্রসর দক্ষিণাঞ্চলের আছে কতিপয় অনন্য বৈশিষ্ট্য যা সহজেই দেশের অন্য অঞ্চল থেকে এ এলাকাকে পৃথক ভাবে মহিমান্বিত করেছে।

উল্লেখ্য, এ অঞ্চলে রয়েছে স্বাদুপানি ও লোনা পানির বিশাল জল ভাণ্ডার। আছে পায়রা, বিষখালী, লোহালিয়া ও আন্ধার মানিকসহ অসংখ্য নদী, খাল ও বিল যা চিংড়িসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের গুরুত্বপূর্ণ আবাসভূমি। রয়েছে স্বাদু পানি, আধালবণাক্ত পানি ও সামুদ্রিক পরিবেশে বসবাসরত অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন বিভিন্ন প্রজাতির জলজপ্রাণী। আরো রয়েছে কুয়াকাটাসহ বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকা যা নানান প্রজাতির মৎস্যচাষ, আহরণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য এক অনন্য গবেষণার ক্ষেত্র। কিন্তু জলজসম্পদ ও বৈচিত্র্যতার দিক থেকে এত সমৃদ্ধশালী হওয়া সত্ত্বেও মাছ চাষের দিক থেকে দেশের এ এলাকা অত্যন্ত পশ্চাৎপদ হিসেবে চিহ্নিত। তাই এলাকার হতদরিদ্র মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মাঝে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো পৌঁছে দেয়া, আগামী প্রজন্মকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা ও বরিশাল, পটুয়াখালী তথা দক্ষিণাঞ্চলসহ সারা দেশের সামগ্রিক মৎস্য উন্নয়নকে সামনে রেখে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর মৎস্য বিজ্ঞানী ও গবেষক তৈরির লক্ষ্য নিয়ে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পবিপ্রবি) এর অধীনে মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ প্রতিষ্ঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত।

বয়সে নবীন (৩ বছর মাত্র) হলেও দক্ষিণাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জন্য সঙ্গত কারণেই মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের রয়েছে অনেক দায়বদ্ধতা। এরই ধারাবাকিতায় নবীন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন এ অনুষদটি ছাত্রছাত্রীদের আধুনিক জ্ঞানদানের

পাশাপশি সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। যেমন- উপকূলীয় এলাকার জনগোষ্ঠীকে মাছ চাষের আধুনিক কলাকৌশল প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সহায়তা প্রদান, দক্ষিণাঞ্চলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণার মাধ্যমে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন, মাঠ পর্যায়ে মাছ চাষের গবেষণার সুফলসমূহ কৃষকের কাছে পৌঁছে দেয়া, মাছ চাষের নতুন সমস্যার সমাধানের জন্য গবেষণা পরিচালনা করা, বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে অত্র এলাকার মৎস্য উন্নয়নে কাজ করা, বিভিন্ন প্রজাতির মাছের প্রজনন কৌশল উদ্ভাবনের সাথে উৎসাহিত চাষিগণকে সম্পৃক্ত করা এবং পায়রাসহ দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য নদীর ইলিশের প্রাচুর্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা চালানো ইত্যাদি।

ইতোমধ্যেই এ অনুষদ এবং ডেনমার্কের কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে সমাপ্ত ও চলমান কার্যক্রমসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

সমাপ্ত কার্যক্রম

- তেলাপিয়া পোনার বৃদ্ধির উপর বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের প্রভাব নিয়ে গবেষণা।
- বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের তিনটি পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতার তুলনামূলক গবেষণা।

চলমান কার্যক্রম

- বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরের ২১টি পুকুর সম্বলিত মাঠ গবেষণাগার ও মৎস্য হ্যাচারি নির্মাণ।
- তেলাপিয়া ও গলদা চিংড়ির সমন্বিত চাষ বিষয়ক গবেষণা।
- তেলাপিয়া ও পাঙ্গাসের সমন্বিত চাষ বিষয়ক গবেষণা।
- পুকুরে মাছ ও রাজহাঁসের সমন্বিত চাষ বিষয়ক গবেষণা।
- Conservation of Small Indigenous Species Biodiversity বিষয়ে গবেষণা।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী ১০০ জন মৎস্যচাষিকে চাহিদামাফিক প্রশিক্ষণ, উপকরণ সরবরাহসহ One stop Service প্রদান।

এছাড়াও কুয়াকাটায় একটি সমুদ্র গবেষণা কেন্দ্র কাম মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা আছে।

উন্নত চাষ পদ্ধতি, লাগসই প্রযুক্তি, টেকসই মৎস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা, সহনশীল মৎস্য আহরণ নীতিমালা এবং কার্যকর বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে আগামী দিনে দক্ষিণাঞ্চল তথা দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের জন্য মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। এ এলাকার সকল স্তরের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বাদু ও মিঠাপানিতে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন এবং উৎপাদন কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সহযোগী অধ্যাপক ও কোর্স সমন্বয়কারী
মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

হিমায়িত চিংড়ি শিল্পে শ্রম আইন ২০০৬ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি

এস এম ইসতিয়াক

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। প্রায় ১২ মিলিয়ন লোক মৎস্যখাতের সাথে জড়িত। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ খাতের রপ্তানি আয় প্রায় ৩৪০৮.৫২ কোটি টাকা যা জাতীয় রপ্তানি আয়ের প্রায় ২.৭%। বাংলাদেশের মৎস্যখাত খুবই সম্ভাবনাময় খাতগুলোর একটি, এমনকি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের জলমগ্ন স্থলভাগে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হলে মৎস্যখাতই হবে কৃষিজ উৎপাদনের বিকল্প সম্ভাবনাময় খাত। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর খাদ্যনিরাপত্তায় মৎস্যখাতের অবদান অপরিসীম। কিন্তু কারিগরি, নীতি নির্ধারণী, সামাজিকসহ বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতার কারণে এ শিল্প আজ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। চিংড়ি শিল্প মৎস্যখাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি করে এ শিল্প জাতীয় রপ্তানি আয়ের দ্বিতীয় স্থান অক্ষুন্ন রেখেছে। স্বাদু পানি ও লোণা পানির চিংড়ি চাষ করে ১১.৫০ লক্ষ দরিদ্রচাষি জীবিকা নির্বাহ করছে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে প্রায় ৬৩% হিমায়িত চিংড়ি ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে ও প্রায় ৩৪% যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত দেশসমূহ বাংলাদেশ থেকে হিমায়িত পণ্য আমদানিকালে খাদ্যনিরাপত্তা ও ট্রেসিবিলিটির বিষয়টি যেমন গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রও খাদ্যনিরাপত্তার পাশাপাশি সামাজিক ও শ্রম আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না সে বিষয়গুলোকে বিবেচনা করে থাকে।

জুন ২০০৭ সালে বাংলাদেশের চিংড়ি ও বস্ত্র শিল্পে শিশু শ্রম আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে এ বলে American Federation of Labor and Congress of Industrial Organization (AFL-CIO) যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে যে শুল্ক সুবিধা (GSP) যুক্তরাষ্ট্র দিয়ে থাকে তা বন্ধ করার জন্য সর্তকতা জারি করে এবং 'Degradation of Work: True Cost of Shrimp' নামক একটি প্রতিবেদন সিএনএন-এ প্রকাশ করে। ফলশ্রুতিতে যুক্তরাষ্ট্রে হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি বন্ধের উপক্রম হয়। পরবর্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ শ্রিম্প এন্ড ফিস ফাউন্ডেশন (বিএসএফএফ) এর প্রতক্ষ্য প্রচেষ্টায় সমস্যাটির সমাধান হয়। বিএসএফএফ ঐ সময়ে 'Of Shrimp and Cost, the other side' নামে একটি পুস্তিকা ও একটি ডকুমেন্টারি মুভি তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের কাছে পৌছায়। উক্ত পুস্তিকা ও মুভিতে বাংলাদেশের চিংড়ি শিল্পের কোনো পর্যায়েই বর্তমানে আর শিশু শ্রম নেই এ বিষয়টি ফুঁটে ওঠে। AFL-CIO কর্তৃক উল্লিখিত সমস্যাটির দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়িত্বশীল সমাধানকল্পে বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে 'Social Compliance Forum' নামে একটি কমিটি পরিচালিত হচ্ছে। পরবর্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, ফ্রোজেন ফুডস্ এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ শ্রিম্প এন্ড ফিস ফাউন্ডেশন প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় শ্রম আইন ২০০৬ প্রতিপালনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর উপর ভিত্তি করে 'চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানার জন্য প্রযোজ্য শিশু-কিশোর ও নারী শ্রম আইন' নামক সংকলনের প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভিক অংশে শ্রমিকের কর্মঘন্টা, কর্ম এলাকা, শিশু-কিশোরকে চিহ্নিত করা ও প্রসূতি কল্যাণ সুবিধার কথা স্পষ্ট করে বলা আছে। ঐ অংশে চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ করেনি এমন কোনো ব্যক্তিকে শিশু ও চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ করেছে কিন্তু আঠারো বৎসর বয়স পূর্ণ করেনি এমন ব্যক্তিকে কিশোর বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি শিরোনামে শ্রমিকদের শ্রেণীবিভাগ এবং শিক্ষানবিসিকাল, নিয়োগপত্র ও পরিচয় পত্র, সার্ভিস বই, শ্রমিক রেজিস্টার, টিকেট, কার্ড এবং ছুটির পদ্ধতির সম্পর্কে বিভিন্ন ধারা-উপধারায় বর্ণিত হয়েছে। কিশোর শ্রমিক নিয়োগ শিরোনামে তৃতীয় অধ্যায়ের বিভিন্ন ধারা-উপধারায় শিশু ও কিশোর নিয়োগে বাধা-নিষেধ, চাকরিতে সক্ষমতা প্রত্যয়নপত্র, বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির কাজে কিশোর নিয়োগ এবং কিশোরের কর্মঘন্টা সম্পর্কিত আইনসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। একই ভাবে মহিলা শ্রমিকের কর্মে নিয়োগ নিষিদ্ধ বিধি, প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা ও এর প্রাপ্তির অধিকার, মহিলা শ্রমিকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা ইত্যাদি আইন চতুর্থ অধ্যায়ের প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা অংশে বর্ণিত হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে কল্যাণমূলক ব্যবস্থা যেমন শিশু কক্ষ, নবম অধ্যায়ে দৈনিক, সাপ্তাহিক কর্মঘন্টা, বিভিন্ন প্রকার ছুটি, অধিককাল কর্মের জন্য অতিরিক্ত ভাতা ইত্যাদি বিধি এবং দশম অধ্যায়ে মজুরি ও এর পরিশোধ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায়/হ্যাচারি/ফিডমিল/ আইসপ্লান্টে কার্যভেদে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী যে সকল কাগজপত্র রেজিস্টার ও পলিসি ম্যানুয়াল থাকা বাধ্যতামূলক তা সারণি ১ ও ২ এ উপস্থাপন করা হল।

বাংলাদেশে ২০০৭ সাল থেকে চিংড়ি শিল্পে শ্রম আইন প্রতিপালনের লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য মৎস্য অধিদপ্তরকে সাথে নিয়ে বিএসএফএফ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন

সারণি-১: শ্রম আইনে সংরক্ষণযোগ্য রেজিস্টারের তালিকা

নং	রেজিস্টারের বিবরণ
১	নিয়োগ রেজিস্টার
২	জরিমানা রেজিস্টার
৩	ওভারটাইম রেজিস্টার
৪	মজুরির স্লিপ রেজিস্টার
৫	দুর্ঘটনা ও বিপজ্জনক দুর্ঘটনার রেজিস্টার
৬	শ্রমিক রেজিস্টার
৭	ছুটির রেজিস্টার
৮	নিয়োজিত শ্রমিক/কর্মচারীদের শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত বিবরণী
৯	মাতৃত্বকল্যাণ রেজিস্টার
১০	সবেতন ছুটির রেজিস্টার
১১	স্বাস্থ্য রেজিস্টার
১২	বেতন রেজিস্টার
১৩	হাজিরা রেজিস্টার
১৪	দিন মজুরি রেজিস্টার

সারণি-২: শ্রম আইনে সংরক্ষণযোগ্য রেকর্ডপত্রের তালিকা

নোট: উপরোক্ত ডকুমেন্টের অধিকাংশই ছাপানো অবস্থায় বাংলাবাজার, সদরঘাট এলাকার স্টেশনারি দোকানে পাওয়া যায়।

নং	পলিসি ম্যানুয়াল		অন্যান্য কাগজপত্র
১	সার্ভিস বুক	১	চাকরির বিজ্ঞপ্তি
২	কর্মঘণ্টা পলিসি	২	আবেদনপত্র
৩	শিশু শ্রম পলিসি	৩	স্বাস্থ্য সনদপত্র
৪	স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পলিসি	৪	বয়স প্রমাণের সনদপত্র
৫	নিয়োগ পলিসি	৫	ছবি সম্বলিত নিয়োগপত্র
		৬	যোগদান পত্র
		৭	ছবি সম্বলিত পরিচয়পত্র

করে আসছে। বিএসএফএফ খুলনা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের ১০টি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার মালিকদের শ্রম আইন প্রতিপালনের জন্য উপরে উল্লিখিত কাগজপত্রের ডকুমেন্টেশন করে দেয়। একই সাথে চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানার জন্য প্রযোজ্য শিশু-কিশোর ও নারী শ্রম আইন নামক ৩টি পুস্তিকা, ১ টি ফ্লিপচার্ট ও কয়েক প্রকারের পোস্টার প্রকাশ ও বিতরণ করে। পাশাপাশি গত বছর দুয়েক ধরে আরও কয়েকটি সংগঠন বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ প্রতিপালনে জন্য শ্রমিক এবং মালিকদের নিয়ে নানা রকম কর্মসূচি গ্রহণ করে যেমন বিভিন্ন প্রকার শ্রমিকদের তালিকা করা, শ্রমিকদের জীবনমান ও বসবাসের পরিবেশের উপর গবেষণা পরিচালনা, শ্রমিকদের নিয়ে সংগঠন করা উল্লেখযোগ্য। খুলনা অঞ্চলের চিংড়ি চাষিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'চিংড়িচাষি শ্রমিক কল্যাণ পরিষদ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং কয়েক হাজার শ্রমিককে পরিচয় পত্র সরবরাহ করেছে। বিকিউএসপি (বাংলাদেশ কোয়ালিটি সাপোর্ট প্রোগ্রাম) নামক একটি প্রকল্পের গবেষণায় দেখা যায় চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগে মধ্যস্থতাকারী প্রভাব বিস্তার করে থাকে যা খুলনা অঞ্চলের চেয়ে চট্টগাম অঞ্চলে বেশি পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের শ্রম পরিদপ্তর চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাগুলোতে শ্রমিক সংখ্যার উপর ভিত্তি করে 'ওয়ার্কার্স পারটিসিপেশনস কমিটি' গঠনের বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পরিচালিত `Social Compliance Forum' কারখানাগুলোতে শ্রমবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে পরামর্শ প্রদান ও কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করছে। ইতোমধ্যে সরকার বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর খসড়া বিধি প্রস্তুত করেছেন যা সরকারের অনুমোদন প্রক্রিয়ায় আছে।

বিএসএফএফইউ এসএআইডি/প্রাইস প্রকল্পের অর্থায়নে ১০টি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী আবশ্যকীয় রেকর্ডপত্র প্রণয়ন ও সংরক্ষণে সহযোগিতা প্রদান করেছে। পাশাপাশি ১০টি মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানার ৩৬৪ জন বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিক, মালিক ও কর্মকর্তাদের শ্রম আইন, ২০০৬ প্রতিপালন ও উপরোক্ত ডকুমেন্টের ব্যবহার সম্পর্কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। গত ২১ অক্টোবর ২০০৯ যুক্তরাষ্ট্রের ইউএসটিআর থেকে Mr. Michael Delaney, Assistant USTR, চট্টগ্রামের আর্ক সি ফুড চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় বিএসএফএফ কর্তৃক পরিচালিত মালিক ও শ্রমিকদের শ্রম আইন, ২০০৬ এর উপর সচেতনতা সৃষ্টির প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করেন। বিগত এপ্রিল মাসে বিএফএফইএ, মৎস্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ শ্রিম্প এন্ড ফিস ফাউন্ডেশন-এর ব্যবস্থাপনায় ইউএসএআইডি/প্রাইস প্রকল্পের আর্থিক সহযোগিতায় আয়োজিত "Labour Compliance in Shrimp Processing Industry" শীর্ষক সেমিনারে উক্ত সেক্টরে শ্রম আইন ২০০৬ বাস্তবায়নে ইতিবাচক চিত্র প্রতিফলিত হয়

চিংড়ি শিল্পের প্রতিটি পর্যায়ে শ্রম আইন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান ও এর প্রায়োগিক বিষয়ে সকলকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা হলে ভবিষ্যতে এ শিল্পের প্রতি পর্যায়ে নিযুক্ত সকল স্তরের শ্রমিকের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিত হবে। বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন ও মৎস্য বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শ্রম আইন বাস্তবায়নে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

চীফ অফ প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ শ্রিম্প এন্ড ফিস ফাউন্ডেশন

মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি এবং দূষণ প্রতিরোধে মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ : ঢাকা ল্যাবরেটরির ভূমিকা

মোঃ মানিক মিয়া[১], মোঃ বেলাল হোসেন[২] ও মোহাম্মদ মাকসুদুল হক ভূঁইয়া[৩]

১৯৮০ সালে মৎস্য অধিদপ্তরাধীন মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে সময়ের চাহিদা অনুসারে সেবা প্রদান করার পাশাপাশি এর ব্যাপক আঙ্গিক প্রসার ঘটেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালে মাইক্রোবায়োলজিক্যাল এবং ২০০৭ সালে কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা লাভের মধ্যে দিয়ে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যে যথাক্রমে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ও ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদানের উপস্থিতি পরীক্ষার মাধ্যমে দেশের অন্যতম রপ্তানি পণ্য হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্য রপ্তানি বাণিজ্যে সহায়তা করে আসছে। আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষ করে ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, রাশিয়া, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি উন্নত দেশে সি ফুড (sea food) হিসেবে চিংড়ির উচ্চ চাহিদার পাশাপাশি মূল্যও বেশ আকর্ষণীয়। তবে কোন খাদ্যদ্রব্য জীবাণুমুক্ত কিনা এবং তার মধ্যে ক্ষতিকারক কোন রাসায়নিক পদার্থ আছে কিনা, এসব ব্যাপারে দেশগুলোর ভোক্তারা খুবই সচেতন। কোনো দেশের রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য প্রবেশবন্দরে নমুনা পরীক্ষায় জীবাণু ও রাসায়নিক দূষণের অনুমোদিত মাত্রার অধিক শনাক্ত হলে সেসব খাদ্যদ্রব্য আমদানিকারক দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা আছে। আগের তুলনায় বিদেশি ক্রেতারা খাদ্য নিরাপত্তার ব্যাপারে আরো বেশি সচেতন হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ তুলনামূলক বেশি সংবেদনশীল। তারা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন খাদ্য নিরাপত্তা মানদণ্ড (Food Safety Standard) আরোপ করাসহ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি পরীক্ষণের জন্য রপ্তানিকারক দেশসমূহকে শর্তারোপ করে আসছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের চিংড়ির একক বৃহত্তম ক্রেতাদেশ হওয়ায় সময় সময় তাদের আরোপিত শর্তাদি পূরণ অপরিহার্য। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের ল্যাবরেটরিসমূহের মান উন্নয়নের জন্য সরকার অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষত, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, ঢাকা ল্যাবরেটরি রপ্তানিকারকদের রপ্তানিযোগ্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্য, জাতীয় রেসিডিউ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা (NRCP)-এর আওতায় সংগৃহীত নমুনা এবং মৎস্য সেক্টরের সহায়ক খাদ্য উৎপাদন কারখানা কর্তৃক প্রেরীত নমুনায় বিভিন্ন প্রকার দূষণের উপস্থিতি পরীক্ষণের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে আসছে।

ল্যাবরেটরি কাজের পরিধি

কাজের ধরন অনুসারে মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, ঢাকা ল্যাবরেটরি মাইক্রোবায়োলজিক্যাল এবং কেমিক্যাল দুটি অংশে বিভক্ত।

মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ল্যাবরেটরি

ভোক্তার স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিধানকল্পে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যে বিভিন্ন প্যাথজেনিক ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি এ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়। বর্তমানে মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে প্যাথজেনিক দূষণ পরীক্ষার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও validated ISO মেথড অনুসরণ করা হচ্ছে। এ ল্যাবরেটরি কর্তৃক নিম্নোক্ত পরীক্ষাসমূহের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা প্রদান করা হয়-

১. Standard Plate Count (SPC)
২. মোট কলিফর্ম (Total Coliform)
৩. ফিক্যাল কলিফর্ম (Faecal coliform)
৪. স্যালমোনেলা (*Salmonella* sp.)
৫. ভিবরিও কলেরা (*Vibrio cholera*)
৬.ভিবরিও প্যারাহিমোলাইটিকাস (*Vibrio parahaemolyticus*)
৭. জলীয় ভাগ (Moisture test)

বিগত ২০১০ সালে মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, ঢাকা-এর মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে প্রক্রিয়াকৃত মৎস্যপণ্যের ১৫৩টি কনসাইনমেন্ট হতে সংগৃহীত নমুনার পরীক্ষায় ৭.১৯% কনসাইনমেন্টে প্যাথজেনিক দূষণ নির্ণীত হয়। সাধারণত মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তরের আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পণ্য রপ্তানির স্বাস্থ্যকরত্ব (Salubrity certificate) সনদ প্রদান করে থাকে, যার ভিত্তিতে রপ্তানিকারকগণ মান সম্মত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে থাকেন।

কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি

২০০৭ সালের পূর্বে মৎস্য পণ্যে এন্টিবায়োটিকের উপস্থিতি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সিঙ্গাপুরের পিএসবি ল্যাবরেটরির সহযোগিতা নেয়া হত। কিন্তু ২০০৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে বাংলাদেশের মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, ঢাকা ল্যাবরেটরিতে LC-MS/MS মেশিন স্থাপিত হওয়ার পর থেকে আর কোন বিদেশি ল্যাবরেটরিতে পণ্য পাঠানোর প্রয়োজন হয়নি। বাংলাদেশের প্রথম স্থাপিত LC-MS/MS মেশিন যার মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করে নাইট্রোফিউরান মেটাবোলাইটস (AMOZ, AOZ, AHD, SEM) ক্লোরামফেনিক্যাল এবং রঞ্জক পদার্থ (মেলাকাইট গ্রিন, লিউকো মেলাকাইট গ্রিন, ক্রিস্টাল ভায়োলেট, লিইকো ক্রিস্টাল ভায়োলেট) এর মত মানব স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক উপাদানের উপস্থিতি Parts Per Billion (ppb) মাত্রায় শনাক্ত করা হয়।

বর্তমানে মৎস্যপণ্য রপ্তানিতে যে সব পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তার সিংহভাগ পরীক্ষাই মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, ঢাকা ল্যাবরেটরি সম্পন্ন করে থাকে। বর্তমানে এ ল্যাবরেটরিতে স্থাপিত দুটি LC-MS/MS মেশিন দিয়ে সারাদেশের রপ্তানিযোগ্য চিংড়ি ও অন্যান্য নমুনার রাসায়নিক উপাদান শনাক্তকরণের কাজ চলছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে আরো দুটি অত্যাধুনিক মানের LC-MS/MS মেশিন অত্র ল্যাবরেটরিতে স্থাপনের কাজ চলছে যা ল্যাবরেটরির পরীক্ষা কার্যক্রমের পরিধি ও গতি বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্র

রপ্তানিপূর্ব নমুনা: বাংলাদেশ থেকে হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানির ক্ষেত্রে পণ্যের রাসায়নিক দূষণ পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। ইউরোপীয় ইউনিয়নের চাহিদা মোতাবেক প্রতি কনসাইনমেন্টের সংগৃহীত নমুনায় ক্লোরামফেনিক্যাল, নাইট্রোফিউরান মেটাবোলাইটস (AMOZ, AOZ, AHD, SEM) রঞ্জক পদার্থ (ম্যালাকাইট গ্রিন, লিউকো ম্যালাকাইট গ্রিন, ক্রিস্টাল ভায়োলেট, লিইকো ক্রিস্টাল ভায়োলেট) এবং টেট্রাসাইক্লিন-এর উপস্থিতি পরীক্ষা করতে হয়। রাশিয়াতে রপ্তানিতব্য পণ্যের ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত রাসায়নিক পরীক্ষাসমূহের অতিরিক্ত এনথালমিনটিক্স (ফ্লুবেনডাজল) এর উপস্থিতি পরীক্ষা করা অপরিহার্য। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ শিল্প বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ (BCSIR) এর ল্যাবরেটরি কর্তৃক টেট্রাসাইক্লিনের উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়। উক্ত পরীক্ষাসমূহের সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে মৎস্য পণ্যে রপ্তানির স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ প্রদান করা হয়ে থাকে।

জাতীয় রেসিডিউ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা (NRCP)-**এর আওতাভুক্ত নমুনা:** হিমায়িত মৎস্যপণ্যের আমদানীকারক দেশসমূহের চাহিদা মোতাবেক আমাদের দেশে NRCP বাস্তবায়ন করা হয়। রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের বেশিরভাগ দূষণ বিশেষ করে রাসায়নিক দূষণ উৎপাদন পর্যায়ে হয়ে থাকে। উৎপাদন ক্ষেত্রে তথা খামারে চাষকৃত মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের রাসায়নিক দূষণ মনিটরিং করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে পলিসি গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ গাইডলাইনের আওতায় মৎস্য অধিদপ্তর প্রতিবছর ন্যাশনাল রেসিডিউ কন্ট্রোল প্ল্যান (NRCP) অনুমোদন ও বাস্তবায়ন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদন প্রেরণ করে থাকে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে কোনো মৎস্য, মৎস্যখাদ্যে কিংবা মাছ ও চিংড়ি চাষের পানিতে অননুমোদিত ভেটেরিনারি মেডিসিনাল প্রোডাক্ট, নাইট্রোফিউরান ও ক্লোরামফেনিক্যাল একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। আর কিছু উপাদানের (Permitted substances) উপস্থিতির মাত্রা পণ্যে গ্রহণযোগ্য সীমার অতিরিক্ত জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপদজনক। মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসহ ঢাকাস্থ আরো কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ল্যাবরেটরিতে রপ্তানিপূর্ব নমুনা এবং NRCP-এর আওতায় নির্ধারিত নমুনায় নিম্নলিখিত প্যারামিটারসমূহের উপস্থিতি সফলভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে-

FIQC ঢাকা ল্যাবরেটরির মান ও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা

রপ্তানিকারক দেশের ল্যাবরেটরিগুলো যথাযথভাবে পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে কিনা তা নিরীক্ষার জন্য ইতোমধ্যে বেশ কয়েকবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের ফুড এন্ড ভেটেরিনারি অফিস (FVO) কর্তৃক প্রেরীত দক্ষ উচ্চক্ষমতা

বিগত দুই বছরে FIQC ঢাকা ল্যাবরেটরিতে নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা নিচের সারণিতে দেখানো হল

ক্রমিক নং	টেস্ট প্যারামিটারের নাম	মোট নমুনার পরীক্ষা সংখ্যা-২০০৯		মোট নমুনার পরীক্ষা সংখ্যা-২০১০	
		প্রি-এক্সপোর্ট নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা	NRCP নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা	প্রি-এক্সপোর্ট নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা	NRCP নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা
১	ক্লোরামফেনিক্যাল	৩০৬০	৪০২	৩১২৬	৩৪৪
২	নাইট্রোফিউরান মেটাবলাইটস				
	- AMOZ	৩০৬০	৪০২	৩১২৬	৩৪৪
	- AOZ	৩০৬০	৪০২	৩১২৬	৩৪৪
	- AHD	৩০৬০	৪০২	৩১২৬	৩৪৪
	- SEM	৩০৬০	৪০২	৩১২৬	৩৪৪
৩	রঞ্জক পদার্থ (Dyes)				
	-মেলাকাইট গ্রিন	৩০৬০	১১৬	৩১২৬	৬৯
	-লিউকো মেলাকাইট গ্রিন	২৫৮৫	১১৬	৩১২৬	৬৯
	-ক্রিস্টাল ভায়োলেট	৩০৬০	১১৬	৩১২৬	৬৯
	-লিইকো ক্রিস্টাল ভায়োলেট	২৫৮৫	১১৬	৩১২৬	৬৯
৪।	ফ্লুবেনডাজল	৯৬	১৪৬	৪০	১৫৮
	মোট টেস্টের সংখ্যা	২৮,৯৫৮টি		৩০,৩২৮টি	

ছবি-১: FIQC ঢাকা ল্যাবের LC-MS/MS মেশিন-০১

ছবি-১: FIQC ঢাকা ল্যাবের LC-MS/MS মেশিন-০২

সম্পন্ন মিশন দলের মাধ্যমে উক্ত ল্যাবরেটরির কর্মকাণ্ড পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে এবং জানুয়ারি ২০১০ এর প্রতিবেদনে উক্ত ল্যাবরেটরির মানোন্নয়নে প্রায় ৫ দফা সুপারিশ করা হয়। উক্ত সুপারিশমালার আলোকে বিগত এক বছরে ল্যাবরেটরি সংশ্লিষ্ট সকলের তত্ত্বাবধানে ল্যাবরেটরিতে কর্মরত কর্মকর্তাগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টায় প্রায় শতভাগ উন্নয়ন সাধিত হয়। ফলশ্রুতিতে ২০১১ সালের মাচ মাসে উক্ত ল্যাবরেটরি আবারও FVO অডিট টিম কর্তৃক পরিদর্শিত হয় এবং ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত সকল LC-MS/MS মেশিনে মেথড ভেলিডেশন সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড ও উপাত্তসমূহ সন্তোষজনক বলে স্বীকৃতি পায়। অডিট টিম তাঁদের প্রতিবেদনে ল্যাবরেটরির সকল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এখন এ ল্যাবরেটরিতে পরিচালিত সকল পরীক্ষার গুনগতমান অক্ষুণ্ন রেখে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে Accreditation করার প্রচেষ্টা চলছে। ঢাকাস্থ FIQC কেমিক্যাল ল্যাবরেটরির দক্ষ অফিসারগণ বিদেশের বিভিন্ন খ্যাতিমান ল্যাবরেটরিতে LC-MS/MS মেশিন দ্বারা খাদ্যের রাসায়নিক দূষণ শনাক্ত করার জন্য উচ্চতর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ও আন্তর্জাতিকভাবে কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি এক্সপার্ট দ্বারা ঢাকা ল্যাবরেটরিতে হাতে-কলমে প্রশিক্ষিত করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

ল্যাবরেটরির মানোন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

১. ল্যাবরেটরি পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা হয়েছে।
২. প্রয়োজন অনুসারে দেশি ও বিদেশি বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
৩. চাহিদা অনুসারে নতুন নতুন উপযোগী যন্ত্রপাতি ল্যাবরেটরিতে সংযোজিত হচ্ছে।
৪. LC-MS/MS মেশিনে ব্যবহৃত বিভিন্ন মেথডসমূহের ভেলিডেশন করা হয়েছে।
৫. সুষ্ঠুভাবে ল্যাবরেটরি পরিচালনার জন্য ISO ১৭০২৫ অনুসরণ করে কোয়ালিটি ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হয়েছে।
৬. ল্যাবরেটরির কাজের গুণগতমান যাচাইয়ের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যুক্তরাজ্যভিত্তিক FAPAS এর সাথে ফলাফল ক্রস চেকিং এর জন্য Proficiency Test-এ অংশগ্রহণ করা হচ্ছে।
৭. ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে Accreditation প্রক্রিয়া বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
৮. বর্তমানে মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, ঢাকা ল্যাবরেটরির ভবিষ্যৎ গুরুত্ব ও কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি বিবেচনায় একটি আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত (BEST) প্রকল্প কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

ল্যাবরেটরি উন্নয়নে সুপারিশমালা

ল্যাবরেটরির সকল কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহের দিকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন-

১. ISO 17025 অনুসরণে অর্গানোগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা এবং একটি ক্যারিয়ার প্লান বাস্তবায়ন করা।
২. ল্যাবরেটরির জন্য পৃথক ক্রয় নীতিমালা প্রণয়ন।
৩. ল্যাবরেটরির কাজের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের আরো বেশি দক্ষতা অর্জন ও কারিগরি জ্ঞানের আদান-প্রদানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, সেমিনারে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৪. ল্যাবরেটরি কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ঝুঁকিভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা অথবা বিশেষ প্রণোদনা সুবিধা প্রদান করা।

পরিশেষে বলা যায়, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ঢাকা ল্যাবরেটরি মৎস্য পণ্যে দূষণের উপস্থিতি শনাক্তকরণের মধ্য দিয়ে মৎস্য ও মৎস্য পণ্য রপ্তানি ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় NRCP বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিরসন করে সময়ের সাথে ল্যাবরেটরির কর্মকাণ্ডকে আরো গতিশীল ও সুষ্ঠুভাবে নমুনা পরীক্ষা করে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি বাণিজ্যে সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে এ ল্যাবরেটরি সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

১. মৎস্য ও পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, ঢাকা
২. বায়োকেমিস্ট, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, ঢাকা
৩. মাইক্রোবায়োলজিস্ট, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, ঢাকা

বঙ্গোপসাগরে হাঙ্গরের বর্তমান অবস্থা এবং এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব

বিক্রম জীৎ রায়

বঙ্গোপসাগরে হাঙ্গর বাণিজ্যিকভাবে আহরিত না হলেও এটি একটি অপ্রচলিত পণ্য হিসেবে বিদেশে রপ্তানি হয়। স্থানীয় বাজারে হাঙ্গরের খুব একটা চাহিদা না থাকায় এসম্পদ আহরণের তেমন নির্ভরযোগ্য তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। হাঙ্গরের পাখনা রপ্তানির সীমিত তথ্য থাকলেও এর অন্যবিধ আর্থিক গুরুত্ব বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্তের স্বল্পতা রয়েছে। তবে বিগত দশকে সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক হাঙ্গর সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করায় হাঙ্গর আহরণ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। সাম্প্রতিক সময় বহির্বিশ্বে হাঙ্গরের বিভিন্ন প্রজাতির পাখনা, চামড়া ইত্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এর আহরণ মাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বঙ্গোপসাগরে প্রাপ্ত হাঙ্গর প্রজাতি

বঙ্গোপসাগরের একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় ৬৩ প্রজাতির হাঙ্গর, স্কেটস ও রে এর উপস্থিতি রয়েছে (Dey, ১৯৮১)। সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, চট্টগ্রাম কর্তৃক এপ্রিল ২০০৬ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত সময়কালে হাঙ্গর আহরণ ও প্রাপ্তির নিরিখে বঙ্গোপসাগরে সর্বমোট ২৭ প্রজাতির হাঙ্গর এবং হাউস শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

বঙ্গোপসাগরে নিম্নোক্ত প্রজাতির হাঙ্গর ও হাউস উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আহরিত হচ্ছে:

প্রজাতির নাম	ইংরেজি নাম	স্থানীয় নাম
Scoliodon laticaudus	*Yellow dog shark*	টুইট্যা হাঙ্গর
Rhizoprionodon acutus	*Milk shark*	কামোট হাঙ্গর
Sphyrna zygaena	*Hammerhead shark*	হাতুড়ী হাঙ্গর
Himantura bleekeri	*Whiptail sting ray*	হাউস / শাপলা পাতা
Himantura undulata	*Leopard whip ray*	বাঘা হাউস/চিতা হাউস
Gymnura poecilura	*Longtail butterfly ray*	প্রজাপতি হাউস
Mobula diabolus	*Davil ray*	বাদুড় হাউস
Rhinobatos granulatus	*shovelnose ray*	পিতাম্বরী

হাঙ্গর আহরণ এলাকা

বঙ্গোপসাগরের সোনাদিয়া দ্বীপের পশ্চিমে সোনারচর, ঢালচর, দুবলারচরের আশেপাশে, মহীপুরের দক্ষিণাংশ এবং সেন্ট-মার্টিন দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ হতে হাঙ্গর আহরণ করা হয়। আর্টিসেনাল ফিসারিতে আহরিত হাঙ্গর এবং হাউস মূলত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়। কিন্তু চিংড়ি ট্রলে (চিংড়ি জাল) ধৃত ছোট বা অপ্রাপ্তবয়স্ক হাউসসমূহ আহরিত হলেও তা বাজারজাত করা হয় না। আকারে ছোট হাঙ্গরের বাজার না থাকায় তা ট্রলার কর্তৃক ট্রাশ হিসেবে সাগরে ফেলে দেয়া হয়।

আহরণ পদ্ধতি ও সরঞ্জামাদি

বঙ্গোপসাগরে প্রায় ১৫০-২০০টি যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে হাঙ্গর আহরণ করা হয়। হাঙ্গর আহরণে নিয়োজিত মৎস্য নৌযানগুলোর ক্ষমতা ৩০-৬৫ অশ্বশক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকে যেগুলো সাধারণত ৪০ মিটার গভীরতার মধ্যে জাল ও বড়শির সাহায্যে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার সাগর উপকূলে হাঙ্গর আহরণ করে থাকে। সাধারণত হাঙ্গর জাল দ্বারা (রূপান্তরিত ফাঁস জাল) বাণিজ্যিকভাবে আহরণ করা হয়। এ জালের দৈর্ঘ্য ১৫০০-৩০০০ মিটার এবং ফাঁসের আকার ৪৫০ মিমি যা ১২ থেকে ১৩ জন মৎস্যজীবী সহযোগে যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের মাধ্যমে হাঙ্গর শিকার করে থাকে। এছাড়া হাঙ্গর শিকারের জন্য লোহার বড়শিও ব্যবহৃত হয়। তবে হাউস শিকারের জন্য বড়শি, বেহুন্দি ও ট্রামেল জাল ব্যবহৃত হয়।

হাঙ্গর ও হাউস আহরণ মৌসুম

সাধারণত প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত হাউস শিকার বা আহরণ করা হয়। হাঙ্গর ধরার মৌসুম মূলত নভেম্বর মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত। প্রতিটি মৎস্য নৌযান হাঙ্গর আহরণের জন্য মাসে গড়ে ১৪ থেকে ১৬ দিন সাগরে অবস্থান করে। আহরিত হাঙ্গরসমূহ চট্টগ্রামস্থ ফিসারিঘাট, কক্সবাজারস্থ বিএফডিসি ঘাট, পটুয়াখালীস্থ কুয়াকাটা, আলীপুর ও মহীপুর এবং বরগুনাস্থ পাথরঘাটা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রসমূহে অবতরণ এবং বাজারজাত করে থাকে। তবে অধিকাংশ হাঙ্গর ও হাউস কক্সবাজার এবং চট্টগ্রামে বাজারজাত করা হয়।

বাৎসরিক উৎপাদন/আহরণ

বাংলাদেশে ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরে ৪৭৯০ মে.টন, ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে ৪৭৬৭ মে.টন ও ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ৩৯৩৩ মে.টন পরিমাণ বিভিন্ন প্রজাতির হাঙ্গর ও হাউস আহরিত হয়েছে যা দেশের সর্বমোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় শতকরা ০.১৫ ভাগ এবং সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনের শতকরা প্রায় ১.০০ ভাগ। পৃথিবীর প্রধান হাঙ্গর আহরণকারী দেশসমূহ হচ্ছে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ফ্রান্স, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইটালি, জাপান, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ,

মেক্সিকো, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, পর্তুগাল, দক্ষিণ কোরিয়া, স্পেন, শ্রীলংকা, তাইওয়ান, ইংল্যান্ড ও আমেরিকা। এ সকল দেশে বছরে প্রায় ১০,০০০ মে.টন হাঙ্গর আহরিত হয়। সংখ্যা হিসেবে প্রায় ২৬ মিলিয়নেরও বেশি হাঙ্গর আহরিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট, সামুদ্রিক কেন্দ্র কর্তৃক সাম্প্রতিক এক গবেষণায় (২০১০-১১) আহরিত ও অবতরণকৃত হাঙ্গর ফিসারির মধ্যে ৮২.২৩% হাউস, ১৪% হাঙ্গর ও অবশিষ্ট ৩.৭৭% স্কেটস পাওয়া গেছে।

হাঙ্গরের ব্যবহার

বর্তমানে হাঙ্গর ও হাউসের দেহের সকল অঙ্গই ব্যবহৃত হচ্ছে। হাঙ্গর ও হাউস তাজা অবস্থায় ও শুকিয়ে শুটকি তৈরি করে বাজারজাত করা হচ্ছে। হিন্দু ও উপজাতীয় সম্প্রদায়ের লোকজন হাঙ্গর ও হাউসের মাংস তাজা, শুটকি, ধূমায়িত বা লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। হাউসের ১টি প্রজাতির (*Himantura bleekeri*) মাংস লক্ষ্মীপুর ও বরিশাল জেলার হিন্দু ও উপজাতি সম্প্রদায় বেশি পছন্দ করে।

হাঙ্গর ও হাউসের মাংস ধূমায়িত ও শুটকি তৈরি করে স্বল্প পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। হাঙ্গরের পাখনার সেট (৫টি) ছোট আকারের হলে লবণ দিয়ে ও বড় আকারের হলে শুকিয়ে এবং হাউস মাছের পিঠের চামড়া লবণ দিয়ে বা বেশির ভাগ শুকিয়ে এবং দাঁত ও চোয়ালের হাড় শুকিয়ে বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে। হাঙ্গরের পাখনা দিয়ে তৈরি স্যুপ বহির্বিশ্বে অত্যন্ত উপাদেয় ও সমাদৃত যা হংকং, তাইওয়ান ও চীন দেশে অভিজাত হোটেলে খাবার হিসেবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশেষ করে বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। হাঙ্গরের পাখনায় মার্কারি নামক উপাদান থাকায় অভিজাত পরিবারের নবদম্পতিকে হাঙ্গরের পাখনার স্যুপ খাওয়ানো হয়। হাঙ্গরের লিভার ও নাড়িভুঁড়ি থেকে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ তৈল সংগ্রহ করে তা পোল্ট্রি শিল্পে, রং কারখানায়, বার্নিশ ও কসমেটিক্স ও ঔষধ শিল্পে, ট্যানারিতে চামড়া রিফাইন্ড (নরম করতে) ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া দুর্গম অঞ্চলের লোকজন রাতে আলো জ্বালানোর কাজেও এ তৈল ব্যবহার করে আসছে। কামোট, বলি হাঙ্গর (bull shark)-এর চামড়া দিয়ে কাঠ মসৃণ করার দামি শিরিষ (sand paper) কাগজ তৈরি করা হয়। হাঙ্গরের পিঠের চামড়া স্থানীয়ভাবে বাদ্যযন্ত্র এবং বিদেশে হ্যান্ডব্যাগ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। বাঘা হাঙ্গর ও চিতা হাউস-এর চামড়া দিয়ে মানিব্যাগ ও দামি লেডিস ব্যাগ তৈরি করা হয়। হাঙ্গরের চোয়ালসহ দাঁত বিভিন্ন জুয়েলারি সামগ্রী ও শো-পিস হিসেবে এবং মুখের হাড় কসমেটিক্স শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া হাউসের লেজ পার্বত্য অঞ্চলের লোকজন চাবুক তৈরি করার কাজে ব্যবহার করে।

বাজারজাতকরণ

হাঙ্গর তাজা, শুটকি ও এর বিভিন্ন উপাঙ্গ প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বাজারজাতকরণ হয়ে থাকে। দেশীয় বাজারের মধ্যে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, সিলেট, বরিশাল, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পটুয়াখালী এলাকায় হাঙ্গরের সীমিত চাহিদা ও বাজার রয়েছে। হাঙ্গরের চেয়ে হাউসের মাংসের চাহিদা অধিক থাকায় এর তুলনামূলক দামও বেশি। হাঙ্গরের চামড়া কাঁচা অবস্থায় আকার ভেদে প্রতি পিস ১০০.০০ থেকে ২০০.০০ টাকায় বিক্রি হয়ে থাকে।

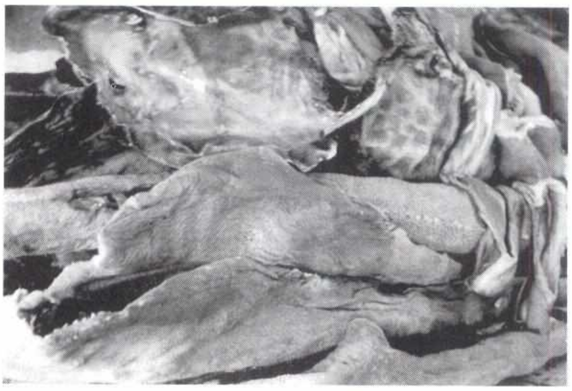

ছবি: হাঙ্গর ও হাউস এর শুকনা চামড়া

হাউস মাছের পিঠের চামড়া কাঁচা অবস্থায় আকার ভেদে প্রতি পিস ২০০.০০ থেকে ৩০০.০০ টাকায় বিক্রি হয়ে থাকে। শুকনো অবস্থায় প্রতি কেজি ১০০০.০০ টাকা দরে বিক্রি হয় এবং কাঁচা অবস্থায় লবণ দিয়ে প্রতি পিস ৩০০.০০ থেকে ৫০০.০০ টাকায় বিক্রি হয়ে থাকে। চিতা হাউসের (*Himantura undulata*) পৃষ্ঠীয় অংশের চামড়ার দাম অন্যান্য হাউসের তুলনায় তুলনামূলকভাবে বেশি। প্রতি পিস আকার ভেদে ৪০০.০০ থেকে ৬০০.০০ টাকায় বিক্রি হয়ে থাকে। হাঙ্গর ও হাউসের চামড়া বিদেশে রপ্তানি হয়। হাঙ্গরের দাঁত আলাদা শুকনো অবস্থায় প্রতি কেজি ১৫,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে থাকে। তবে ছোট আকারের প্রতি কেজি ৭০০.০০ থেকে ৮০০.০০ টাকায় বিক্রি হয়। এছাড়া চোয়ালসহ দাঁত শুকিয়ে প্রতি কেজি ২০০০.০০ থেকে ২৫০০.০০ টাকা দরে বিক্রি হয় এবং বিদেশে রপ্তানি হয়। মুখের হাড় ভালভাবে ধুয়ে শুকিয়ে প্রতি কেজি ১৪০.০০ থেকে ১৫০.০০ টাকা দরে বিক্রি হয়।

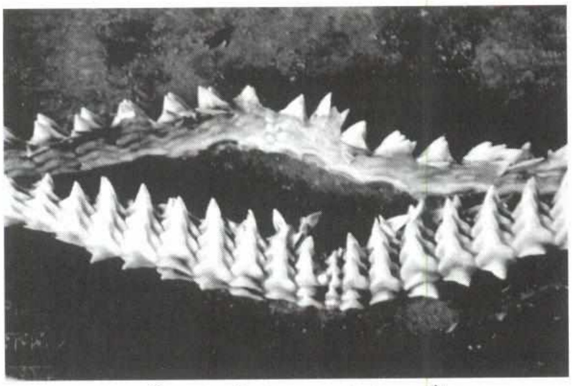

ছবি: কামোট হাঙ্গরের চোয়ালসহ দাঁত

হাঙ্গরের পাখনা প্রতি সেট (৫টি: ১টি পৃষ্ঠীয়, ২টি বক্ষীয়, ১টি পায়ুস্থ এবং ১টি লেজের পাখনা) শুকানো ও কাঁচা অবস্থায় বিক্রি হয়। শুকানো অবস্থায় ৫০ সেমি পর্যন্ত আকারের প্রতি কেজি ১১,০০০.০০ থেকে ১২,০০০.০০ টাকা দরে বিক্রি হয়। হাঙ্গরের লিভার হতে সংগৃহীত তৈল প্রতি ব্যারেল ১০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়।

ছবি: হাঙ্গরের পাখনা

হাঙ্গরের মাংস তাজা, শুটকি বা ধুমায়িত অবস্থায় এবং হাঙ্গরের পাখনা, হাউসের পিঠের চামড়া, চোয়ালসহ দাঁত ও লিভারের তৈল বিদেশে রপ্তানি হয়। হাঙ্গরের মাংস প্রধানত মায়ানমারে রপ্তানি হয়ে থাকে। এছাড়া পাখনা হংকং, চায়না ও সিঙ্গাপুর রপ্তানি হয়ে থাকে যা পরবর্তীতে আমেরিকা, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, কোরিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে বাজারজাত করা হয়। হাউসের পিঠের চামড়া চীন, হংকং ও থাইল্যান্ড এবং চোয়ালসহ দাঁত চীন ও কোরিয়ায় রপ্তানি হয়। এছাড়া, লিভার হতে সংগৃহীত তৈল মায়ানমার ও থাইল্যান্ডে রপ্তানি হয়। বাঘা হাঙ্গর, বলি হাঙ্গর ও কামোট হাঙ্গরের চামড়া এবং হাড় থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরে রপ্তানি হয়। মুখের হাড় মায়ানমারে রপ্তানি হয়। ১০ সেমি থেকে ১৫ সেমি এর অধিক আকারের হাঙ্গরের পাখনা সেট হিসেবে বিদেশে রপ্তানি হয়। সাধারণত Carcharhinidae পরিবারভুক্ত হাঙ্গরসমূহের পাখনার বাজার দর অত্যন্ত বেশি। ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরে পাখনা ও হাঙ্গরের বিভিন্ন সামগ্রী রপ্তানি করে ৪.১১ কোটি টাকা এবং ২০০৭-২০০৮ ও ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে যথাক্রমে ১.৮২ কোটি টাকা ও ১.৭৭ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে।

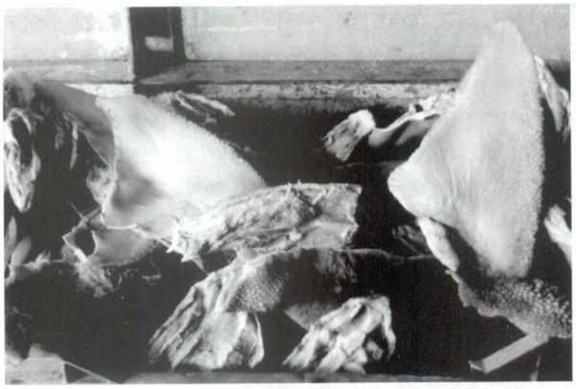

ছবি: রপ্তানির জন্য প্রস্তুতকৃত শুকনো পাখনা

বাংলাদেশের বিভিন্ন মোহনা কিংবা সাগরের মৎস্যসম্পদ আহরণের একক ফিসারি হিসেবে হাঙ্গর ফিসারি ইদানিং নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে। হাঙ্গরের আহরণ ও বাজারজাতকরণ হলেও এর ব্যবস্থাপনায় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। একটি টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। হাঙ্গরের প্রজনন পরিপক্কতা দেরীতে এবং নতুন প্রজন্মও সংখ্যায় কম হয়। তাই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্ভাবনাময় এ ফিসারিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা এখন সময়ের দাবী। হাঙ্গর ফিসারির ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণে সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক সমন্বিত জরিপ ও গবেষণা পরিচালনা করা যায়।

বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, চট্টগ্রাম

হাওর ও উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন এবং এদের সংরক্ষণ

ড. সৈয়দ আলী আজহার

হাওর নিজে উন্মুক্ত জলাশয়ের অন্তর্ভুক্ত। হাওর অঞ্চলের প্লাবনভূমিসহ মুক্ত জলাশয়গুলো প্রাকৃতিক মাছের এক বিশাল প্রজনন ক্ষেত্র। জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এক সময়ের মৎস্য ভাণ্ডার বলে খ্যাত হাওরের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। মাছের প্রাকৃতিক প্রজননের সুযোগ সৃষ্টিতে সারাদেশের মুক্ত জলাশয়গুলোর ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। উল্লেখযোগ্য, আমরা ভিশন-২০২১ এ মাছ উৎপাদনের এক উচ্চাভিলাষি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। তবে এটা ঠিক যে উচ্চাভিলাষ না থাকলে মিশনের ভিশন অর্জন করা দুরূহ হয়ে পড়ে। একই সাথে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন এবং জনগণের খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা। এ কাজটি কি যে কঠিন এবং দুরূহ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে মানুষ আশরাফুল মখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের কাছে কিছুই অসাধ্য নয়। তাই ২০২১ সালে দেশের প্রক্ষেপিত ১৭.১১ কোটি মানুষের প্রক্ষেপিত মৎস্য চাহিদার ৩৯.১০ মে.টন এবং প্রক্ষেপিত ৪১.৩৯ মে.টন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা মানুষের জন্য অসাধ্য কিছু নয়। তবে কেউ যদি ভাবেন, এই বর্ধিত জনসাধারণ মাছ-ভাত কতটুকু পাবে? লক্ষ্যমাত্রা কি অর্জন করা সম্ভব? এর উত্তর কিন্তু এত সোজা নয়। কারণ দিন দিন প্রাকৃতিক জলাশয়সমূহ জলবায়ুর পবিবর্তনসহ বিভিন্ন কারণে নাব্যতা হারাচ্ছে, বিপন্ন হতে চলেছে মাছসহ সামগ্রিক জীববৈচিত্র্য।

গ্রামে-গঞ্জে এখন আর পানিফল, মাখনা, পদের চাক, শাপলা, শালুক, কেওরালী, কুই ইত্যাদি জলজ ফল পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় না কচ্ছপ, শিশুক, বড় শামুক, আর ঝিনুকের ভিতর রঙিন মুক্তা। বুকলাল কৈ, বোয়ালিয়া পাবদা, মধু পাবদা, আর মাংশল ভেদা মাছ কোথায় গেল? চিক চিকে হলদে সোনালি টাকি মাছের পোনার ঝাক, লাল টকটকে শোলের 'বাইশ' এরা কি এভাবেই শেষ হয়ে যাবে? কোথায় গেল গজার মাছের পোনার ঝাঁক? বিশ্বের জলজ পরিবেশ ও প্রতিবেশের সার্বিক বিপর্যয়ের ৫০% ঘটেছে। বিগত ১৯৭১ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে (Loh *et al.*, ১৯৯৮)। ইতোমধ্যেই দেশের মোট ২৬০টি মৎস্য প্রজাতির (Rahman, ২০০৫) মধ্যে ৫৪ প্রজাতির মাছ বিপন্নপ্রায় (IUCN, ২০০০) হয়ে পড়েছে। জলজ উদ্ভিদ, জলে বসবাসকারী পাখি, বিভিন্ন প্রকার জলজ মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী, বেনথোস ইত্যাদি কমে গেছে এবং দিন দিন কমেই চলেছে। যদি জীববৈচিত্র্যের এই অবক্ষয় এভাবে চলতেই থাকে, আর যদি এখনই এর প্রতিকারের জন্য কোনো বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ না নেয়া হয় তবে ভবিষ্যতে জলজ জীবের বিলুপ্তির হার স্থলভাগের চেয়ে ৫ গুণ বেশি এবং সমুদ্র উপকূলীয় জীবের চেয়ে ৩ গুণ বেশি হবে।গবেষণা থেকে জানা যায়, ২০৫০ সনের মধ্যে ৩০% জীব পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে (Ricciardi *et al.*, ১৯৯৯)। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয় যা আমাদের জন্য বিপদ সঙ্কেত বটে। তাই আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন এবং খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করতেই হবে, হোক সেটা আমিষ অথবা কার্বহাইড্রেটের উৎপাদন। আর এটি করতে হলে ৪০.৪৭ হেক্টর অভন্তরীণ মুক্ত জলাশয় (৮৮%) তথা হাওর, নদী, বিল, প্লাবনভূমিসহ সকল প্রকার উন্মুক্ত জলাশয়ে সকল প্রজাতির মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্রসমূহে মাছকে অবাধে, নির্বিঘ্নে ও নির্ভয়ে প্রজনন করার সুযোগ দিতে হবে। উৎপাদিত রেণু ও ধানীসহ সকল প্রকার পোনা মাছ ও মা-বাবা মাছকে মুক্ত জলাশয়ে অবাধে এবং নির্বিঘ্নে বিচরণের সুযোগ সৃষ্টি করে এদের সংরক্ষণে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। কেননা বদ্ধ জলাশয়ে উৎপাদন যতই বৃদ্ধি পাক না কেন এদ্বারা 'ভিশন-২০২১'র লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়।

মাছ উৎপাদনের ধারা

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, বদ্ধ জলাশয় ও সমুদ্র হতে প্রাপ্ত বিগত ১০ বছরের মাছের উৎপাদন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বদ্ধ জলাশয়ের মোট উৎপাদন বেশি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির হারও বদ্ধ জলাশয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি। এতে দেখা যায় যে, যেখানে ১৯৯৮-৯৯ সনে ৬.৫ লক্ষ মে.টন মাছ আহরিত হয় মুক্ত জলাশয় থেকে, ২০০৮-২০০৯ সনে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১১.২৪ লক্ষ মে.টনে যা প্রায় ১.৭৩ গুণ। অন্যদিকে, বদ্ধ জলাশয়ে ১৯৮৮-৯৯ অর্থবছরে উৎপাদন ছিল সর্বমোট ৫.৯৩ লক্ষ মে.টন যা ২০০৮-২০০৯ সনে এসে দাঁড়ায় ১০.৬৩ লক্ষ মে.টনে যা প্রায় ১.৭৯ গুণ। তাই প্রতীয়মান হয় যে, মুক্ত জলাশয়ে আহরিত মাছের চেয়ে বদ্ধ জলাশয়ে উৎপাদন হার বেশি। কিন্তু এ বদ্ধ জলাশয়কে পরিবেশবান্ধব উপায়ে ব্যবহার করা জরুরি। তাই দৃষ্টি দিতে হবে মুক্ত জলাশয়ের দিকে যেখানে প্রতি ইউনিটে অল্প উৎপাদন বাড়ানো গেলেই মোট উৎপাদন হবে বিরাট আকারের। সেজন্য প্রয়োজন বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা, উদ্যোগ ও সরকারি নীতিমালা।

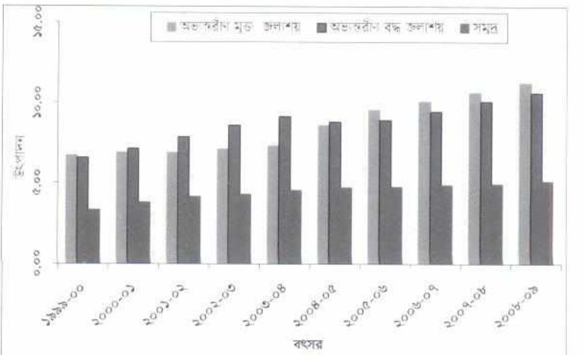

চিত্র ১. বিগত দশ বছরে বাংলাদেশে মাছের উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)

মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন এবং মাছ সংরক্ষণ

বদ্ধ জলাশয়ের ন্যায় মুক্ত জলাশয়ে নিবিড় মাছ চাষ করা না গেলেও দক্ষতার সাথে লাগসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বাড়ানোর অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে। জলবায়ুর পরিবর্তন ছাড়াও জলাশয়গুলোতে রাজস্বমুখী জলমহাল ব্যবস্থাপনা, পলি ভরাট, পানি দূষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, ক্ষতিকর জাল ও সরঞ্জামের ব্যবহার, অতিআহরণ, পানি সেচে মা-বাবা মাছ আহরণ, প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস করা, নির্বিচারে পোনামাছ আহরণ ইত্যাদি কারণে মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন প্রতিনিয়ত ক্ষতি বা চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনেই এর উত্তরণ প্রয়োজন, প্রয়োজন পরীক্ষিত বিভিন্ন প্রযুক্তির সমাবেশ এবং জলাশয়ভেদে এর প্রয়োগ। এসব বিবেচনায় হাওরসহ মুক্ত জলাশয়ের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিম্নে উল্লিখিত মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্রসমূহে মাছকে অবাধে, নির্বিঘ্নে ও নির্ভয়ে প্রজনন করার সুযোগ দিতে হবে এবং উৎপাদিত রেণু ও ধানীসহ সকল প্রকার পোনা মাছ ও মা-বাবা মাছকে মুক্ত জলাশয়ে অবাধে ও নির্বিঘ্নে বিচরণের সুযোগ সৃষ্টি করে এদের সংরক্ষণে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে:

(১) কার্প (Carp)

কালিবাউস (*Labeo calbasu*), রুই (*Labeo rohita*), কাতল (*Jebelion catla*), মৃগেল (*Cirrhinus cirrhosus*), কার্পিও (*Cyprinus carpio*), গনিয়া (*Labeo gonius*), ভাংনা (*Cirrhina reba*), মোরার (*Aspidoparia morar*), জয়া (*A. jaya*), বাটা (*Labeo bata*) পিয়ালি, ছেপচেলা ইত্যাদি কার্প দলের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাসে হাওর ও প্লাবনভূমির হালকা স্রোতযুক্ত স্থানে গনিয়া, কালিবাউস, ভাংনা ইত্যাদি মাছের প্রজনন হয়ে থাকে। অন্যদিকে, কার্পিও বিদেশি মাছ হওয়া সত্ত্বেও সকল প্রকার জলাশয়েই মাঘ মাস থেকে চৈত্র মাসে এদেরকে জলজ আগাছা বা কোনো অবকাঠামোতে আঠালো ডিম দিতে দেখা যায়। রুই, কাতল ও মৃগেল মাছের প্রজননের ক্ষেত্র হিসেবে চট্টগ্রামের হালদা নদীর নাম আমরা সকলেই জানি। তবে হাওর এবং পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রসহ দেশের খরস্রোতা কিছু নদীতে মৃগেল মাছের প্রজননের তথ্য মাঝে মধ্যে পাওয়া যায়। একসময় উল্লিখিত নদীসমূহের বিভিন্ন ঘাট যেমন, গোয়ালন্দ ঘাট, সিরাজগঞ্জ ঘাট, বাহাদুরাবাদ ঘাট, ফুলছড়ি ঘাট, তরা ঘাট, শম্ভুগঞ্জ ঘাট, হোসেনপুর ঘাট ইত্যাদি স্থানে সাভার জাল দিয়ে রেণুপোনা বা ডিম-পোনা আহরণ করা হতো। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন কারণে দু-একটি স্থানে স্বল্প পরিমাণ রেণু পোনা পাওয়া গেলেও অধিকাংশ স্থানে আর পাওয়া যায় না।

সকল প্রকার কার্পের প্রজনন মৌসুমে বিশেষ করে বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত কম ফাঁসযুক্ত বেড় জাল, (যেমন: মশারি জাল, কুনি জাল, খেতা জাল), সাভার জাল ইত্যাদির

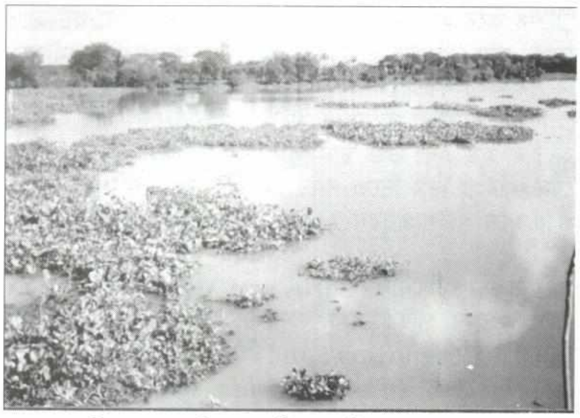

ছবি: প্লাবনভূমির একটি প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র

ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলে এদের রেণু ও ধানী পোনা রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। অন্যদিকে উক্ত সময়ে ডিমওয়ালা কার্পজাতীয় যে কোনো প্রজাতির মাছের আহরণ আইন দ্বারা প্রতিহত করা প্রয়োজন।

(২) ক্যাট ফিস (Cat fish)

সাধারণত বার্বেল বা দাঁড়ি, কাঁটাযুক্ত পাখনা ও আঁইশবিহীন মাছগুলোকে ক্যাটফিস বলা হয়, যেমন- শিং (*Heteropneustes fossilis*), মাগুর (*Clarias batrachus*), টেংরা (*Mystus tengara*), গুলশা (*Mystus gulio*), বোয়ালিয়া পাবদা (*Ompok bimaculatus*), বোয়াল (*Wallagonium attu*), আঁইড় (*Sperata aor*), গুজি আইড় (*Mystus seenghala*), পাঙ্গাস (*Pangasius pangasius*), বাচা (*Eutropiichthys vacha*), ঘাউরা (*Clupisoma garua*), বাঘাইড় (*Bagarius bagarius*), কাজলি (*Alia coila*), রিটা (*Rita rita*), চ্যাং (*Chaca chaca*) ইত্যাদি। এরা বর্ষার শুরুতে বৃষ্টির পানি আসার সাথে সাথে প্রজননের উদ্দেশ্যে এক স্থান হতে অন্য স্থানে বিশেষ করে অত্যন্ত কম পানিতে ও স্রোতের বিপরীতে গমন করতে দেখা যায়। এদের মধ্যে শিং ও মাগুর মাছ সাধারণত চৈত্র থেকে আষাঢ় মাসে স্বল্প পানি ও জলজ আগাছাযুক্ত প্লাবনভূমি বা ধানক্ষেত, পাটক্ষেত বা জলজ আগাছাযুক্ত জলাশয়ে গর্ত করে গর্তের মধ্যে ডিম ছাড়ে এবং পুরুষ মাছ শুক্রাণু নির্গত করার মাধ্যমে ডিম নিষিক্ত হয়। ডিম ফোটার পরও অল্প কিছুদিন পর্যন্ত মা-বাবা, বিশেষ করে মা মাছের মাতৃযত্ন ও পাহারায় পোনা বড় হয়ে জলাশয়ের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। গুলশা, পাবদা, কাজলি, বাতাসি ইত্যাদি মাছকে বিল ও জলজ আগাছাযুক্ত প্লাবনভূমিতে ডিম ছেড়ে বাচ্চা উৎপাদন করতে দেখা যায়। বোয়াল মাছকে পাগলের মত নদী বা বিল থেকে উঠে এসে স্বল্প পানি ও জলজ আগাছাযুক্ত প্লাবনভূমি বা ধানক্ষেত বা জলজ আগাছাযুক্ত জলাশয়ে ডিম দিতে দেখা যায়। আঁইড় মাছকে নদী বা বিলে বা এ ধরনের জলাশয়ের পরিষ্কার পানিতে গর্ত করে ডিম ছাড়তে এবং মা-বাবা,

বিশেষ করে মা মাছের মাতৃযত্ন ও পাহারায় পোনা বড় হতে দেখা যায়। সকল প্রকার ক্যাট ফিসের প্রজনন মৌসুমে বিশেষ করে চৈত্র থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত ডিম ছাড়ার জন্য তৈরিকৃত বাসা বা গর্তসমূহ থেকে যাতে মা-বাবা মাছ আহরণ করা না হয় এবং উক্ত স্থানসমূহ যেন সংরক্ষণ হয় এবং মাছ যেন নির্বিঘ্নে ডিম দিতে পারে সে ব্যপারে জনসচেতনতা ও প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৩) বার্বস ও মিনোস (Barbs and Minnows)

সকল প্রকার পুঁটি, যেমন, সরপুঁটি (*Puntius sarana*), জাতপুটি (*Puntius sophore*), তিঁতপুঁটি (*Puntius ticto*) ইত্যাদি, চেলা (*Chela bacaila, C. phulo*), মলা (*Amblypharyngodon mola*), ঢেলা (*Rohtee cotio*), কানপোনা (*Aplocheilus panchax*), দারকিনা (*Esomus danrious*) ইত্যাদি বার্বস ও মাইনোস দলের অন্তর্ভুক্ত। হাওর ও মুক্ত জলাশয়ের প্লাবনভূমিতে এরা প্রজনন করে থাকে। সাধারণত বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাসে হাওর ও প্লাবনভূমির হালকা স্রোতযুক্ত স্থানে এদের প্রজনন হয়ে থাকে। সরপুঁটি ছাড়া অন্যান্য পুঁটিমাছ যেমন, জাতপুঁটি, তিঁতপুঁটি, কাঞ্চনপুঁটি, ফুটানিপুঁটি ইত্যাদি পুঁটি মাছকে বিল, প্লাবনভূমির ধানক্ষেত বা ছোট্ট জলাশয়েও এদের প্রজনন করতে দেখা যায়। সরপুঁটি সাধারণত একই সময়ে বিল ও প্লাবনভূমিতে প্রজনন করে থাকে। দারকিনা মাছকে ছিপ ছিপে পানিতে ডাঙ্গার মধ্যেও ভাসতে দেখা যায়। এদের প্রজনন মৌসুমে বিশেষ করে বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত কম ফাঁসযুক্ত বেড় জাল, (যেমন- মশারিজাল, কুনি জাল, খেতা জাল, গাইট্টা জাল), ফিস ট্র্যাপ ইত্যাদির ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলে এদের রেণু ও ধানীপোনা রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। তাছাড়া ফিস ট্র্যাপ দ্বারা প্রচুর বার্বস ও মাইনোস আহরণ করা হয়। এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। কম ফাঁসের কারেন্ট জাল এদের জন্য ভয়ানক ক্ষতিকারক।

(৪) ক্লুপিড ফিস (Clupeid fish)

ইলিশ (*Hilsa ilisha*), কেচকি (*Corica soborna*), চাপিলা (*Gadusia chapra*), গনি চাপিলা (*Gadusia minminna*) ইত্যাদি মাছ ক্লুপিড ফিসের আওতাভুক্ত। ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ যেটি সমুদ্র থেকে প্রজনন মৌসুমে অভিপ্রয়াণ করে পদ্মা, যমুনা, মেঘনা ইত্যাদি নদীতে আসে প্রজননের উদ্দেশ্যে যখন জেলেদের জালে প্রচুর ধরা পড়ে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মায়ানী পয়েন্ট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম (জিপিএস পয়েন্ট ৯১°৩২.১৫' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২২°৪২.৫৯' উত্তর অক্ষাংশ), উত্তর-পশ্চিমের পশ্চিম সৈয়দ আউলিয়া পয়েন্ট, তজুমদ্দিন, ভোলা (জিপিএস পয়েন্ট ৯০°৪০.৫৮' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২২°৩১.১৬' উত্তর অক্ষাংশ), দক্ষিণ-পূর্বে গণ্ডামারা পয়েন্ট, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম (জিপিএস পয়েন্ট ৯১°৫৩.০৫' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২১°৫৬.০৪' উত্তর অক্ষাংশ) এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের লতা চাপালি পয়েন্ট, কলাপাড়া, পটুয়াখালী (জিপিএস পয়েন্ট ৯০°১২.৫৯' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২১°৪৭.৫৬' উত্তর অক্ষাংশ)-এ সকল স্থানে প্রতি বছর আশ্বিন মাসে জন্ম নেওয়া চাঁদের পূর্ণিমার ৫ দিন আগে ও ৫ দিন পরে ইলিশ ডিম ছাড়ে। এ ছাড়া চাঁদপুর জেলার ষাটনল হতে লক্ষ্মীপুর জেলার চর আলেকজান্ডার পর্যন্ত (মেঘনা নদীর নিম্ন অববাহিকার ১০০ কিমি এলাকা), ভোলা জেলার চর ইলিশা হতে চর পিয়াল পর্যন্ত (মেঘনা নদীর শাহবাজপুর শাখা নদীর ৯০ কিমি এলাকা) পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার সমগ্র আন্ধারমানিক নদীর ৪০ কিমি এলাকা, উত্তরে শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া ও ভেদরগঞ্জ উপজেলা এবং দক্ষিণে চাঁদপুর জেলার মতলব এবং শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার মধ্যে অবস্থিত নিম্ন পদ্মা নদীর ২০ কিমি এলাকায় প্রতিবছর মার্চ হতে এপ্রিল পর্যন্ত এবং ভোলা জেলার ভেদুরিয়া হতে পটুয়াখালীর চররুস্তম পর্যন্ত (তেতুলিয়া নদীর ১০০ কিমি এলাকা) প্রতিবছর নভেম্বর হতে জানুয়ারি পর্যন্ত ইলিশের পোনা বা জাটকা প্রচুর পরিমাণে জেলেদের জালে ধরা পড়ে।

চাপিলা মাছ হাওর ও মুক্ত জলাশয়ের প্লাবনভূমিতে প্রজনন করে থাকে। সাধারণত বৈশাখ থেকে আষাঢ় মাসে হাওর ও প্লাবনভূমির হালকা স্রোতযুক্ত স্থানে এদের প্রজনন হয়ে থাকে। নদী ও হাওরের পানি পরিবাহী খালের সংযোগ স্থলে বা কমস্রোতযুক্ত স্থানে ফাল্গুন থেকে আষাঢ় মাসে কেচকি মাছকে ডিম ছেড়ে বাচ্চা দিতে দেখা যায়। মশারিজাল এদের সবচেয়ে বড় শত্রু।

ইলিশ মাছ কারেন্ট জাল, শেংলা জাল ইত্যাদি এবং চাপিলা জাতীয় মাছের প্রজনন মৌসুমে বিশেষ করে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস পর্যন্ত কম ফাঁসযুক্ত বেড় জাল, যেমন, মশারি জাল, কুনি জাল, গাইট্টা জাল ইত্যাদির ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলে এদের রেণু ও ধানী পোনা রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে।

(৫) স্নেকহেড (Snakehead)

সাঁপের মাথার ন্যায় চ্যাপ্টা মাথাযুক্ত টাকি (*Channa punctatus*), শোল (*Channa striatus*), গজার (*Channa marulius*) ও গেচু বা রাগা মাছ (*Channa orientalis*) স্নেকহেড এর অন্তর্ভুক্ত। ক্যাটফিসের ন্যায় এদেরকেও বর্ষার শুরুতে বৃষ্টির পানি আসার সাথে সাথে প্রজননের উদ্দেশ্যে এক স্থান হতে অন্য স্থানে বিশেষ করে অত্যন্ত কম পানিতে ড্রেনের মাধ্যমে স্রোতের বিপরীতে গমন করতে দেখা যায়। এরা সাধারণত চৈত্র থেকে শ্রাবণ মাসে স্বল্প পানি ও জলজ আগাছাযুক্ত প্লাবনভূমি বা ধানক্ষেত, পাটক্ষেত বা জলজ আগাছাযুক্ত জলাশয়ে গর্ত করে গর্তের মধ্যে ডিম ছাড়ে এবং পুরুষ মাছ শুক্রাণু নির্গত করার মাধ্যমে ডিম নিষিক্ত করে। ডিম ফোটার পর ঝাঁক বেধে মা-বাবা সহ এরা জলাশয়ে ঘুরে বেড়ায়। এদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এরা লেজ দ্বারা বিকট শব্দ সৃষ্টি করে নিজেদের অবস্থান জানিয়ে

শত্রুদের সতর্ক করে দেয়। অনেক দিন পর্যন্ত মা-বাবা এবং বিশেষ করে মা মাছের মাতৃযত্ন ও পাহারায় পোনা বড় হয়ে জলাশয়ের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রামাঞ্চলে এখনও খুইয়া জাল বা কম ফাঁসযুক্ত ঠেলা জাল ও উইছা (বাঁশের বেত দ্বারা তৈরি) দ্বারা এদের পোনা আহরণ করে অবিবেচকের ন্যায় ভাজি করে খাওয়া হয়। আইন থাকলেও মানা হয় না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সকল জনবহুল স্থানে এসকল পোনা আহরণের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে হবে এবং সামাজিকভাবে এর জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

(৬) পার্চ ফিস (Perch fish)

কৈ (*Anabas testudineous*), খলিশা (*Colisa fasciatus*), বৈচা বা চাটুয়া (*Colisa chuna*), নাপতানি (*Badis badis*), চান্দা (*Chanda ranga*), নামা চান্দা (*Chanda nama*), গোল চান্দা (*Chanda baculis*), ভেদা বা মেনি (*Nandus nandus*) ইত্যাদি মাছ পার্চ দলের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত চৈত্র থেকে আষাঢ় মাসে নতুন বৃষ্টির পানি আসার সাথে সাথে প্রজননের উদ্দেশ্যে এক স্থান হতে অন্য স্থানে বিশেষ করে অত্যন্ত কম পানিতেও স্রোতের বিপরীতে গমন করতে দেখা যায়। এমনকি বৃষ্টির মধ্যে ও পরে এদেরকে শুকনো মাঠের মধ্য দিয়েও স্বল্প পানি ও জলজ আগাছাযুক্ত প্লাবনভূমি বা ধানক্ষেত বা জলজ আগাছাযুক্ত জলাশয়ে বা নতুন পানিতে গমন করতে দেখা যায়। কৈ মাছ জলজ আগাছার মধ্যে ডিম ছাড়ে এবং আঠালো ডিমগুলো আগাছায় লেগে যায়। ডিম ফোটার পর পোনাগুলো জলাশয়ের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

খলিশা ও বৈচা মাছ ভাসমান আগাছায় এক প্রকার ফেনাযুক্ত আবরণ সৃষ্টি করে এরং এর নিচে ডিম ছাড়ে। ডিম ফোটার পর পোনাগুলো জলাশয়ের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পরে। চান্দা, ডেলা, ভেদা বা মেনিমাছ জলজ আগাছাযুক্ত প্লাবনভূমি বা ধানক্ষেত বা জলজ আগাছাযুক্ত জলাশয়ে বা নতুন পানিতে গমন করে সেখানে ডিম ছাড়ে এবং ডিম ফোটার পর পোনাগুলো বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এসকল মাছের পোনা ছোট ফাঁসযুক্ত বেড় জাল (যেমন, মশারি জাল, কুনি জাল, গাইট্টা জাল), খুইয়া জাল, ঠেলা জাল, ফিস ট্র্যাপ, ঝাঁকি জাল, কারেন্ট জাল ইত্যাদি দ্বারা আহরণ হতে দেখা যায়।
এদের সংরক্ষণের জন্য ডিম ছাড়ার মৌসুমে সংশ্লিষ্ট জলাশয়গুলোর প্রজনন এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হলে এর ফলাফল সবচেয়ে ভাল হবে।

(৭) স্পাইনি ইল (Spiny eel)

বড় বাইম বা শাল বাইম (*Mastacembelus armatus*), তারা বাইম (*Macrognathus aculeatus*), চিকরা বাইম (*Mastacembelus pancalus*), কুচিয়া (*Monopterus cuchia*) ইত্যাদি মাছ এ দলের অন্তর্ভুক্ত। এরা সাধারণত পানির তলদেশে, কোনো চোঙ জাতীয় কাঠামো বা জলজ আগাছার মধ্যে বসবাস করে। বাইম মাছকে নদী বা জলাশয়ের পাড়ে পানিতে অবস্থিত মাটির গর্তে প্রচুর পরিমাণে বসবাস করতে দেখা যায়। পানি শুকিয়ে গেলে কাদার মধ্যে মাটির ভিতরেও এদেরকে পাওয়া যায়। এরা মাটির গর্তে বা জলজ আগাছার মধ্যে ডিম দেয়। ডিম ফোটার পর পোনাগুলো বিভিন্ন জলজ আগাছাযুক্ত স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

ছবি: একটি বিলের মৎস্য বৈচিত্র্য

বিভিন্ন প্রকার ড্রেজ নেট, ঠেলা জাল, কারেন্ট জাল, ফিস ট্র্যাপ, মশারি জাল এদের চরম শত্রু। এদের সংরক্ষণের জন্য প্রজনন মৌসুমে গর্ত থেকে এদের আহরণ বন্ধ করতে হবে এবং ডিম ছাড়ার সুযোগ দিতে হবে। তাছাড়া প্রজনন মৌসুমে উল্লিখিত জালসমূহের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং এদের মা-বাবাকে রক্ষা করতে হলে কোন অবস্থাতেই জলাশয় শুকিয়ে মাছ আহরণ করা যাবে না।

(৮) লোচ (Loach)

গুতুম (*Lapidocephalus guntea*), রাণী (*Botia dario*), ঘোড়া মাছ বা পাহাড়ি গুতুম (*Somileptes gongota*) ইত্যাদি এই জাতীয় মাছ লোচের অন্তর্ভুক্ত। এরা জলাশয়ের তলায় বসবাস করে। সাথারণত চৈত্র থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত এরা ডিম দেয়। তবে বর্ষার প্রারম্ভে বৃষ্টির নতুন পানি আসার সাথে সাথে এমনকি নতুন বৃষ্টিতে এরা ছিপছিপে পানিতে খাল, ড্রেন বা পানি প্রবাহের মাঝে এদের এক স্থান হতে অন্য স্থানে যেতে দেখা যায়। স্পাইনি ইলের সাথে পানি শুকিয়ে গেলে কাদার মধ্যে মাটির ভিতরেও এদেরকে পাওয়া যায়। জলজ আগাছাযুক্ত স্থান বা ড্রেন, খাল, প্লাবনভূমি বা নদীর একেবারে কিনারায়, পাথর বা কোন অবকাঠামোর ফাঁকে এদের ডিম ছাড়তে দেখা যায়। ডিম ফুটে বাচ্চা হওয়ার পর স্বল্প পানিতেই বাচ্চাগুলো ছড়িয়ে পড়ে।

লোচের পোনা ছোট ফাঁসযুক্ত বেড় জাল, যেমন, মশারি জাল, কুনি জাল, বিভিন্ন প্রকার ড্রেজনেট, ঠেলা জাল, ফিস ট্র্যাপ, কারেন্ট জাল ইত্যাদি দ্বারা আহরণ হতে দেখা যায়। এদের সংরক্ষণের জন্য প্রজনন মৌসুমে ডিম ছাড়ার সুযোগ দিতে হবে এবং উল্লিখিত জালসমূহের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে

হবে। এদের ক্ষেত্রেও মা-বাবাকে রক্ষা করতে হলে কোনো অবস্থাতেই জলাশয় শুকিয়ে মাছ আহরণ করা যাবে না।

(৯) ফিদারব্যাক (Featherback)

চিতল (*Notopterus chitala*), ফলি বা কানলা (*Notopterus notopterus*) ইত্যাদি মাছকে ফিদারব্যাক বলা হয়।। চিতল মাছ নদী, বিল, বাঁওড় ও অন্যান্য জলাশয়ের আগাছাযুক্ত অপেক্ষাকৃত একটু গভীর পানিতে বসবাস করে এবং ফলি বা কানলা জলাশয়ের আগাছাযুক্ত স্থানে গর্ত করে গর্তে ডিম ছাড়ে। চিতল মাছ আগাছার গোড়ায় মূলে বা ডালপালা বা কাঠজাতীয় অবকাঠামোতে ডিম ছাড়ে। এদের ডিম ফোটার সময় অন্যান্য মাছের চেয়ে বেশি, সাধারণত ৭-১৫ দিন। ডিম আঠালো এবং আগাছা বা অবকাঠামোতে লেগে থাকে। পোনা বেশ কিছুদিন একত্রে ঘন হয়ে বিচরণ করে পরে জলাশয়ের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ছোট ফাঁসযুক্ত বেড় জাল; যেমন-মশারি জাল, কুনি জাল, বিভিন্ন প্রকার ড্রেজনেট, ঠেলা জাল এদের জন্য হুমকি। এদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করা গেলে এ সকল মাছের বংশ রক্ষা পাবে।

(১০) চিংড়ি (Prawn species)

গলদা চিংড়ি (*Macrobrachium rosenbergii*), ঠেঙ্গুয়া চিংড়ি (*M. birmanicus*), ডিমুয়া চিংড়ি (*M. villosimanus*), ছটকা চিংড়ি (*M. malcolmsonii*) এবং গুড়া ইচা বা গুড়া চিংড়ি (*M. lamarrei*) এর অন্তর্ভুক্ত। গুড়া ইচা সকল জলজ আগাছা যুক্ত জলাশয়ের আগাছায়, কচুরিপানায় ঝুলে থাকতে দেখা গেলেও স্বল্প পানি ও স্বল্প স্রোতে জলাশয়ের তলদেশে বা আগাছায় এরা ডিম দেয়। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার পর এরাও আগাছায় বা কচুরিপানায় ঝুলে থাকতে দেখা যায়।

গলদা চিংড়ি অভিপ্রয়াণ করে লবণাক্ত পানিতে চলে যায় প্রজননের জন্য। চৈত্র থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত হাওর অঞ্চলের নদীর কিনারে স্রোতযুক্ত স্থানে সকল প্রকার চিংড়িকে পেটের তলদেশে ডিমসহ পাওয়া যায় এবং প্রচুর ছোট পোনাও জেলেদের জালে ধরা পড়ে। ঠেলাজাল, ড্রেজ নেট, সেটব্যাগ নেট (যেমন- ভীম জাল), বেড় জাল, ফিস ট্র্যাপ ইত্যাদি দ্বারা চিংড়ি আহরণ করা হয়। এদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করা গেলে এ সকল মাছের বংশ রক্ষা পাবে।

(১১) অন্যান্য মাছ (Miscellaneous fish)

বাইলা (*Glossogobius giuris & Awaous stamineus*), কাকিলা (*Xenentodon cancila*), একঠুটিয়া (*Hemirhamphus gaimardi*), পোয়া (*Pama pama*), ছোট টেপা বা পটকা (*Tetradon cutcutia*) ইত্যাদি অন্যান্য মাছের দলভুক্ত করা হয়েছে।

বাইলা মাছ পানির তলদেশে থাকে এবং নদী, বিল, খাল এমনকি পুকুরেও ডিম দিতে দেখা যায়। সাধারণত চৈত্র থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত এদের পেটে ডিম দেখা যায়। এ সময় এরা সকল প্রকার জলাশয়ের অপেক্ষাকৃত কম পানি ও কম স্রোতযুক্ত স্থানে মাটিতে ডিম দেয়। ডিম ফুটে বাচ্চা হওয়ার পর বাচ্চারা জলাশয়ের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। পটকা ছাড়া অন্যান্য মাছগুলোকে পানির উপরিস্তরে ভেসে বেড়াতে দেখা যায়। যে কোনো কম স্রোতযুক্ত স্থানে জলজ আগাছায় এদের ডিম দিতে দেখা যায়। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার পর এরাও দল বেধে ভেসে বেড়ায়।

বেড় জাল ও কারেন্ট জালই মূলত এদের চরম শত্রু। এদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা গেলে এ সকল মাছের বংশ রক্ষা পাবে এবং এর ফলে মৎস্য বৈচিত্র্য সংরক্ষিত হবে। উল্লেখ্য, শুধু জাল বা সরঞ্জামের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করা হলেই মাছের সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করবে না বরং এর সাথে সাথে জলাশয় সেচে মাছ আহরণের অভ্যাসটি একেবারেই বন্ধ করতে হবে, অন্যথায় মা-বাবা মাছের অস্তিত্বের প্রশ্ন দেখা দিবে। হাওর ও মুক্ত জলাশয় হলো সকল প্রকার মিঠা পানির মাছের মূল বাসস্থান ও প্রাকৃতিকভাবে বংশ বৃদ্ধির মূল প্রজনন ক্ষেত্র। তাই এদের বংশ রক্ষা করতে হলে এসব প্রজনন ক্ষেত্রগুলোকে সংরক্ষণের জন্য বিশেষভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন এবং বর্তমান আইনের সঠিক প্রয়োগ করতে হবে। তবে আইন দ্বারা সব হবে না, প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা। মানুষ সচেতন হলে অনেক কিছুই করা সম্ভব।

শ্রীমঙ্গলের বাইক্যা বিল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ধরনের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা বা সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। নবায়নযোগ্য এই প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে শুধুই নেয়া-এ মানসিকতা বর্জন করে কিছু দেয়ার মানসিকতা সংশ্লিষ্ট সকলকে অর্জন করতে হবে। আর সেজন্য এবং বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার ভিশন-২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দেশের সম্ভাবনাময় ও পুরোপুরি উপযোগী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্রগুলো রক্ষা করে বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদনমুখী ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে অধিক মৎস্য উৎপাদনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে। এটি করা সম্ভব এবং এটি করা হলে জলজ-জীববৈচিত্র্য সংরক্ষিত হবে এবং দেশের জনগণ পাবে নিরাপদ খাদ্য যার মাধ্যমে খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। মনে রাখতে হবে সমস্যাটি মূলত দেশের জনগণের এবং সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের। কাজেই সকলে মিলে এর সমাধান করতে হবে।

সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

মৎস্যসেক্টর ও নারীর ক্ষমতায়ন

ড. মোহাঃ সাইনার আলম

উৎপাদনমূলক কাজে নারীপুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উন্নয়নের এক মূল পদক্ষেপ হিসেবে আজ সারা বিশ্বে বিবেচিত হচ্ছে। সামাজিক ও প্রজনন বিষয়ে নারীর ভূমিকা এ দেশে যতটা দৃশ্যমান, ততটা নয় উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে। কারণ হিসেবে বলা যায়, গ্রামীণ এলাকায় উৎপাদন ও আয়মূলক কাজে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগের অভাব। তবে বর্তমানে দেশের সার্বিক উন্নয়নে নারী-পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা যেমন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি সৃষ্টি হচ্ছে নারীর অংশগ্রহণের নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র। মাছ চাষ ও এতদ্সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম গ্রামীণ এলাকায় একটি অন্যতম আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণও বেশ লক্ষণীয়। এর ফলে নারীর নিজ পরিবারের নারী ও শিশুর অধিক পুষ্টি চাহিদা পূরণের সাথে সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতা বৃদ্ধি তথা ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত হচ্ছে।

পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে দেশে প্রায় ১৫০ লক্ষ লোক তাঁদের জীবনজীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য উপখাতের ওপর নির্ভরশীল, যার মধ্যে রয়েছে প্রায় ১১.৫ লক্ষ নারী। মৎস্য খাতে নারীর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে বসতভিটা সংলগ্ন পুকুরে মাছ ও চিংড়ি চাষ, পোনা প্রতিপালন, মৎস্য আহরণ, খুচরা বিক্রয়, শুটকিকরণ, মৎস্য খাদ্য প্রস্তুতকরণ, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি অন্যতম। এছাড়া জাল বুনন, মাছ ধরার ফাঁদ তৈরি, মাছ চাষে উদ্বুদ্ধকরণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি, ইত্যাদি ক্ষেত্রেও নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।

বহুবিধ কারণে এদেশে নারীর সামাজিক সুবিধার পরিধি অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু ধীরে হলেও এর সুস্পষ্ট ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে। যেখানে নারী নিজেকে জড়িত করতে পেরেছেন বা সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই সাফল্য দেখাতে পেরেছেন। এ সুযোগ সৃষ্টিতে যেসব বাধা এখনও বিদ্যমান তার মধ্যে অন্যতম হলো সামাজিক রক্ষণশীলতা, খাস জলাশয় ইজারা প্রদানে বৈষম্য ও অশিক্ষা/নিরক্ষরতা। বর্তমানে মাছ চাষ একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হলেও গ্রামীণ এলাকায় নারীশিক্ষার অগ্রগতির হার তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও তথ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশের নারীরা ক্ষুদ্র আকারে মৎস্যচাষ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৎস্যখাতের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিশেষত খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ও নদী-নালা বেষ্টিত এলাকার নারীরা মৎস্য শিকার ও মাছ ধরার সরঞ্জমাদি তৈরির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মাছ থেকে শুটকি তৈরি, পরিবহন, বিপণন, সম্প্রসারণ, স্থায়ী বা সাপ্তাহিক বাজারে দোকানি ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে নারীরা নিবিড়ভাবে জড়িত আছে। দেখা যায় এ দেশের চিংড়ি ও হিমায়িত মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের অধিকাংশই নারী।

প্রাচীনকাল থেকে মাছ ধরার জন্য জাল তৈরিতে এ দেশের নারীরা প্রাধান্য বিস্তার করছে এবং একইসঙ্গে এটি অনেক পরিবারের আয়ের অন্যতম উৎস। মাছ ধরার জাল তৈরি এবং মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে নারীরা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী পারিবারিক শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন। সরকারি-বেসরকারি সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ভূমিহীন নারীরা লীজ নেয়া পুকুর অথবা বসতভিটা সংলগ্ন পুকুর বা জলাশয়ে এককভাবে বা যৌথ উদ্যোগে মৎস্যচাষের সঙ্গে জড়িত।

নারী উন্নয়নে অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্রসমূহ

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্যসেক্টরের অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্রসমূহ হলো:

ক. বসতবাড়ি সংলগ্ন পুকুরে সমন্বিত মাছ ও চিংড়ি চাষ এবং পোনা প্রতিপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ।

খ. গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম তৈরি ও বিপণন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ।

গ. হাওর-বাঁওড় ও খাল-বিলে মাছ ধরার মৌসুমে অতিরিক্ত মাছ ও চিংড়ির স্বাস্থ্যসম্মত শুটকিকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও সচেতনতা সৃষ্টি।

ঘ. পারিবারিক পর্যায়ে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য খাদ্য প্রস্তুতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

ঙ. মাছ ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় রপ্তানিকৃত পণ্যের গুণগতমান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আপামর নারী কর্মীগণকে চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ।

চ. উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ ধরার অধিক চাপ কমানোর লক্ষ্যে মৎস্যজীবী পরিবারের কর্মক্ষম সদস্য, বিশেষ করে

নারীর বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রমের ওপর প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান।

নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

ক. **পলিসি ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ:** মৎস্য অধিদপ্তরের সকলস্তরে পলিসি ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকরী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অধিদপ্তরীয় প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবস্থান সুদৃঢ় থাকায় পলিসি ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় (ডিসেম্বর ২০১০), বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর মধ্যে মহিলা প্রায় ৬.১৮%। তাছাড়া ২০১০ সালের তথ্যমতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত মোট জনবলের প্রায় ১৮ শতাংশ নারী। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় মৎস্য শিক্ষা ও মৎস্য গবেষণা কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে বেশি।

খ. **নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি:** সরকারের বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারি নির্বিশেষে সকল নিয়োগে মহিলা কোটা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রশিক্ষণসহ সকল দক্ষতা উন্নয়নমূলক কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অধিদপ্তরীয় সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীবান্ধব পরিবেশ বজায় রয়েছে।

গ. **উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ:** দেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় মৎস্য খাতের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত, বিশেষ করে দরিদ্র ও দুঃস্থ নারী, যাদের পুকুর/ডোবা আছে বা মাছ চাষ বা ব্যবস্থাপনা করার জন্য অনুরূপ কোন উৎসে অংশগ্রহণের সুযোগ আছে, তাঁদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে। ফলে দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূল স্রোতধারায় নারীদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে তাঁদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। মৎস্য চাষের মত আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে বিধায় নারীর কর্মসংস্থান অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে সফল কর্মসূচিসমূহ

মৎস্য সেক্টরে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহ হলো:

ক. নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরে কর্মরত সকল পর্যায়ের মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন কার্যকর ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন।

খ. বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত, বিশেষ করে দরিদ্র ও দুঃস্থ নারী, যাদের পুকুর/ডোবা আছে বা মাছ চাষ বা ব্যবস্থাপনা করার জন্য অনুরূপ কোন উৎসে অংশগ্রহণের সুযোগ আছে তাঁদেরকে মৎস্য সেক্টরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ।

গ. বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিতে নারীদের মাঝ থেকে সাধারণভাবে ২০-২৫ শতাংশ সুফলভোগী নির্বাচন করা হয়ে থাকে। মৎস্য খাতের ভিশন ২০২১ এর আওতায় গৃহীত মৎস্য বিষয়ক বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ ২৫-৩০ শতাংশে উন্নীত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে। চিংড়ি ও হিমায়িত মৎস্য উৎপাদন, সরবরাহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন প্রতিটি স্তরে নারীদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাসমূহে নিয়োজিত শ্রমিকের শতকরা ৮০ ভাগই নারী। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মান নিশ্চিত করার মাধ্যমে এ কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত নারীর উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যায়।

ঘ. বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে নারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পারিবারিক পুষ্টির অধিকতর নিশ্চয়তা বিধানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। দেখা যায় মৎস্য সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ফলে চাষিদের, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণী ও দুঃস্থ নারীদের জীবনযাত্রায় সার্বিকভাবে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পে নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পারিবারিক পুষ্টির অধিকতর নিশ্চয়তা বিধানের প্রচেষ্টাও অনেকাংশেই সফল হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পাধীন এলাকায় পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, পুকুরে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে চাষিদের মাছ খাওয়ার পরিমাণ বেড়েছে ২৮%, যেখানে পুরুষ মৎস্যচাষির (২৭%) চেয়ে মহিলা মৎস্যচাষির (৩৯%) বেলায় মাছ খাওয়ার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি হয়েছে।

ঙ. বিগত কয়েক বছর ধরে ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে জাটকা মৎস্যজীবীদের বিকল্প

কর্মসংস্থান সৃষ্টি একটি অন্যতম উৎপাদনমুখী ও সময়োপযোগী কার্যক্রম বলে ইতোমধ্যেই প্রতীয়মান হয়েছে। এর ফলে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে মৎস্যজীবী পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে মহিলাদের বিকল্প আয়ের ক্ষেত্রসমূহ হয়েছে প্রসারিত এবং হ্রাস পেয়েছে মৎস্যজীবীদের আকস্মিক ঝুঁকি। বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিসহ বিবর্ধিত প্রাণিজ আমিষের একটি অংশ নারীরা ভোগ করবে, যা তাদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করবে।

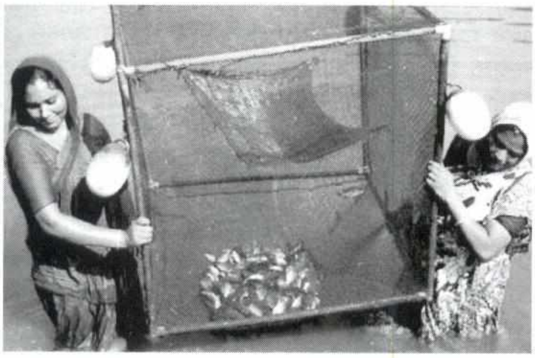

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও নারী উন্নয়ন

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১১-২০১৫) নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ হলো:

ক. মৎস্য ও চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি: মৎস্য ও চিংড়ি উৎপাদন ২৮.৯৯ লক্ষ মে.টন (২০০৯-১০) থেকে ২০১৪-১৫ সাল নাগাদ ৩৬.৬৫ লক্ষ মে.টন এবং ২০২০-২১ সাল নাগাদ ৪১.৩৯ লক্ষ মে.টনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এ অধিক উৎপাদনের ফলে মৎস্যখাতে সংশ্লিষ্ট মহিলা সুফলভোগীদের জীবনমান তথা আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হবে।

খ. উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান: ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পুকুরদীঘির মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনায় মহিলাদের অংশগ্রহণ ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ফলে মৎস্য সেক্টরের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জেন্ডার সমতাকরণের অগ্রগতি বহুলাংশে অর্জিত হবে।

গ. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি: মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি ৭৭.৬৪ হাজার মে.টন (২০০৯-১০) থেকে ২০১৪-১৫ সালে ১৩০ হাজার মে.টনে উন্নীতকরণ সম্ভব হবে বলে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে রপ্তানি শিল্পে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত আপামর মহিলা কর্মীদের জীবনমান তথা আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হবে। বর্তমানে মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাসমূহে নিয়োজিত নারী শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রের ব্যাপকতা, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও আয় অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। পরিবার ও সমাজে নারীর ক্ষমতায়নের পথ হবে আরও প্রশস্ত ও মসৃণ।

ঘ. মানব সম্পদ উন্নয়ন: মৎস্য সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ফলে চাষিদের, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণী ও দুঃস্থ নারীদের জীবনযাত্রায় সার্বিকভাবে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে মৎস্য সেক্টরের স্থায়িত্বশীল অগ্রগতি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সেক্টর সংশ্লিষ্ট মহিলা কর্মীগণকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা হবে।

সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূল স্রোতধারায় নারীদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত, বিশেষ করে দরিদ্র ও দুঃস্থ নারী, যাদের পুকুর/ডোবা আছে বা মাছ চাষ করার জন্য অনুরূপ কোন উৎসে অংশগ্রহণের সুযোগ আছে, তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দরিদ্রদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা কৌশল (পিআরএ) অনুসরণ করা অপরিচার্য। ফলশ্রুতিতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও আয় বৃদ্ধি অনেকাংশেই নিশ্চিত হবে। ভিশন ২০২১ এর আওতায় মৎস্যবিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ ২৫-৩০ শতাংশে উন্নীত করার প্রচেষ্টা সফল করার লক্ষ্যে চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় নিয়োজিত নারী কর্মীর ন্যায় অন্যান্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রেও নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ফলে পরিবার ও সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির সাথে সাথে মৎস্য সেক্টরের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জেন্ডার সমতাকরণের অগ্রগতি বহুলাংশে অর্জিত হবে।

সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ : নিরাপদ মাছের অমিত সম্ভাবনা

ফরিদা বেগম

প্লাবনভূমি বলতে বন্যা প্লাবিত ভূমি যেখানে একাধারে ৪-৬ মাস মাছ চাষ উপযোগী পানি থাকে তাকেই বুঝায়। এ ধরনের প্লাবিত ভূমি বা প্লাবনভূমি আমাদের দেশে বর্ষা মৌসুমে যত্রতত্র দেখা যায়। উপকূলীয় জেলা এবং পার্বত্য জেলা ব্যতীত অন্যান্য প্রায় সব জেলাতেই প্লাবনভূমি পরিলক্ষিত হয়। এসব প্লাবনভূমিতে পানির গভীরতা প্রায় ৩-৫ ফুট হয়ে থাকে। পানির গভীরতার কারণে বর্ষায় এসব জমিতে ধান হয় না বললেই চলে। তাছাড়া ৪-৬ মাস পানি থাকে বিধায় এসব জলায় মাছ থাকাটাই স্বাভাবিক। ষাটসত্তরের দশকে এসব জলমগ্ন জমিতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। আসলে, তখনই ছিলাম আমরা সত্যিকারের 'মাছে-ভাতে বাঙালি'। বাড়ির পাশের ডোবানালা থেকে মাছ ধরে খাওয়াটাই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাস ছিল। কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে মাছ আহরণের কারণে সে ঐতিহ্য ধরে রাখা যায়নি। ফলে লোভনীয় সব দেশীয় প্রজাতির মাছ (যেমন- শোল, বোয়াল, টাকি, কৈ, টেংরা, পুঁটি, মাগুর, মেনি, বাইম ইত্যাদি) এখন বড় বিপদের সম্মুখীন।

প্রাকৃতিক জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন হ্রাস

দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে এদেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটি। তা বর্তমানে প্রায় ষোল কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে উন্মুক্ত জলাশয়ে তথা প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছের উৎপাদন ক্রমশ কমে যাচ্ছে। যেমন- নদী, খাল ও বিলে পলি জমা, নদীর নাব্যতা হ্রাস, বর্ষাকালের স্থায়িত্ব সংকুচিত হওয়াসহ বিবিধ প্রাকৃতিক কারণে এবং মনুষ্যসৃষ্ট কারণ যেমন, খাল-বিল, প্লাবনভূমির প্রাকৃতিক মাছ ছোট অবস্থায় আহরণ, জলাশয় শুকিয়ে মা-মাছগুলো ধরে ফেলা, জলাশয় ভরাট করে বসবাসের বাড়ি বা শিল্পকারখানা গড়ে তোলা, যত্রতত্র বাঁধ নির্মাণ করে মাছের স্বাভাবিক গতিপথ বা বিচরণ বন্ধ করা, প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস করে মাছের বংশ বিস্তার রোধ করা ইত্যাদি কারণে বর্তমানে প্রাকৃতিক জলাশয় বা খালবিল, প্লাবনভূমি ও নদ-নদীতে তথা উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন ক্রমশ হুমকির সম্মুখীন। তাছাড়া কৃষি জমিতে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে ধানক্ষেত থেকে মৎস্যকূল অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কীটনাশকের নেতিবাচক প্রভাব এত বেশি যে কীটনাশক প্রয়োগের কারণে মাছের ডিম, রেণু ও পোনাতো মারা পড়েই, অধিকন্তু যে সব মাছ কীটনাশকের বিষক্রিয়া থেকে ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায় তাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে, শারীরিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয় এবং অনেক সময় বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে এবং সবচেয়ে মারাত্মক পরিনতি হচ্ছে এসব মাছের প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়। তাছাড়া কলকারখানার বর্জ্যের মাধ্যমে পানি দূষণের ফলে উন্মুক্ত এসব নদনদী ও অন্যান্য জলাশয় ক্রমান্বয়ে মৎস্যশূন্য হয়ে পড়ছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সাম্প্রতিক মৎস্য বিষয়ক অধিকাংশ সেমিনার বা সিম্পোজিয়ামে উপরের বিষয়গুলো আলোচিত হয়। একজন সচেতন নাগরিক যিনি মৎস্য বিষয়ে সামান্যতম জ্ঞান রাখেন, তাকে উপরের বিষয়গুলো ভাবিয়ে না তুলে পারে না। ষাট-সত্তরের দশকে উন্মুক্ত জলাশয় (খালবিল, নদীনালা, প্লাবনভূমি) থেকে মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৮০% আসত। বর্তমানে এর পরিমাণ বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষের তুলনায় কমতে কমতে প্রায় ৪০% এসে দাঁড়িয়েছে যদিও প্রতি বছর মাছের আহরণ বাড়ছে। এখন সময় এসেছে কীভাবে আমাদের সীমিত সম্পদ থেকে সর্বোচ্চ মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত করা যায় সেটি নিয়ে চিন্তা করার এবং এ বিষয়ে মনে হয় কারো দ্বিমত নেই যে, আমাদের উন্মুক্ত জলাশয়কে সঠিক ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে দেশীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। বর্তমানে আমাদের দেশে পুকুরের মৎস্য উৎপাদন প্রায় সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গেছে। সুতরাং পুকুর থেকে আরো মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ সীমিত। তাই আমাদের যে মৎস্যসম্পদ মোটামুটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে সেটিকে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পদে পরিণত করতে হবে। সেটি হলো আমাদের প্লাবনভূমি।

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ

আমাদের দেশে প্রায় ২৮.৩৩ লক্ষ হেক্টর প্লাবনভূমি রয়েছে। এসব প্লাবনভূমিতে বর্তমানে মাছ পাওয়া যায় প্রতি হেক্টরে প্রায় ১৫০ কেজি মাত্র। এসব জমি বর্ষা মৌসুমে পরিত্যক্ত বা অনাবাদী জমি হিসেবে পড়ে থাকে এবং শুষ্ক মৌসুমে ধান চাষ হয়। অর্থাৎ এগুলো এক ফসলী জমি হিসেবে গণ্য হয়। অতিসম্প্রতি এসব প্লাবনভূমিকে মাছ চাষের আওতায় আনার জন্য একটি নতুন কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে। সাধারণত প্লাবনভূমির তিন দিকে বা দুই দিকে রাস্তা বা গ্রাম থাকে এবং এক দিক বা দুই দিক খোলা থাকে। এ খোলা জায়গাটি বাঁধ দিয়ে বা বানা দিয়ে বন্ধ করে এখানে মাছের চাষ করা হয়। বাঁধের মাঝখানে কালভার্ট তৈরি করে পানি চলাচলের সুযোগ করে দেয়া হয়। যাতে বাইরে থেকে দেশীয় প্রজাতির মাছের রেণুপোনা প্লাবনভূমিতে প্রবেশ করতে পারে। এ পরিস্থিতিতে প্লাবনভূমিকে মাছ চাষের জন্য প্রস্তুত করে তাতে পোনা মজুদ, খাদ্য প্রয়োগ ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে একটি বিষয় খুবই উল্লেখ্যযোগ্য যে, এক একটি প্লাবনভূমিতে জমির পরিমাণ ন্যূনতম ৪০-৫০ হেক্টর। এত বিশাল জমির মালিক প্রায় ৪০০-৫০০ জন হয়। ৪০০-৫০০ জন লোক মিলে একটিমাত্র জলাশয়ে মাছ চাষ করা মানে একটি অংশীদারী ব্যবসা পরিচালনা করা। কারণ এখানে সবাই মিলে টাকা লগ্নী করতে হবে এবং কাজ শেষে লাভের অংশ সে আনুপাতিক হারে পাবে। এরূপ ক্ষেত্রে এত লোককে একত্রিত করে মাছ চাষ করা তথা ব্যবসা করা চাট্টিখানি কথা

নয়। এলাকার এ ৪০০-৫০০ জন লোক মিলে একটি প্লাবনভূমিতে যখন সামাজিকভাবে মাছ চাষ করে তখন একে বলে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র জমির মালিক নয়, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, ভূমিহীন কৃষক, শ্রমজীবী ও মহিলা নির্বিশেষে শেয়ারের মাধ্যমে একটি প্লাবনভূমিতে সুফলভোগী হিসেবে মাছ চাষে বিনিয়োগ করতে পারে। সমাজের সর্বস্তরের লোকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ মাছ চাষ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তাই এটি সমাজভিত্তিক মাছ চাষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষে করণীয়

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ যেহেতু একটা মৌসুমি মাছ চাষ, সেহেতু মাছের পোনা নির্বাচনের সময় একটা বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে সেটি হলো যে সব মাছের পোনা ৪-৬ মাসে খাবার যোগ্য মাছে পরিণত হয় সে সব মাছের পোনা মজুদ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তেলাপিয়া, পাঙ্গাস ও সিলভার কার্পের জুড়ি নেই। প্লাবনভূমিতে রুই জাতীয় মাছের ফলনও ভাল হয়। তবে প্লাবনভূমিতে রুই জাতীয় মাছের পোনা মজুদ করার সময় অবশ্যই ৪-৫ ইঞ্চি আকারের পোনা মজুদ করতে হবে। তাহলে এসব পোনা ৪-৬ মাসে খাবার যোগ্য মাছের আকারে পরিণত হবে। প্লাবনভূমিতে অতিসম্প্রতি কার্পের সাথে গলদা চিংড়ি চাষও জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে। গলদা চিংড়ির জন্য এক্ষেত্রে আলাদা কোন খাদ্য বা যত্নের দরকার হয় না এবং গলদা চিংড়ির পোনা বা পিএল এর মূল্য ব্যতীত অন্য কোন ব্যয় নেই। গলদা চিংড়ির উৎপাদনকে এক্ষেত্রে আমরা ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট বলতে পারি।

প্লাবনভূমিতে মৎস্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে প্রতি শতাংশে ৫০-৬০টি পোনা মজুদের পরামর্শ দেয়া হয়। যেহেতু ছয় মাসের মধ্যে ফলন পেতে হবে সে কারণে প্লাবনভূমির মাছচাষিরা মোটামুটি আধানিবিড় চাষ পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে যাচ্ছেন। এ পদ্ধতিতে মাছ চাষে সবচেয়ে ভাল ফল পাচ্ছেন কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি এলাকার চাষিরা। সত্যিকথা বলতে গেলে দাউদকান্দি উপজেলাই প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের পথিকৃত। কুমিল্লার মুরাদনগর, তিতাস, হোমনা, চান্দিনা ও চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় একই পদ্ধতিতে প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের প্রসার ঘটছে। এসব এলাকায় প্লাবনভূমিতে এখন প্রতি হেক্টরে গড়ে ২.৭০ মে.টন মাছ উৎপাদিত হচ্ছে। কোনো কোনো প্লাবনভূমিতে প্রতি হেক্টরে ৩.০০-৪.০০ মে.টন মাছও উৎপাদিত হচ্ছে। প্লাবনভূমিকে কীভাবে মাছ চাষের খনি বানানো যায় সে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সারাদেশ থেকে উৎসাহী লোকজন ভিড় জমাচ্ছে এসব এলাকায়। খুবই সফলভাবে অভিজ্ঞতা নিয়ে যশোরের ভবদহ অঞ্চলের অধিবাসীরা ভবদহের দুঃখ হিসেবে খ্যাত তাদের জলাবদ্ধ এলাকাকে এখন মাছের খনিতে রূপান্তরিত করেছে। এছাড়া রাজশাহী, নাটোর, গাইবান্ধা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ এবং গাজীপুর জেলাতেও প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের প্রসার ঘটেছে।

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের সুফল

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের সুফল বহুবিধ। এ পদ্ধতিতে মাছ চাষের ফলে অবকাঠামো হিসেবে নির্মিত কালভার্টের মাধ্যমে প্রাকৃতিক মাছের রেণুপোনা প্লাবনভূমিতে প্রবেশ করছে, ফলে জীববৈচিত্র্য রক্ষা পাচ্ছে, কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাস পাওয়ার কারণে জলজ পরিবেশের উন্নয়ন ঘটছে এবং নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে, পরিত্যক্ত জলাভূমি সম্পদে পরিণত হচ্ছে, সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, পুষ্টির অভাব দূর হচ্ছে, মহিলাদের ক্ষমতায়ন হচ্ছে, আয় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে শিক্ষার হার বাড়ছে, কৃষি জমিতে ধানের উৎপাদন ব্যয় কমে যাচ্ছে কিন্তু জমির উর্বরতার কারণে ধান উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মাছের উৎপাদন ১৫০ কেজি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হেক্টর প্রতি প্রায় ২৭০০ কেজি হচ্ছে। যেটি মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী অগ্রগতি বলা যায়। এভাবে এগিয়ে যেতে থাকলে এবং প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ দিন দিন প্রসারিত হতে থাকলে নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশে মাছের চাহিদা মিটিয়ে মাছ রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাবে।

ছবি: প্লাবনভূমিতে মৎস্য আহরণের দৃশ্য

প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্প

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের সাফল্যকে সামনে রেখে সারাদেশের ৪৭টি জেলার ২১২টি উপজেলার ৩১০টি প্লাবনভূমিকে মাছ চাষের আওতায় আনার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর 'বাংলাদেশের প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ' শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করেছে যার প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ২১৭.০০ কোটি টাকা। প্রকল্পটি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রায় ২০.০০ হাজার হেক্টর প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যাবে। ফলে দেশের মৎস্য উৎপাদনে বিপ্লব সৃষ্টি হবে আশা করা যায় এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা অনেকাংশে মিটানো সম্ভব হবে এবং প্রায় ১.৫০ লক্ষেরও অধিক লোকের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা দেশের বেকার সমস্যা দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে তাতে সন্দেহ নেই।

উপপরিচালক (মৎস্যচাষ), মৎস্য অধিদপ্তর

দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ : গুরুত্ব, হ্রাস পাওয়ার কারণ, বৃদ্ধির উপায় এবং করণীয়

কাজী ইকবাল আজম[১] ও মোঃ সামছুজ্জামান খান[২]

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম মিঠা পানির মাছের উৎসস্থল। এ দেশের জলাশয়গুলো দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রাকৃতিক আবাসস্থল এবং মাছ চাষের জন্য খুবই উপযোগী। আবহমানকাল থেকে বাংলাদেশের মানুষ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ ও জীবিকা নির্বাহে দেশীয় প্রজাতির মাছের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। আমাদের দেশে রয়েছে প্রায় ২৪ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ নদী ও মোহনা, ১১৪ হাজার হেক্টর বিল, ৬৮ হাজার হেক্টর আয়তনের কাপ্তাই লেক, ৫ হাজার হেক্টর জলায়তনের বাঁওড় বা মরা নদী, প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর আয়তনের সুন্দরবনের খাড়ি অঞ্চল এবং ২৮.৩ লক্ষ হেক্টর আয়তনের প্লাবনভূমি (মৎস্য অধিদপ্তর, ২০০৯-২০১০)। অতীতে এই বিশাল জলাভূমি প্রাকৃতিকভাবেই মৎস্যসম্পদে ভরপুর ছিল। ষাট ও সত্তর দশকে এ দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ আসতো এসব জলাভূমি থেকে। আহরিত মাছের যেমন ছিল প্রাচুর্যতা তেমনই ছিল তার প্রজাতি বৈচিত্র্যতা। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলেরই দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার আমিষের প্রধানতম উৎস হিসেবে অন্যতম উপাদান ছিল দেশীয় প্রজাতির বৈচিত্র্যপূর্ণ এসব মাছ। কালের বিবর্তনে এ সব দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রাচুর্যতা ও উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পুষ্টিহীনতার জন্য দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের অপ্রাপ্যতা অনেকাংশেই দায়ী। অন্যদিকে ছোট মাছের উৎপাদন কমে যাওয়ায় দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আয়ের উৎসও আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। তাই মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় দেশীয় প্রজাতির মাছ সকল বিবেচনায় অগ্রাধিকারযোগ্য।

ছোট মাছ

সাধারণত যে সমস্ত মাছ পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় ৯ ইঞ্চি বা ২৫ সেমি পর্যন্ত আকারের হয়, সেগুলোকে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ (Small Indigenous Species বা SIS) হিসেবে বিবেচনা করা হয় (Felts *et al.*, ১৯৯৬)। দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের মধ্যে গুলশা, পাবদা, মেনি (ভেদা), শিং, কৈ, টাকি, ফলি, দেশী পুঁটি, দেশী সরপুঁটি, বাচা, খৈলশা, টেংরা, মাগুর, চাপিলা, বাতাশি, বাইম, বাইলা বা বেলে, রাণী (বৌ মাছ), বাটা, কাজলি, গুজি, লাচু, টাটকিনি (ভাংনা), মলা, ঢেলা, গুতুম, কাকিলা ইত্যাদি অন্যতম।

ছোট মাছের পুষ্টিগত গুরুত্ব

মাছ হলো প্রাণিজ আমিষ সমৃদ্ধ সহজপাচ্য একটি খাদ্য। দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছে অধিক পরিমাণে ভিটামিন এ এবং ভিটামিন ডি বিদ্যমান, যা মানবদেহের হাঁড়, দাঁত, চর্ম ও চোখের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাছাড়া এ সমস্ত মাছে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, আয়োডিন ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে থাকে যা মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়িয়ে দেয়। দেশীয় ছোট মাছ বিশেষ করে মলা, পুঁটি, ঢেলা ইত্যাদি পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ বিধায় রাতকানা ও রক্তশূন্যতাসহ অপুষ্টিজনিত রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছোট মাছের কাঁটা ও মাথার অংশে এবং মাংসপেশীতে প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও জিঙ্ক থাকে যা শিশুদের হাড় গঠনে খুবই উপযোগী। ফসফরাস দেহে নতুন কোষ গঠনে সহায়তা করে থাকে। তাছাড়া লাইসিন ও সালফার সমৃদ্ধ অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড ছোট মাছে বেশি পরিমাণে থাকে। নিম্নে দেশীয় প্রজাতির কয়েকটি মাছের পুষ্টি গুণাগুণ দেখানো হলো-

দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের নাম	পানি (%)	চর্বি (%)	আমিষ (%)	ছাই (%)	ক্যালসিয়াম (মিগ্রা/১০০গ্রা)	ফসফরাস (মিগ্রা/১০০গ্রা)	আয়রন (মিগ্রা/১০০গ্রা)
কৈ	৭০.০	৮.৮০	১৪.৮	২.০০	৪১০	৩৯০	১৩৫
টাকি	৭৪.০	০.৬০	১৯.৪	২.৬০	৬১০	৫৩০	১৩০
বেলে	৭৯.৭	০.৬০	১৪.৫	২.৩০	৩৭০	৩৩০	১০৪
শিং	৬৮.০	০.৬০	২২.৮	১.৭০	৬৭০	৬৫০	২২৬
বাটা	৭৯.০	২.৪৮	১৪.৩	২.০০	৭৯.০	২০০	১.০৯
ফলি	৭৩.০	১.০০	১৯.৮	২.৫০	৫৯০	৪৫০	১৬৯
সরপুঁটি	৭০.২	৯.৫০	১৬.৫	১.৫৩	২২০	১২০	০.৫৪

উৎস: CSIR, India (1962)

ছোট মাছের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

মাংস এবং তৈলাক্ত বড় মাছ স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে বিশবব্যাপী স্বাস্থ্য সচেতনতা বেড়ে যাওয়ার ফলে আজকাল স্বচ্ছল মানুষের খাবারের মেনুতে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ এক বিশেষ স্থান দখল নিয়েছে। তাই ক্রেতার ভিড় বেড়েছে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের বাজারে। ফলে আর্থিক লাভের কথা বিবেচনায় রেখে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের চাষ ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ছোট মাছ মজুদের দুই-তিন মাস পর থেকে নিয়মিত বিরতিতে মাছ ধরে পরিবারের প্রয়োজনীয় মাছের চাহিদা পূরণ এবং অতিরিক্ত মাছ বাজারে বিক্রি করা যায়। বড় মাছের তুলনায় বাজারে ছোট মাছের দাম বেশি পাওয়ায় চাষিরাও অর্থনৈতিকভাবে অধিক লাভবান হচ্ছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারেও ছোট মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

ছোট মাছ হ্রাস পাওয়ার কারণসমূহ

প্রকৃতিক জলাশয়ের অবক্ষয় বা জলজ পরিবেশের বিপর্যয়ের ফলে অনেক দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রাচুর্যতা দিন দিন কমে যাচ্ছে। এমনকি অনেক মাছ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণগুলো হলো-

প্রাকৃতিক কারণসমূহ

- নদীর উৎসমুখ ভরাট ও গতিপথ পরিবর্তন।
- উজান থেকে আসা পলির কারণে নদ-নদীতে নাব্যতা হ্রাস।
- খাল-বিল, নদী-নালা ইত্যাদি জলাভূমিতে পলি ভরাট হয়ে গভীরতা হ্রাস।
- খাল-বিল ও প্লাবনভূমির সাথে নদীর সংযোগ খাল ভরাট বা সঙ্কোচিত হয়ে যাওয়া।
- প্লাবনভূমির প্রতিবেশ (Ecosystem) পরিবর্তন।
- মাছের রোগবালাই।

মনুষ্যসৃষ্ট কারণসমূহ

- নির্বিচারে মা ও পোনা মাছ ধরা বা ধ্বংস করা।
- অপরিকল্পিতভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, স্লুইস গেইট, রাস্তা, সেচ অবকাঠামো ও কালভার্ট নির্মাণ।
- কৃষিক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত ও নিষিদ্ধ কীটনাশকের যথেচ্ছা ব্যবহার।
- কলকারখানার বর্জ্যের মাধ্যমে জলাশয় দূষণ।
- জলাশয় শুকিয়ে বা বারবার সেচে মাছ ধরার ফলে মাছের বংশ নষ্ট হওয়া।
- প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা মাছ/মাছের পোনা নিধন।
- জলাভূমিকে কৃষি ভূমিতে রূপান্তর।
- খাল-বিল ভরাট করে জনপথ গড়ে তোলা।
- কারেন্ট জালসহ অন্যান্য অননুমোদিত ক্ষতিকর জাল ও ফাঁদের ব্যাপক ব্যবহার।
- বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক বড় মাছের চাষ করার সময় পুকুর-দীঘি থেকে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছকে আমাছা হিসেবে গণ্য করে বিষ প্রয়োগ বা অন্য কোন উপায়ে অপসারণ করা।
- প্রাকৃতিক জলাশয়ে বিদেশি প্রজাতির মাছের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবেশের ফরে ক্ষতিকর প্রভাব।

ছোট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে করণীয়

বাংলাদেশের মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বর্তমানে ছোট মাছের অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হচ্ছে আবাসস্থলের ব্যাপক সংকোচন এবং প্রকৃতিক জলজ পরিবেশের বিবর্তন। অপরিকল্পিত ও সমন্বয়হীন উন্নয়ন এবং উৎপাদন ব্যবস্থার কারণে সামগ্রিকভাবে অন্যান্য মাছের মতো ছোট মাছের উৎপাদনও ক্রমশ কমে আসছে। জলজ পরিবেশের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ছোট মাছের বংশবিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করে এদের উৎপাদন বাড়াতে হবে। দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন

সারাদেশে ছোট ছোট অনেক নদ-নদী ও খাল-বিল এবং তদ্‌সংলগ্ন জলাশয়সমূহ বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে ছোট মাছের অবাধ বিচরণ ও প্রজননের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ সকল জলাশয় সামান্য সংস্কার করে পুনরায় ছোট মাছের অবাধ বিচরণক্ষেত্রে পরিণত করা যেতে পারে।

২. অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা

মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে দেশের নদ-নদী বা অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে ছোট মাছের অবৈধ ও অনিয়ন্ত্রিত আহরণ বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরি। এ উদ্দেশ্যে সারাদেশে বিভিন্ন নদ-নদী, হাওর, বাঁওড় ও বিলের নির্বাচিত অংশে নিয়ন্ত্রিতভাবে ছোট মাছের আহরণ বন্ধ ও তাদের বংশবিস্তারের লক্ষ্যে মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩. চাষ ও পোনা অবমুক্তির মাধ্যমে ছোট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি

বদ্ধ জলাশয়ে চাষের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে-

- দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ পুকুর-দীঘিসহ সকল চাষোপযোগী জলাশয়ে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ মুজদ করা।
- ছোট মাছের বংশবৃদ্ধি ও খাদ্য যোগানের সুবিধার্থে পুকুরের কিনারে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় জলজ উদ্ভিদ যেমন- কলমি, হেলেঞ্চা, মালঞ্চ ইত্যাদি রাখার ব্যবস্থা করা।
- ছোট মাছের প্রজনন মৌসুম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জনগণকে সচেতন করা এবং সে সময় পুকুরে জাল টানা থেকে বিরত থাকা অথবা প্রয়োজনে বড় ফাঁস বিশিষ্ট জাল

ব্যবহার করা।

- পুকুর প্রস্তুত করার সময় রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণে বিষ প্রয়োগকে নিরুৎসাহিত করা এবং বার বার জাল টানা পদ্ধতি ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
- জলাশয় ও রাস্তার পাশের খাদে অথবা বরোপিটে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ছোট মাছ চাষ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- পুকুর ও অন্যান্য জলাশয় সম্পূর্ণরূপে সেচে মাছ আহরণ করা থেকে বিরত থাকা, তবে পুকুর শুকানো আবশ্যক হলে এক কোনায় কুয়া বা গর্ত তৈরি করে ছোট প্রজাতির মাছ রাখার ব্যবস্থা করা।

৪. দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা উৎপাদন ও প্লাবনভূমিতে মজুদকরণ

দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের ক্রমহ্রাসমান অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে অতিবিপন্ন ও সঙ্কটাপন্ন দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছগুলোর প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদিত পোনা দেশের উন্মুক্ত জলাশয়ে বিশেষ করে প্লাবনভূমিতে ছাড়া জরুরি।

৫. মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন

নির্বিচারে পোনা ও ডিমওয়ালা মাছ নিধন মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধির পথে বড় অন্তরায়। এ কারণে আমাদের দেশে মৎস্যসম্পদ বিশেষ করে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে। মাছের বিলুপ্তি রোধকরণ, নিয়ম মাফিক মৎস্য আহরণ ও প্রজননক্ষম মাছকে রক্ষা করার জন্য মৎস্য আইনের যথযথ বাস্তবায়ন অতীব জরুরি।

৭. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি

ছোট মাছের বর্তমান আশঙ্কাজনক অবস্থার উত্তরণ ও তাদের আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে দেশবাসীকে সচেতন করে তুলতে হবে। শুকনো মৌসুমে সেচের মাধ্যমে জলাশয়সমূহকে পুরোপুরি শুকিয়ে ফেলা, শস্যতে নিষিদ্ধ কীটনাশক অতিমাত্রায় ব্যবহার, ব্যাপকহারে ডিমওয়ালা ও পোনা মাছ নিধন কুফল ইত্যাদি কুফল সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতে হবে। এ ব্যাপারে রেডিও, টিভিসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে।

ছোট মাছ রক্ষায় মৎস্য অধিদপ্তরের ভূমিকা

বিগত দু'দশক থেকে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণ ও তার যথাযথ উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমও ইতোমধ্যেই পরিচালিত হয়েছে। বিশেষায়িত দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণসহ আবাসস্থল উন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর 'চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ' শীর্ষক একটি প্রকল্পের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

- চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয়গুলোর আবাসস্থল ও প্রতিবেশ (ecosystem) পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি;
- দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণ, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার;
- সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন; এবং
- প্রকল্পভুক্ত এলাকাতে মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

চলমান এ প্রকল্পের প্রকল্পের মূল কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে-

- দেশের ১৭টি জেলার অন্তর্গত ৩৯টি উপজেলায় মোট ৭০টি চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয়ের আবাসস্থল উন্নয়ন করা।
- ৫৭টি সরকারী মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার এবং ৫০০টি বেসরকারী খামারে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের প্রজনন/নার্সারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- দেশের বিভিন্ন জলাশয়ে ২৫০ লক্ষ দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা মজুদকরণ।
- মৎস্য অধিদপ্তরের ৪০০জন কর্মকর্তা/কর্মচারি এবং ৩৭৫০ জন মৎস্যচাষি/মৎস্যজীবী/ সমাজভিত্তিক সংগঠনের সদস্যকে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান।
- দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ওপর কর্মশালা, দেশব্যাপী সেমিনার, র‍্যালি, পথ নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২৮৫ লক্ষ দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের পোনা উৎপাদনসহ ১৫০ মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদন।

দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের উৎপাদন বাড়াতে হলে দেশের সকল অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের ভূপ্রকৃতিগত অবস্থান অতীতের কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। অন্তত আংশিক জলাশয়ে সাং-বাৎসরিক পানি থাকার উদ্যোগ নিতে হবে। যে অঞ্চলে/জলাশয়ে যে যে দেশীয় মাছ অতীতে ছিল অথচ এখন বিরল এমন প্রজাতি নতুন করে স্থান করে দিতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যময় পরিবেশ রক্ষার্থে ছোট মাছের সংরক্ষণ অতীব জরুরি। এজন্য প্রয়োজন গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সার্বিক সফলতা অর্জন সম্ভব।

১. প্রকল্প পরিচালক, চিহ্নিত অক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা ও দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর
২. সহকারী পরিচালক, চিহ্নিত অক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা ও দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে আরএফএলডিসি-বরিশাল এর ভূমিকা

মোঃ মনোয়ার হোসেন[১], কেনেথ হ্যান্স অটো গুগ[২] ও মোহাম্মদ আলী রেজা[৩]

এ দেশের খামার ব্যবস্থায় দেখা যায় আপামর দরিদ্র কৃষি পরিবার তাদের জীবিকার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ক্ষেত্রসমূহের বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করে থাকে। আর্থিক ঝুঁকি মোকাবেলা, বিবিধ/বৈচিত্র্যময় সম্পদ ব্যবহারে উৎপাদন বহুমুখীকরণ এবং তার ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধিতে (ইনটেনসিটি) চাষি/গ্রামীণ পরিবার এসকল কর্মকাণ্ড ক্ষুদ্র পরিসরে বাস্তবায়ন করে থাকে। আর এ সমন্বিত কর্মকাণ্ডকে গুরুত্ব দেয়ার সাথে সাথে সহনশীল পর্যায়ে এগিয়ে নেয়ার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ডানিডার যৌথ উদ্যোগে Regional Fisheries and Livestock Development Component (RFLDC) প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়।

প্রকল্পের লক্ষ্য

দরিদ্র গ্রামীণ পরিবারের মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ কর্মকাণ্ডসমূহ থেকে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি এবং এগুলোর উন্নত ও টেকসই উন্নয়ন সাধন ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

(১) দরিদ্র পরিবারসমূহের জন্য ফলপ্রসূভাবে বিকেন্দ্রিক, সমন্বিত ও চাহিদাভিত্তিক মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ সেবা প্রদান; (২) স্থানীয় বেসরকারি ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে চাহিদা অনুযায়ী সেবা পাওয়ার জন্য সমাজভিত্তিক সংগঠন এবং চাষি সজ্ঘ/এসোসিয়েশন তৈরি; (৩) গুণগতমানের উপকরণ সহজলভ্য করা এবং উৎপাদিত পণ্য লাভজনকভাবে বাজারজাতকরণ সুবিধার জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সংযোগ তৈরি করা; (৪) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ (ইউনিয়ন পরিষদ) যাতে করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে স্থানীয় সমাজের/জনগণের চাহিদা মেটাতে পারে সেজন্য কাজ করা; (৫) নির্বাচিত বদ্ধ ও আধা/আংশিক বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষ/ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন।

অভীষ্ট জনগোষ্ঠী ও লক্ষ্যমাত্রা

প্রকল্পের প্রধান অভীষ্ট জনগোষ্ঠী হচ্ছে দরিদ্র পরিবার তথা নারীপুরুষ এবং মৎস্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে সে সমস্ত নারীপুরুষ প্রকল্পের অভীষ্ট জনগোষ্ঠী যারা মাছ চাষ বা সংশ্লিষ্ট কাজে জড়িত অথবা যাদের জন্য এ সমস্ত কাজে জড়িত হওয়ার সুযোগ আছে। আর এ সমস্ত কাজ বা কাজের সুযোগ হতে পারে নিজস্ব পুকুর বা জলাশয়ে অথবা অন্যের পুকুর বা জলাশয়ে ইজারা বা বর্গাচাষের মাধ্যমে। দরিদ্র, এমনকি ভূমিহীন পরিবারের জন্য খাসপুকুর বা জলাশয় বিশেষ করে জলমহালে মাছ চাষ হচ্ছে উল্লেখযোগ্য আয়মূলক কর্মকাণ্ড। প্রকল্পটি সমগ্র বরিশাল বিভাগে পরিচালিত হচ্ছে বিধায় এখানকার নদী, খাল ও অন্যান্য মুক্ত জলাশয়সমূহ ভূমিহীন পরিবারের জন্য এনে দিয়েছে বিশেষ সুযোগ। ভূমিহীন পরিবারসমূহ এ সমস্ত মুক্ত জলাশয়ে খাঁচা, পেন পদ্ধতিতে মাছ এবং এমনকি কাঁকড়া চাষ করছে।

কর্ম এলাকা

আরএফএলডিসি বরিশাল বিভাগের সকল উপজেলাতেই (৪০টি) কাজ করছে। তবে, বরগুনা, পটুয়াখালী ও ভোলা জেলার সবকটি (১৯টি) উপজেলার সকল ইউনিয়নে কাজ করছে তবে বরিশাল জেলার তিনটি এবং ঝালকাটি ও পিরোজপুর জেলাসমূহের একটি করে উপজেলার সবকটি ইউনিয়নে প্রকল্পটির কার্যক্রম বিস্তৃত। বরিশাল বিভাগের বাকি ষোলটি উপজেলার কিছু কিছু ইউনিয়নে প্রকল্পের কর্মকাণ্ডসমূহ পরিচালিত হচ্ছে।

মৎস্য সম্প্রসারণ সেবা প্রদান

মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে প্রকল্পের প্রথম কাজ হচ্ছে চাষিদের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন তথা সম্প্রসারণ সেবা প্রদান। আর এ জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের কাজটি করা হয় মূলত কৃষক মাঠ স্কুল (Farmer Field School-FFS) এর মাধ্যমে। কৃষক মাঠ স্কুল (এফএফএস) হচ্ছে এমন একটি স্কুল যেখানে অংশগ্রহণকারী (ছাত্র/প্রশিক্ষণার্থী) ও সহায়তাকারী (শিক্ষক/প্রশিক্ষক) উভয়ই চাষি। কৃষক মাঠ স্কুল একটি অংশগ্রহণমূলক ও নমনীয় শিখন প্রক্রিয়া, যেখানে চাষিরা হাতেকলমে কাজের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন ঘটায়। এ উপলক্ষে কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্যরা নিজেদের খামারে/বাড়িতে সনাতন ও উন্নত উভয় পদ্ধতির ব্যবহারিক অনুশীলন এবং প্রাপ্ত ফলাফলের তুলনামূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সঠিক পদ্ধতিটি বেছে নেয়ার সুযোগ পায়। সনাতন ও উন্নত উভয় পদ্ধতির এ ব্যবহারিক অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণ তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজটি পুরোটাই চাষিদের দ্বারা সম্পাদিত হয় বিধায় তা চাষিদের ক্ষমতায়নে সহায়তা করে থাকে। চাষি তার নিজের খামারে এবং হাতেকলমে কাজ করে বিধায় তা ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আর এভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তটি চাষিদের মাঝে দীর্ঘস্থায়ী হয়। পাশাপাশি, চাষি থেকে চাষি শিখন প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে কৃষক মাঠ স্কুলসমূহের মধ্যে আন্তপরিদর্শন বা ক্রসভিজিট আয়োজন এবং সফল চাষি/চাষিদল কর্তৃক আয়োজিত মাঠদিবস পালন বিশেষ ভূমিকা রাখে।

প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের উপর পরিচালিত মধ্যবর্তী স্বতন্ত্র মূল্যায়নে দেখা গেছে যে, কৃষক মাঠ স্কুলের ৮২% সদস্য চাষি তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা খুব ভাল পর্যায়ে নিতে পেরেছে। মূল্যায়ন দলের এ পর্যবেণের যথার্থতা মাছের উৎপাদনের ক্ষেত্রেও পরিলতি হয়েছে। একই মূল্যায়নে দেখা যায়, কৃষক মাঠ স্কুলে যোগ দেয়ার কারণে এক বছরের মধ্যে মাছের উৎপাদন সার্বিকভাবে ৩৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। জলমহালসমূহে অভয়াশ্রম তৈরির কারণে ছোট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিলুপ্তপ্রায় অনেক প্রজাতির মাছের পুনরাবির্ভাব

ঘটেছে। আর এ কারণে স্বতন্ত্র এ মূল্যায়ন দলটি মাছ চাষ এবং এর টেকসই উন্নয়নের জন্য আইএফএলডিসিকে কৃষক মাঠ স্কুল অ্যাপ্রোচ আরও দীর্ঘ সময় বিশেষত কাঙ্ক্ষিত সংখ্যক চাষিকে প্রশিক্ষিত করা পর্যন্ত চালিয়ে যেতে বলেছে।

কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্যদের মধ্যে যার যোগাযোগ তৈরি, উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ সহায়তা/পরিচালন দক্ষতা ভাল, সাধারণত এমন দুজন (একজন নারী ও একজন পুরুষ) সদস্যকে কৃষক মাঠ স্কুল পরিচালনার জন্য সহায়ক/প্রশিক্ষক হিসেবে নির্বাচন করা হয়। স্থানীয় এলাকা থেকে নির্বাচন করা এবং ঐ স্থানীয় এলাকায় কাজ করার জন্য নিয়োগ দেয়া হয় বিধায় তাঁদেরকে স্থানীয় সহায়ক বা লোকাল ফ্যাসিলিটেটর (এলএফ) বলা হয়ে থাকে। স্থানীয় সহায়ক বা প্রশিক্ষকদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প চলাকালীন বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ দেয়াসহ অন্যান্য কার্যক্রম যেমন, আন্তপরিদর্শন বা ক্রসভিজিট আয়োজন করা হয়ে থাকে। এলএফদেরকে স্থানীয় পর্যায়ে একজন আদর্শ চাষি হিসাবে গড়ে তোলা হয় যা পক্ষান্তরে কৃষক মাঠ স্কুল পরিচালনা এবং এলাকায় স্থানীয় সম্প্রসারণ কর্মী হিসাবে কাজ করতে সহায়তা করে থাকে। মৎস্যচাষ বিষয়ে এলএফদের জ্ঞান ও দক্ষতা বেশ উন্নত এবং তাঁরা চাষি সংগঠনের সদস্য বিধায় চাষি সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন আয়মূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হয়ে থাকে। প্রকল্প আশা করছে যে, প্রকল্প শেষে এ সমস্ত এলএফ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্থানীয় এলাকায় প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ সেবা প্রদানে সক্ষম হবে। ইতোমধ্যেই প্রকল্প কর্তৃক উন্নয়নকৃত কিছু সংখ্যক এলএফ এ কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছে।

প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহারের জন্য সমাজভিত্তিক সংগঠন তৈরি

লব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা ধরে রাখা তথা কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদন উপকরণ প্রাপ্তি এবং এ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে কৃষক মাঠ স্কুল শেষে চাষিদেরকে চাষি সংগঠন বা সমাজভিত্তিক সংগঠন তৈরি করার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়। সফলভাবে শেষ করা কৃষক মাঠ স্কুলের চাষিরা প্রকল্প এলাকার ২৩০টি ইউনিয়নে এ পর্যন্ত ২৫৬টি চাষি সংগঠন বা সমাজভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) তৈরি করেছে। সংগঠনের সদস্যদের মাঝে সুলভ মূল্যে ও যথাসময়ে গুণগতমানের উৎপাদন উপকরণ ও সেবা প্রদান এবং সদস্য কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য সবচেয়ে ভাল মূল্যে বিক্রয়ের কাজে তৃণমূল পর্যায়ের এ সমস্ত চাষি সংগঠন সমবায় ভিত্তিতে কাজ করে আসছে। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। বহুসংখ্যক চাষির (সিবিও) চাহিদা অনুযায়ী বিপুল পরিমাণ উৎপাদন উপকরণ একত্রে দামাদামি করার মাধ্যমে কম মূল্যে ক্রয় করে চাষিদের মাঝে সরবরাহ করতে পারে। ঠিক একইভাবে, বহুসংখ্যক চাষির উৎপাদিত পণ্য সংগ্রহ করে তা একত্রে আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় বাজারে বিক্রয় করার কারণে অধিক মূল্য পাওয়ার সুযোগ থাকে।

উপকরণ সরবরাহ বা উপাদিত পণ্য বিক্রয় ছাড়াও সিবিওসমূহ মৎস্য বা কৃষি উন্নয়নে অন্যান্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সিবিওসমূহ স্থানীয় এলাকার হাজামজা বা অব্যবহৃত পুকুর, খাল বা অন্যান্য জলাশয় ইজারা নিয়ে, এমনকি নদীতে খাঁচায় মাছ চাষের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়নে সিবিওসমূহ বিশেষ ভূমিকা রেখে থাকে। সিবিওসমূহ এলএফ নিয়োগ থেকে শুরু করে কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়নের প্রশাসনিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার সকল কাজই করে থাকে।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সংযোগ তৈরি

গুণগতমানের উৎপাদন উপকরণ সুলভ মূল্যে ও যথাসময়ে ক্রয়, বিশেষ করে একসাথে বিপুল পরিমাণে উপকরণ ক্রয়ের সুযোগের কারণে চাষি সংগঠনসমূহ সাধারণত উৎপাদনকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তা সরাসরি ক্রয় করে থাকে। আর এ কারণেই প্রকল্প সিবিওসমূহের সাথে উপকরণ উৎপাদনকারি/সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরিতে সহায়তা করে থাকে। উপকরণসমূহ যাতে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয় সেজন্য আগ্রহী উদ্যোক্তাদের প্রকল্প বিভিন্ন ধরনের কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ উপকরণের গুণগতমান এবং প্রকল্পের সাহায্যপুষ্ট সিবিওসমূহকে তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাজারের চেয়ে কম মূল্যে ও যথাসময়ে সরবরাহ নিশ্চিত করবে। এ উপলক্ষে সিবিও ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ

মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তথা ইউনিয়ন পরিষদ যাতে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য প্রকল্প কাজ করছে। এ উপলক্ষে ইউনিয়ন পরিষদের বিশেষত কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা যেমন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা/ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রকল্প থেকে সহায়তা প্রদান করা হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ বা ক্রসভিজিট ছাড়াও তাদের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য থোক অনুদান (প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী) প্রদান করে থাকে।

আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কম্পোনেন্ট তার সাড়ে তিন বছরের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছে যে, বরিশাল বিভাগে মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের অপার সুযোগ রয়েছে। উন্মুক্ত জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষ, উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষ ও পেনে মাছ চাষ অন্যতম। আর মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে অত্র এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত প্রয়াস বিশেষ করে গুণগতমানের উপকরণ সরবরাহ ও উৎপাদিত পণ্য ভাল মূল্যে বিক্রয়ের জন্য চাষির সাথে বেসরকারি কৃষি উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানের সংযোগ অতীব জরুরি।

১. প্রকল্প পরিচালক, আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কম্পোনেন্ট-বরিশাল
২. সিনিয়র এ্যাডভাইজার, আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কম্পোনেন্ট-বরিশাল
৩. প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কম্পোনেন্ট-বরিশাল

অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র্য বিমোচনে মৎস্য অধিদপ্তরের ভূমিকা

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম[১] ও মোঃ শফিক উদ্দিন[২]

এ দেশের কিছু কিছু এলাকার জনগণ ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে নদী ভাঙ্গন, বন্যা, খরা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষার অভাব, জন্ম নিয়ন্ত্রণে অসেচনতা, অপর্যাপ্ত শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান ইত্যাদির ফলে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে কর্মহীন হয়ে পড়ে। কাজের অভাবহেতু অর্থনৈতিক দৈন্যতায় ক্রয়ক্ষমতা লোপ পায় বিধায় জনগণের খাদ্য ঘাটতিসহ জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই এসব এলাকাকে অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সাময়িকভাবে কাজের অভাবে অর্থনৈতিক দৈন্যতা ও খাদ্য ঘাটতিতে জনগণের স্বাভাবিক জীবন হয় বিপর্যস্ত। ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী এসব এলাকায় প্রায় ৫৮% জনগণ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে, এদের মধ্যে ৩০% নদীভাঙ্গনের ফলে ভূমিহীন ও গৃহহীন হওয়ায় চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বর্তমান সরকার নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় মৎস্য অধিদপ্তর মাছ চাষ ও মৎস্য সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের পথ প্রশস্ত ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে 'অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প' এর আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে-(১) জলাশয় খনন বা পুনঃখননের মাধ্যমে দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী জনগণের জন্য মৎস্য সেক্টরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; (২) নির্বাচিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে জলাশয় উন্নয়ন ও বরাদ্দকরণ; (৩) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মহীন লোকদের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন এবং তাদেরকে মৎস্যচাষ ও অন্যান্য আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং (৪) মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র এলাকার জনগণের অপুষ্টি কমানো।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১. মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন: বাংলাদেশে মুক্ত জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর। এর মধ্যে নদী ও মোহনা প্রায় ১০.৩২ লক্ষ হেক্টর, হাওর, বাঁওড় ও বিল প্রায় ১.১৪ লক্ষ হেক্টর, কাপ্তাই লেক প্রায় ০.৮৯ লক্ষ হেক্টর এবং প্লাবনভূমি ২৮.৩৩ লক্ষ হেক্টর। অভ্যন্তরীণ এসব জলাশয় জলজ জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হলেও প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ কর্মকাণ্ডের ফলে মুক্ত জলাশয়ে জলজ জীববৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে বিপন্ন হতে চলছে মৎস্য প্রজাতিসমূহ। এসব প্রজাতির মাছসহ জীববৈচিত্র্যের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে এবং মা মাছকে রক্ষা করে বংশবিস্তারের মাধ্যমে মাছের প্রাচুর্য বৃদ্ধি করার জন্য মৎস্য অভয়াশ্রম একটি অতি আবশ্যকীয় টুল হিসেবে কাজ করছে।
দেশীয় প্রজাতির মৎস্যসমূহের বংশবৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে পোনামাছকে কাঙ্ক্ষিত আকারে পৌঁছানো এবং মা মাছকে রক্ষার জন্য এ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে, এতে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মাছ বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং আশেপাশের এলাকাসমূহে দেশীয় প্রজাতির মাছের পর্যাপ্ততা বৃদ্ধি পাবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত ১৩৫টি উপজেলায় দু'টি করে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করা হবে। প্রতিটি মৎস্য অভয়াশ্রমের আয়তন হবে প্রায় ০.৫০ হেক্টর।

ছবি ১: মৎস্য অভয়াশ্রম

২. জলাশয় পুনঃখনন: দরিদ্রপীড়িত অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকায় অনেক পুকুর/বরোপিট ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলে মাছ চাষ করা সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে মাছ চাষ করা হলেও বছরের অল্প সময় পানি থাকে। এ সমস্ত জলাধার উন্নয়ন করে মাছ চাষের উপযোগী করার জন্য পুকুর, বরোপিট ও অন্যান্য বদ্ধ জলাশয় পুনঃখনন করে পার্শ্ববর্তী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনুকূলে বরাদ্দপূর্বক মাছ চাষে নিয়োজিত করার সংস্থান প্রকল্পে রাখা হয়েছে। এতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দ্বারা জলাধারের পুনঃখনন ও মাছচাষে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং আয়ের পথ সুগম হবে।

৩. স্পিলওয়ে নির্মাণ: অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার অনেক বিলের পানি শুকনো মৌসুম আসার আগেই নালা বা খাল দিয়ে বের হয়ে যায় এবং বিল শুকিয়ে যায়। ফলে মৎস্য আবাসস্থল বিনষ্ট হয় এবং বিলের পার্শ্ববর্তী মৎস্যজীবীগণ বিলে পানি ও মাছ না থাকায় কর্মহীন হয়ে পড়ে। এ কারণে প্রকল্পে বিলের পানি নিস্কাশনের পথে স্পিলওয়ে নির্মাণের সংস্থান রাখা হয়েছে। স্পিলওয়ে মূলত বিলের পানি নির্গমন পথে একটি স্বল্প উচ্চতার আরসিসি নির্মিত বাঁধস্বরূপ। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাতের ফলে বিলে পানি জমা হয় এবং অতিরিক্ত পানি স্পিলওয়ের উপর দিয়ে চলে যেতে পারবে এবং নির্ধারিত উচ্চতায় সারা বছর জলাশয়ে পানি ধরে রাখা সম্ভব হবে। এতে বিলের পানিতে মাছের অনুকূল আবাসস্থল নিশ্চিত হবে।

৪. মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদ: মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে মানুষ আমিষের চাহিদা পূরণ এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রতিনিয়ত মুক্ত জলাশয় হতে বিভিন্ন সরঞ্জাম ব্যবহার করে ও জলাশয় সেচ দিয়ে মাছের অতিআহরণ করে থাকে। সেসঙ্গে জলাশয় ভরাট হওয়া, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, প্রজননক্ষম

মাছের অভাব, জলাশয় দূষিত হওয়া ইত্যাদি কারণে মাছের প্রজনন ও বংশবিস্তার দারুণভাবে ব্যাহত হয়। ফলে জলাশয়ে মাছ বড় হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা ও খাদ্য থাকলেও মাছের পর্যাপ্ত প্রবেশন না থাকার কারণে উৎপাদন নিতান্তই হতাশাজনক হয়ে থাকে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উৎকৃষ্ট পন্থা হলো জলাশয়সমূহে সঠিক সময়ে সঠিক প্রজাতি ও আকারের পোনা মজুদ করা। এতে প্রত্যক্ষভাবে জলাশয়ে মাছের মজুদ আকার বৃদ্ধি হবে এবং পরবর্তীতে মজুদকৃত পোনার দৈহিক ওজন বৃদ্ধির ফলে মাছের উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে।

৫. মৎস্য আইন বাস্তবায়ন তরান্বিতকরণ: ছোট পোনা ও ডিমওয়ালা মাছকে রক্ষার জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও লজিস্টিক সহায়তার অভাবে মৎস্য সংরক্ষণ আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে মৎস্য আইনের সুফল পাওয়া যায় না। অত্র প্রকল্পে মৎস্য আইন বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের সংস্থান রাখা হয়েছে। এতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের ফলে মাঠ পর্যায়ে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ করে উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

৬. সুফলভোগী প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা: উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জ্ঞানের বিকল্প নেই। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ প্রকল্পে মাছ চাষ ও অন্যান্য আয়বর্ধক কর্মসূচির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রশিক্ষণসমূহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পাশাপাশি সমাজভিত্তিক সংগঠনের সদস্যবৃন্দের সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার ব্যবস্থা রয়েছে।

ছবি ২: প্রকল্পের কেন্দ্রীয় কর্মশালায় মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও মহাপরিচালক

৭. বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম: মাছ চাষ কার্যক্রমে তাৎক্ষণিকভাবে কোন আয় বা ফলাফল পাওয়া যায় না, কমপক্ষে ৬ মাস সময়ের প্রয়োজন হয়। উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রজনন মৌসুমে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কিন্তু গরীব মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীগণ এ সময়ে অন্য কোন কার্যক্রমে জড়িত না থাকলে তাদের আর্থিক সংকটে পরতে হয়। সেলক্ষ্যে গরীব মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবী এবং বেকার যুবকদের জাল বুনন, বাঁশের ঝুড়ি তৈরি, মাছ ব্যবসা, পোনা ব্যবসা, হাঁস ও মুরগিপালন, সেলাই কাজ, রিক্সা ভ্যান চালানো ইত্যাদি আয়বর্ধক কার্যক্রমের সংস্থান প্রকল্পে রাখা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রদানের পর প্রত্যেক সদস্যকে আয়বর্ধক কাজের জন্য আর্থিক অথবা উপকরণ সহায়তা দেয়া হয়ে থাকে।

৮. মাছ ধরার জাল বিনিময়; অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকায় অনেক সময় ক্ষতিকর জাল (কারেন্ট জাল, যা চটজাল ইত্যাদি) মাছ ধরার কাজে ব্যবহার করা হয়, যা অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদনে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হয়। এ সমস্ত ক্ষতিকর জাল যাতে মাছ ধরার কাজে ব্যবহার না হয় সে জন্য মৎস্যজীবীদের নিকট থেকে এ সমস্ত জাল নিয়ে মৎস্য-বান্ধব নতুন জাল মৎস্যজীবীদের সরবরাহ করার ব্যবস্থা এ প্রকল্পে রাখা হয়েছে। এতে উন্মুক্ত জলাশয়ে ছোট মাছ বড় হওয়ার সুযোগ পাবে এবং মৎস্যজীবীগণও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

৯. সমাজভিত্তিক সংগঠন তৈরি: প্রকল্প কার্যক্রম, সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন ও প্রকল্প পরবর্তী সময়ে কার্যক্রমকে ধরে রাখার জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) তৈরি করা হবে। প্রকল্পভূক্ত প্রতিটি উপজেলায় ৩টি করে সমাজভিত্তিক সংগঠন গঠিত হবে এবং প্রতিটি সংগঠনে প্রকল্প পার্শ্ববর্তী এলাকার ২০ জন সদস্য থাকবে। সিবিও সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য তাদের সচেতনমূলক কর্মশালার মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়নে অবদান রাখতে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

সিবিও সদস্যগণ মৎস্য বিভাগীয় প্রতিনিধি হিসেবে প্রকল্পের স্থাপনাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণসহ ব্যবস্তাপনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন। প্রকল্পে সমাজভিত্তিক সংগঠনের সদস্যদের অন্য এলাকায় অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের ব্যবস্থা আছে। এ সফরের মাধ্যমে সিবিও সদস্যগণ দেশের অন্য এলাকায় মাছ চাষ বা মৎস্য উন্নয়ন বিষয়াদি সরেজমিনে পরিদর্শন এবং মৎস্যচাষ ও মৎস্য উন্নয়ন সম্পর্কে তাদের ধারনা অন্যদের সাথে মত বিনিময় করে মৎস্য বিষয়ে নিজেদের ধারণাকে উন্নত করতে পারবে।

প্রকল্প কার্যক্রমের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা গেলে প্রায় ৫০০ হেক্টর জলাশয় উন্নয়ন হবে, প্রায় ২০,০০০ হেক্টর (২৭০ টি) উন্মুক্ত ও আধাবদ্ধ জলাশয়ে ৫০০ মে. টন মাছের পোনা মজুদ করা হবে, ২৭০টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করা হবে এবং ২৫০০০ দরিদ্র মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষি পরিবার বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। ফলে অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকায় প্রায় ১ লক্ষ পরিবারের প্রত্যক্ষভাবে দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে এবং প্রায় ৪ লক্ষ পরিবার খণ্ডকালীন অথবা পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানে উপকৃত হবে। আশা করা যায় প্রকল্পের মাধ্যমে জলাশয় উন্নয়ন ও মাছ চাষ, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন এবং পোনা মজুদ ইত্যাদি কার্যক্রমের ফলে প্রকল্প এলাকায় বছরে প্রায় ৬০,০০০ মে. টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হবে।

১. প্রকল্প পরিচালক, অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর
২. সহকারী পরিচালক, অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর

বাংলাদেশে টেকসই মৎস্য উৎপাদনে উন্নত ব্রুডের গুরুত্ব

মোঃ অহিদুজ্জামান[১], মোঃ মহসিন উজ জামান[২] ও মোঃ গোলাম কিবরিয়া[৩]

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিশাল জনগোষ্ঠীর আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্যসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জলজসম্পদে সমৃদ্ধ এ দেশে ৫,২৮,৩৯০ হে. বদ্ধ জলাশয় (পুকুর/ডোবা, চিংড়ি খামার বাঁওড়), ৪০,৪৭,৩১৬ হে. উন্মুক্ত জলাশয় (নদী ও মোহনা, বিল, কাপ্তাই লেক ও প্লাবনভূমি) এবং ১.৬৬ লক্ষ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র। মৎস্য উৎপাদনে বদ্ধ, মুক্ত ও সামুদ্রিক জলাশয়ের অবদানের হার যথাক্রমে ৪৬.৬৪%, ৩৫.৫২%, ও ১৭.৮৪% (সূত্র: FRSS, ২০০৯-২০১০)। চাষ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতি বছর বদ্ধ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও উন্মুক্ত জলাশয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আরো বেশি মাছ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে এজন্য উন্মুক্ত জলাশয় ও সামুদ্রিক এলাকায় উপযুক্ত স্থানে চাষ ব্যবস্থাপনা, পেন কালচার, খাঁচায় মাছ চাষ, অভয়াশ্রম স্থাপন ও সংরক্ষণ ইত্যাদি নানাবিধ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে উন্নত ব্যবস্থাপনার সাথে গুণগত মানসম্পন্ন পোনার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আর গুণগত মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদনের জন্যই প্রয়োজন উন্নত বা মানসম্পন্ন ব্রুড।

হ্যাচারির বিকাশ, রেণু ও পোনার উৎপাদন

সত্তরের দশক এবং এর পূর্বে বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষের জন্য প্রাকৃতিক উৎসের রেণুর উপর নির্ভর করতে হতো। এরপর মনুষ্যসৃষ্ট এবং বিবিধ প্রাকৃতিক কারণে জলজ পরিবেশের অবক্ষয়ের ফলে প্রাকৃতিক উৎসের রেণুর প্রাপ্যতা ক্রমাগত কমতে থাকে। ফলে, প্রাকৃতিক উৎসের আহরিত রেণু দেশের মৎস্যচাষে চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া মাছের প্রাকৃতিক মজুদ সংরক্ষণের নিমিত্ত সরকার প্রাকৃতিক উৎস হতে বেপরোয়া রেণু আহরণের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। ফলে প্রয়োজনের তাগিদেই ধীরে ধীরে হ্যাচারির বিকাশ ঘটতে থাকে। দেশে সরকারি পর্যায়ে ৭৭টি হ্যাচারিসহ মোট ১১৯টি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার ৬০, ৭০ ও ৮০'র দশকে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম দিকে প্রাকৃতিক উৎসের রেণু এসব খামারে বড় করে মৎস্যচাষিদের নিকট ধানী ও চারা পোনা হিসেবে বিক্রি করা হতো। সত্তর দশকের শেষের দিকে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে কার্প জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদন দেশে মাছচাষে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। সরকারি খামারে রেণু উৎপাদনে অভূতপূর্ব সাফল্যের ফলে ৮০'র দশকের শেষ দিকে এবং ৯০'র দশকে বেসরকারি পর্যায়ে অনেকগুলো হ্যাচারি প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৯-২০১০ সালে সরকারি ৭৭টি, বেসরকারি ৯৩১টি হ্যাচারি ও প্রাকৃতিক উৎস হতে উৎপাদিত রেণুর পরিমাণ ছিল ৪.৮০ লক্ষ কেজি (সূত্র: FRSS, ২০০৯-২০১০)। প্রতি কেজিতে প্রায় ৪ লক্ষ রেণু হিসেবে এ সময় দেশে প্রায় ১৯২০০ কোটি রেণুপোনা উৎপাদন হয়। এ বিরাট উৎপাদনের ২৫% বাঁচার হারে রেণু থেকে ধানীপোনা উৎপাদিত হয় প্রায় ৪৮০০ কোটি এবং এর ২৫% বাঁচার হারে চারাপোনা উৎপাদিত হয় প্রায় ১২০০ কোটি। হেক্টর প্রতি ১০,০০০টি পোনা মজুদ হিসেবে বদ্ধ জলাশয়ে বর্তমানে চারাপোনার দরকার ৫২৮ কোটি এবং মুক্ত জলাশয়ে চাষ ও অবমুক্ত করার জন্য প্রয়োজন ৪০০ কোটি চারা পোনা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দেশে এখন আমাদের মোট পোনার উৎপাদন চাহিদার তুলনায় বেশি।

অতিরিক্ত রেণু পোনা উৎপাদনের কুফল

আমাদের দেশে অনেক হ্যাচারিতেই অজ্ঞতা অথবা অসচেতনার কারণে বংশপরম্পরায় নিকট আত্মীয়, ছোট আকারের, অপরিপক্ব ব্রুড প্রজননে ব্যবহার করা হচ্ছে। কখনও কখনও একই ব্রুড একাধিকবার ব্যবহার করে কৃত্রিম প্রজনন করা হচ্ছে। পাশাপাশি কিছু কিছু হ্যাচারি মালিক অপরিকল্পিতভাবে মাছের সঙ্করায়ন ঘটাচ্ছেন। ফলে পোনার বৃদ্ধি হার ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম এবং উচ্চ মৃত্যুহার, বিকলাঙ্গতাসহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং সর্বোপরি মাছের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদনের চেয়ে উৎপাদন কম হচ্ছে। উল্লিখিত সমস্যাসমূহের কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. **অন্তঃপ্রজনন (Inbreeding)**: বংশগতভাবে অতি ঘনিষ্ঠ (মা, বাবা, ভাই, বোন) ব্রুড মাছের মধ্যে প্রজনন ঘটানো এবং এসব রেণুকে বড় করে আবার এদের মধ্যেই প্রজনন করানো।

২. **ঋণাত্মক নির্বাচন প্রবণতা (Negative selection)**: অসচেতন ভাবে অপরিণত বয়সের ব্রুড, একই ব্রুড মাছের বার বার প্রজনন করানো এবং বড় আকারের ব্রুড নির্বাচন না করে ছোট আকারের ব্রুডের প্রজনন করা। এতে উৎপাদিত পোনা বংশগত কারণেই নিম্নমানের হয়।

৩. **অপরিকল্পিত সঙ্করায়ন (Unplanned hybridization)**: ভিন্ন দুটি প্রজাতির মাছকে প্রজননের কারণে প্রজাতির বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে বিশুদ্ধ জাতের মাছে অশুদ্ধ জিনের অনুপ্রবেশ (gene introgression) ঘটছে।

৪. **অপরিণত মাছের প্রজনন** (Breeding of pre-matured fish): প্রজননে অল্প বয়স ও ছোট আকারের ব্রুড ব্যবহারের কারণে কম রেণু, নিম্ন বৃদ্ধির হার এবং উৎপাদন কম হচ্ছে।

অন্তঃপ্রজনন, ঋণাত্মক নির্বাচন, অপরিণত মাছের প্রজনন ও অপরিকল্পিত সংকরায়নে পোনার মৃত্যুহার বেশি হয় ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে ৪৮০০ কোটি ধানীপোনা থেকে মাত্র ৯৮৬ কোটি (২০.৫%) চারাপোনা উৎপাদিত হয়। তাই আমাদের গুণগতমানের পোনা উৎপাদন করে পোনার বাঁচার হার বৃদ্ধি করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায়

উন্নত জাতের ব্রুড উৎপাদন : আমরা জানি সুবংশে সুসন্তান, ভাল বীজে অধিক ফসল তেমনি গুণগতমানের মাছের বীজে (পোনা) অধিক মৎস্য উৎপাদন। শুধু উন্নতজাতের ব্রুডের পোনা চাষ করেই ২৫% অধিক মৎস্য উৎপাদন করা সম্ভব। তাই কৌলিতাত্ত্বিকভাবে বিশুদ্ধ দেশি ও বিদেশি ব্রুড উৎপাদন করা প্রয়োজন। উন্নত জাতের ব্রুড উৎপাদনের জন্য নদীর উৎসের পোনা থেকে ব্রুড তৈরি করা, দ্রুতবর্ধনশীল পোনা বাছাই করে ব্রুড তৈরি করা ও বিভিন্ন হ্যাচারির মধ্যে উন্নত ব্রুড বিনিময় করা। প্রয়োজনে বিদেশ হতে বিদেশি শুদ্ধ কার্প ও অন্যান্য জাতের মাছের পোনা আমদানি করে অত্যন্ত দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্রুড তৈরি করা এবং এর গুণমান অক্ষুণ্ণ রাখা যেতে পারে।

সমস্যা থেকে উত্তরণের অন্যান্য উপায়

১) হ্যাচারিতে নদী উৎসের ব্রুড ব্যবহার করা,
২) হ্যাচারিসমূহের মধ্যে উন্নত ব্রুড বিনিময় করা,
৩) দ্রুতবর্ধনশীল পোনা বাছাই করে ব্রুড তৈরি করা,
৪) বংশগতভাবে অতি ঘনিষ্ঠ ব্রুডের প্রজনন বন্ধ করা অর্থাৎ দূরবর্তী সম্পর্কের ব্রুডের প্রজনন করা,
৫) সর্বোত্তম বয়স ও ওজনের ব্রুড ব্যবহার করা,
৬) অপরিকল্পিত সংকরায়ন না করা।

ভবিষ্যতে মৎস্য জীববৈচিত্র্য রক্ষা, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নত ব্রুড উৎপাদনে করণীয়

বাংলাদেশে ৫৬টি প্রজাতির দেশীয় মাছ ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত অথবা বিলুপ্তির পথে। তাই মৎস্য জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক প্রাকৃতিক অভয়াশ্রম স্থাপন ও সংরক্ষণ এখন সময়ের দাবী। এছাড়াও পরিপক্ব মাছের শুক্র ও ডিম ক্রায়োপ্রিজার্ভেশন করে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বর্তমান প্রাপ্ত প্রজাতিসমূহকে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। ক্রায়োপ্রিজার্ভেশনকে ফ্রোজেন জিন ব্যাংকও বলা হয়। এ ক্ষেত্রে অতি নিম্নতাপে খুব তাড়াতাড়ি মাইনাস ১৯৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে শুক্র ও ডিমকে তরল নাইট্রোজেনে প্রায় ৩২০০০ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। এতে জিন পোল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত এক সিসি মিল্টে ১০০০০ থেকে ২০০০০ মিলিয়ন শুক্র সংরক্ষণ করা যায়। ক্রায়োপ্রিজার্ভেশন পদ্ধতিতে সংরক্ষিত শুক্র দ্বারা ডিমের নিষিক্তকরণ সম্ভব হলে মাছ চাষের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। কারণ এ পদ্ধতির মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদন ও ক্রমাগতভাবে জলাশয়ে পুরুষ মাছের প্রতিপালনের প্রয়োজনীয়তা কমে আসবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করলে দেশ উপকৃত হবে।

সমস্যা সমাধানে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

২০০২-২০০৬ মেয়াদে মৎস্য অধিদপ্তরের ১২টি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার নিয়ে ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়) সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। দেশে উন্নত ব্রুডের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে সরকারি ২০টি খামার নিয়ে ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর কার্যক্রম চলমান আছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে গুণগতমানের রেণুপোনা ও ব্রুড মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যে ১৫০০ জন নার্সারি/হ্যাচারি মালিক/অপারেটরকে পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উন্নতমানের ৫০০০ কেজি রেণু, ৩৫ লক্ষ পোনা এবং ৯৫ মে.টন ব্রুড মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা জুন ২০১২ সালের মধ্যে অর্জিত হবে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎসের রুই, কাতলা ও মৃগেল মাছের কৌলিতাত্ত্বিক পরীক্ষা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে চলমান আছে। এ পরীক্ষার মাধ্যমে এ সব মাছের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গুণমান অবক্ষয়ের মাত্রা নিরূপণ করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি, গুণগত মানসম্পন্ন রেণুপোনা ও ব্রুড উৎপাদনের জন্য সরকার ইতোমধ্যেই মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ প্রণয়ন করেছেন।

দেশব্যাপী হ্যাচারিসমূহে উৎপাদিত রেণু বা পোনার গুণগত মানের উপরই বদ্ধজলাশয়ে মাছের চাষ ও উৎপাদন নির্ভরশীল। তাছাড়া প্রতিবছর সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোনা উন্মুক্ত জলাশয়ে অবমুক্ত করা হয়। এ সকল পোনাও হ্যাচারিতে উৎপাদিত। বর্তমানে হ্যাচারিতে উৎপদিত রেণু সরাসরি বিলে লালন করে বিল নার্সারির মাধ্যমেও পোনা উৎপাদন করা হচ্ছে, যা বিলের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। কাজেই, দেশের সামগ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রতিটি হ্যাচারিতে উন্নতজাতের ব্রুড সরবরাহ ও সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা জরুরি।

১। প্রকল্প পরিচালক, ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়), মৎস্য অধিদপ্তর
২। সহকারী পরিচালক, ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়), মৎস্য অধিদপ্তর
৩। সহকারী পরিচালক, ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়), মৎস্য অধিদপ্তর

জলমহাল, মৎস্যজীবী ও মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন

আনোয়ার হোসেন সিকদার

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্যসম্পদ ও মৎস্যজীবীদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্যজীবী, যাদের জীবন ও জীবিকা সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদের উপর নির্ভরশীল। একদিকে, ক্রমান্বয়ে জলমহালগুলো সংকুচিত হচ্ছে এবং মাছের প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে জেলে পরিবারের সদস্য সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে জলমহালের উপর নির্ভর করে তাদের জীবনযাপন ক্রমশই দুরূহ হয়ে পড়ছে। জেলে সম্প্রদায়ের কল্যাণে বিভিন্ন সরকারের আমলে জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এসকল নীতি জেলেদের উন্নয়নে তেমন কার্যকর হয়নি। তাই জেলেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে যুগোপযোগী নীতিমালা ও ব্যবস্থাপনা এখন সময়ের দাবী।

বর্তমান সরকার প্রধান জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা সরকারে এসে মৎস্যসম্পদ ও মৎস্যজীবীদের উন্নয়নে জলমহাল নীতিমালা প্রণয়ন করে 'জাল যার, জলা তার' নীতিমালা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিয়েছেন। মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও জেলেদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যেমন- জাটকা সংরক্ষণে প্রকল্প, জেলেদের জন্য ভিজিএফ কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা প্রদান, বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য নগদ অর্থ, গরু, ছাগল, সেলাই মেশিন ইত্যাদি বিতরণ করে যুগান্তকারী উন্নয়নের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০১০ সন হতে মৎস্যজীবীদের খাদ্য সহায়তা পরিবার প্রতি ১০ কেজি চালের পরিবর্তে ৩০ কেজি করে সরবরাহ করায় সুবিধাভোগী মৎস্যজীবীরা খুবই উপকৃত হচ্ছে। এজন্য সরকারের নিকট জেলে/মৎস্যজীবীগণ চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। তারপরও জেলেদের উন্নয়নে আরও কিছু বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন-

- জলমহাল নীতিমালায় যা আছে তার কিছু সংশোধন করে রাজস্ব ভিত্তিক এর পরিবর্তে উৎপাদনমুখী করা প্রয়োজন। তা না হলে 'জাল যার জলা তার' এ নীতিমালা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।
- জলমহাল থাকার কথা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর ও মৎস্যজীবীদের হাতে কিন্তু বাস্তবে আছে অন্যদের হাতে যারা মৎস্য উন্নয়নের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। জলমহাল ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তি দিচ্ছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত মৎস্য অধিদপ্তর, আর জলমহালের মালিকানা রয়েছে অন্য মন্ত্রণালয়ের হাতে যার পরিবর্তন প্রয়োজন।
- প্রকৃত দরিদ্র জেলেরা যাতে ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা পায় এ বিষয়ে সরকারের সজাগ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।
- জলমহাল নীতিমালা কিছু সংশোধন করে জলমহালসমূহ মৎস্য বিভাগের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী গ্রুপের কাছে ব্যবস্থাপনার জন্য দেয়া প্রয়োজন।
- এ পেশাজীবীদের সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি, মৎস্য বিভাগের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- দেশের সকল জেলায় চিহ্নিত জলমহালগুলো পুনরুদ্ধার করে সংরক্ষণ ও খনন করার লক্ষ্যে লাগসই প্রকল্প গ্রহণ করে আধুনিক মাছ চাষের আওতায় আনা প্রয়োজন।
- জাতীয়ভাবে গড়ে ওঠা প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া প্রয়োজন।

'বাংলাদেশ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী জেলে সমিতি' মৎস্যজীবী অঙ্গনে এক ব্যতিক্রমধর্মী সংগঠন। এ সংগঠন দেশের মৎস্য পেশায় নিয়োজিত পেশাজীবীদের সংগঠিত করে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা ও অধিকার আদায়ে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলায় পর্যায়ে আলোচনা, সভা, সেমিনার করে মৎস্যজীবী জেলেদের সচেতন করে যাচ্ছে। সরকারের মৎস্য বিষয়ক সকল কাজে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব, যুগ্ম সচিব, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়ে মৎস্যসম্পদ ও মৎস্যজীবীদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তরের জাটকা সংরক্ষণে গৃহীত কার্যক্রম জেলেদের জন্য অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। জেলেরা জাটকা সংরক্ষণে গ্রুপ করে নদীতে পাহারা দিচ্ছে যাতে অসাধু মৎস্যজীবীরা চুরি করে জাটকা আহরণ করতে না পারে। প্রজনন ভরামৌসুমে ১০ দিন মা ইলিশ ধরা বন্ধের সময় এ সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় রামগতি, কমলনগর, হিজলা, মুলাদী, মেহেন্দীগঞ্জ, দৌলতখান, মির্জাগঞ্জ, কলাপাড়া উপজেলায় নদীতে ইঞ্জিন চালিত নৌকা দিয়ে পাহারা দেয়া হয়। এ সংগঠন মনে করে, সরকার মৎস্য বিভাগকে আরো শক্তিশালী করলে এ সম্পদ দিন দিন বৃদ্ধি পাবে এবং লক্ষ লক্ষ বেকার মৎস্যজীবী সম্পদায়ের কর্মসংস্থান হবে।

সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী জেলে সমিতি

জাতীয় মৎস্য পুরস্কার ২০১১

ক. স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা

স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান একটি স্বর্ণপদক, ৫০ হাজার টাকা এবং একটি সনদপত্র পাবেন।

ক্রমিক	পুরস্কারের ক্ষেত্র	পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১.	মাছের গুণগতমানের রেণু উৎপাদন	ঝলক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র হ্যাচারি, প্রোঃ অজিত কুমার চৌহান গ্রামঃ মাস্টার পাড়া, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ
২.	মাছ উৎপাদন	আফিল এ্যাকুয়া ফিস লিমিটেড, প্রোঃ আলহাজ্ব শেখ আফিল উদ্দিন, এমপি ৪ নং বেসরকারি আবাসিক এলাকা, যশোর সেনানিবাস, যশোর
৩.	গলদা চিংড়ির গুণগতমানের পিএল উৎপাদন	দিলীপ কুমার সাহা, হংফু শ্রীম্প ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লিঃ ২নং ডিসি রোড, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ
৪.	বাগদা চিংড়ির গুণগতমানের পিএল উৎপাদন	রেডিয়েন্ট হ্যাচারি, ব্যবস্থাপনা পরিচালকঃ মোঃ সফিকুর রহমান চৌধুরী গ্রামঃ সোনারপাড়া, উখিয়া, কক্সবাজার
৫.	মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানিকরণ (হিমায়িত চিংড়ি/মৎস্য)	আলহাজ্ব মোহাম্মদ মুছা মিয়া, কুলিয়ারচর সী ফুডস (কক্সবাজার) লিঃ কক্সবাজার

খ. রৌপ্যপদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা

রৌপ্যপদকপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান একটি রৌপ্যপদক, ৩০ হাজার টাকা এবং একটি সনদপত্র পাবেন।

ক্রমিক	পুরস্কারের ক্ষেত্র	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১.	মাছের গুণগতমানের রেণু উৎপাদন	নিরিবিলি হ্যাচারি, প্রোঃ আনোয়ার হোসেন সরদার গ্রামঃ চাঁচড়া, যশোর সদর, যশোর
২.	মাছের গুণগতমানের রেণু উৎপাদন	মাম্মী মৎস্য হ্যাচারি, প্রোঃ মোঃ রহমত আলী গ্রামঃ তাঁতীবন্ধ, সুজানগর, পাবনা
৩.	মাছের গুণগতমানের রেণু উৎপাদন	মহালক্ষ্মী মৎস্য খামার ও প্রজনন কেন্দ্র প্রোঃ বাদল মৈত্র, গ্রামঃ তালসন, আদমদীঘি, বগুড়া
৪.	মাছের গুণগতমানের পোনা উৎপাদন	দেশবন্ধু মৎস্য হ্যাচারি ও নার্সারি, প্রোঃ মোঃ মুনসুর আলী ও প্রমোদ বর্মন গ্রামঃ রঘুরামপুর, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ
৫.	মাছের গুণগতমানের পোনা উৎপাদন	কে কে ডেইরি, পোল্ট্রি এন্ড ফিসারিজ, প্রোঃ কহিনুর কামাল, স্বামীঃ এস এম কামাল পাশা, মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, সিডিএ, চট্টগ্রাম
৬.	মাছ উৎপাদন	রেমী ফার্মস লিঃ, ব্যবস্থাপনা পরিচালকঃ মিরান আলী গ্রামঃ ঝাইয়ের পাড়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
৭.	মাছ উৎপাদন	জনাব মোঃ শামছুদ্দিন কালু গ্রামঃ লাঙ্গলকোট, লাঙ্গলকোট, কুমিলা
৮.	মাছ উৎপাদন	জি ই মৎস্য খামার, প্রোঃ মোঃ মামনুর রশিদ গ্রামঃ চকপাড়া, বিরামপুর, দিনাজপুর
৯.	মাছ উৎপাদন	মোঃ আলতাফ হোসেন গ্রামঃ বোয়ালিয়া, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ
১০.	মাছ উৎপাদন	মনাটেক যাদুগানালা মৎস্যচাষ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ সভাপতিঃ বিপ্লো চাকমা, গ্রামঃ মনাটেক যাদুগানালা, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি
১১.	বাগদা চিংড়ি উৎপাদন	মোঃ আকতার হাসান, গ্রামঃ বিরোল, কয়রা, খুলনা
১২.	মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানের অবদান (জাটকা সংরক্ষণ)	জেলা প্রশাসন, চাঁদপুর

বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন
২০০৯-২০১০ অর্থবছর

মৎস্যসেক্টর	জলায়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (মে.টন)	শতকরা অংশ	উৎপাদন/আয়তন (কেজি/হেক্টর)
ক. অভ্যান্তরীণ জলাশয়				
(১) মুক্ত জলাশয়				
১. নদী ও মোহনা	৮,৫৩,৮৬৩	১,৫৩,৬৯৫		১৮০
২. সুন্দরবন	১,৭৭,৭০০	৮,১০৯		৪৬
৩. বিল	১,১৪,১৬১	৭০,২০৯		৬১৫
৪. কাপ্তাই লেক	৬৮,৮০০	৭,১১৭		১০৩
৫. প্লাবনভূমি	২,৮১,০৪১০	৭,৯০,৮০৭		২৮১
উপমোট	**৪০,২৪,৯৩৪**	**১০,২৯,৯৩৭**	৩৫.৫৩%	
(২) বদ্ধ জলাশয়				
১. পুকুর ও ডোবা	৩,৫০,৫৯৫	১১,৪০,৪৮৪		৩,২৫৩
২. আধাবদ্ধ জলাশয় (প্লাবনভূমি)	২২,৩৮২	৪৬,৯০২		২,০৯৬
৩. বাঁওড়	৮,৫৫৬	৮,৭২৭		১,১৪৩
(৩) চিংড়ি খামার	২,৪৬,১৯৮	১,৫৫,৮৬৬		৬৩৩
উপমোট	**৬,২৭,৭৩১**	**১,৩৫,১৯৭৯**	৪৬.৬২%	
অভ্যান্তীরণ জলাশয় (মোট)	৪৬,৫২,৬৬৫	২৩,৮১,৯১৬	৮২.১৫%	
খ. সামুদ্রিক জলাশয়				
১. ট্রলার		৩৪,১৮২		
২. আর্টিসেনাল		৪,৮৩,১০০		
সামুদ্রিক জলাশয় (মোট)		**৫,১৭,২৮২**	১৭.৮৫%	
সর্বমোট		**২৮,৯৯,১৯৮**	১০০%	

অর্থবছরভিত্তিক চিংড়ির উৎপাদন

অর্থবছর	চিংড়ির উৎপাদন (মে.টন)						সর্বমোট	চাষকৃত চিংড়ির শতকরা হার
	অভ্যন্তরীণ জলাশয়			সামুদ্রিক জলাশয়				
	উন্মুক্ত	চাষকৃত	মোট	ট্রলার	আর্টিসেনাল	মোট		
১৯৮৬-৮৭	৪২৮৮২	১৪৭৭৩	৫৭৬৫৫	৪৪৮৮	১০৬৬৬	১৫১৫৪	৭২৮০৯	২০.২৯
১৯৯৭-৮৮	৩৬৩৮৬	১৭৮৮৯	৫৪২৭৫	৩৫৪৫	১১৫৩৫	১৫০৮০	৬৯৩৫৫	২৫.৭৯
১৯৮৮-৮৯	৪২৮২৪	১৮২৩৫	৬১০৫৯	৪৮৯৩	১২২১১	১৭১০৪	৭৮১৬৩	২৩.৩৩
১৯৮৯-৯০	৩৬২৮৪	১৮৬২৪	৫৪৯০৮	৩১১৭	১২৭৫১	১৫৮৬৮	৭০৭৭৬	২৬.৩১
১৯৯০-৯১	৪৩২৬২	১৯৪৮৯	৬২৭৫১	৩৬৯৬	১৩৯৩৭	১৭৬৩৩	৮০৩৮৪	২৪.২৪
১৯৯১-৯২	৬১০৪২	২০৩৩৫	৮১৩৭৭	২৯০২	১৭১৪০	২০০৪২	১০১৪১৯	২০.০৫
১৯৯২-৯৩	৭৮২২৬	২৩৫৩০	১০১৭৫৬	৪১৮৮	১৯৭৮৭	২৩৯৭৫	১২৫৭৩১	১৮.৭১
১৯৯৩-৯৪	৫০৭২১	২৮৩০২	৭৯০২৩	৩৪৭৯	১৮০৪০	২১৫১৯	১০০৫৪২	২৮.১৫
১৯৯৪-৯৫	৫৮৯৭৩	৩৪০৩০	৯৩০০৩	২৪১৬	১৭৯৪৭	২০৩৬৩	১১৩৩৬৬	৩০.০২
১৯৯৫-৯৬	৪৪০৭৯	৪৬২২৩	৯০৩০২	৩৫৮৮	২২৭৬৫	২৬৩৫৩	১১৬৬৫৫	৩৯.৬২
১৯৯৬-৯৭	৪১৮৬৮	৫২২৭২	৯৪১৪০	৩৫৩৭	২১২৮১	২৪৮১৮	১১৮৯৫৮	৪৩.৯৪
১৯৯৭-৯৮	৪৬৬৩৫	৬২১৬৭	১০৮৮০২	২৪৪৪	২২৩৪৬	২৪৭৯০	১৩৩৫৯২	৪৬.৫৩
১৯৯৮-৯৯	৪৯২৯৬	৬৩১৬৪	১১২৪৬০	৩৭৬৫	২৭৯৭৭	৩১৭৪২	১৪৪২০২	৪৩.৮০
১৯৯৯-২০০০	৪৩১৬৭	৬৪৬৪৭	১০৭৮১৪	২৯১৫	২৮৪৮০	৩১৩৯৫	১৩৯২০৯	৪৬.৪৪
২০০০-০১	৪৪৩৪৩	৬৪৯৭০	১০৯৩১৩	৩১৭২	২৭৮৬৫	৩১০৩৭	১৪০৩৫০	৪৬.২৯
২০০১-০২	৫৪৯৬৫	৬৫৫৭৯	১২০৫৪৪	৩১৬৮	২৮৮০৮	৩১৯৭৬	১৫২৫২০	৪৩.০০
২০০২-০৩	৬০৮৭৬	৬৬৭০৩	১২৭৫৭৯	২৪৮৬	২৯৪৪৫	৩১৯৩১	১৫৯৫১০	৪১.৮২
২০০৩-০৪	৬৩১০৩	৭৫১৬৭	১৩৮২৭০	৩০৭৫	৩৩৪১৩	৩৬৪৮৮	১৭৪৭৫৮	৪৩.০১
২০০৪-০৫	৬৮৭৬৮	৮২৬৬১	১৫১৪২৯	৩৩১১	৪০৯৫০	৪৪২৬১	১৯৫৬৯০	৪২.২৪
২০০৫-০৬	৭৭৩৮১	৮৫৫১০	১৬২৮৯১	৩৪৪৪	৪৪৬৭৫	৪৮১১৯	২১১০১০	৪০.৫২
২০০৬-০৭	৮২৪২২	৮৬৮৪০	১৬৯২৬২	২১৭৫	৪৯৬৯৪	৫১৮৬৯	২২১১৩১	৩৯.২৭
২০০৭-০৮	৭৫৬৭৮	৯৪২১১	১৬৯৮৮৯	২৬২০	৫০৫৮৬	৫৩২০৬	২২৩০৯৩	৪২.২৩
২০০৮-০৯	৮৯৯০১	১০২৮৫৪	১৯২৭৫৫	২৯৩২	৪৯২৮৫	৫২২১৭	২৪৪৯৭২	৪২.০০
২০০৯-১০	৪৬৩৮৮	৮৭৯৭২	১৩৪৩০০	২৪৯৬	৫০০৯৬	৫২৫৯২	১৮৬৮৯২	৪৭.০৭

অর্থবছরভিত্তিক ইলিশের উৎপাদন

অর্থবছর	ইলিশের উৎপাদন (মে.টন)		
	অভ্যন্তরীণ জলাশয়	সামুদ্রিক জলাশয়	মোট
১৯৮৭-১৯৮৮	৭৮৫৫১	১০৪৯৫০	১৮৩৫০১
১৯৮৮-১৯৮৯	৮১৬৪১	১১০৩১১	১৯১৯৫২
১৯৮৯-১৯৯০	১১২৪০৮	১১৩৯৪৩	২২৬৩৫১
১৯৯০-১৯৯১	৬৬৮০৯	১১৫৩৫৮	১৮২১৬৭
১৯৯১-১৯৯২	৬৮৩৫৬	১২০১০৬	১৮৮৪৬২
১৯৯২-১৯৯৩	৭৪৭১৫	১২৩১১৫	১৯৭৮৩০
১৯৯৩-১৯৯৪	৭১৩৭০	১২১১৬১	১৯২৫৩১
১৯৯৪-১৯৯৫	৮৪৪২০	১২৯১১৫	২১৩৫৩৫
১৯৯৫-১৯৯৬	৮০৬২৫	১২৬৬৬০	২০৭২৮৫
১৯৯৬-১৯৯৭	৮৩২৩০	১৩১২০৪	২১৪৪৩৪
১৯৯৭-১৯৯৮	৮১৬৩৪	১২৪১০৫	২০৫৭৩৯
১৯৯৮-১৯৯৯	৭৩৮০৯	১৪০৭১০	২১৪৫১৯
১৯৯৯-২০০০	৭৯১৬৫	১৪০৩৬৭	২১৯৫৩২
২০০০-২০০১	৭৫০৬০	১৫৪৬৫৪	২২৯৭১৪
২০০১-২০০২	৬৮২৫০	১৫২৩৪৩	২২০৫৯৩
২০০২-২০০৩	৬২৯৪৪	১৩৬০৮৮	১৯৯০৩২
২০০৩-২০০৪	৭১০০১	১৮৪৮৩৭	২৫৫৮৩৯
২০০৪-২০০৫	৭৭৪৯৯	১৯৮৩৬৩	২৭৫৮৬২
২০০৫-২০০৬	৭৮২৭৩	১৯৮৮৫০	২৭৭১২৩
২০০৬-২০০৭	৮২৪৪৫	১৯৬৭৪৪	২৭৯১৮৯
২০০৭-২০০৮	৮৯৯০০	২০০১০০	২৯০০০০
২০০৮-২০০৯	৯৫৯৭০	২০২৯৫১	২৯৮৯২১
২০০৯-২০১০	১১৪৭৬৮	১৯৮৫৭৪	৩১৩৩৪২

বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য

পরিমাণঃ মে.টন
মূল্যঃ কোটি টাকা

অর্থবছর	হিমায়িত চিংড়ি		জীবিত মাছ		হিমায়িত মাছ		শুটকি মাছ		লবণাক্ত ও পানিশূন্য মাছ		কচ্ছপ/কাঁকড়া/ ইল		হাঙ্গরের পাখনা এবং মাছের ফোটকা		অন্যান্য		মোট		মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	%
৯২-৯৩	১৯২২৪	৬০৪.০৩			২৭০৪	৩৮.৩১	১০৪২	১২.২৬	৫৯৯	৯.৮৪	২৮০০	২১.৬০	২৩৮.৩৯	১৪.২৫			২৬৬০৭	৭০০.২৯	৭.৫৭
৯৩-৯৪	২২০৫৪	৭৮৭.৭৩			৩১২৫	৫১.১৮	২৪৭৩	৪১.৮৩	৫০	১.০৬	৪০৮৮	৩৬.৩৭	৪৫	২.৭৯			৩১৮৩৫	৯২০.৯৬	৯.১২
৯৪-৯৫	২৬২৭৭	১০৪৫.৬৭			৯২৬৭	১৮০.২৬	৫২১	৮.৩৯	৬৪৯	১৫.৩৫	৪৭৬০	৪০.৬৭	২১২	১৬.৬০			৪১৬৮৬	১৩০৬.৯৪	৯.৩৮
৯৫-৯৬	২৫২২৫	১১০৬.৩৯			৮৮২৭	১৭৬.৬২	১৮২	৩.০৫	৪৩৬	১১.৪৭	৪২০৩	৩৯.২০	৫৬	৪.২১			৩৮৯২৯	১৩৪০.৯৪	৯.৩৮
৯৬-৯৭	২৫৭৪২	১১৮৮.৯১			৮৭৫৪	১৭৬.৭৪	৪২৭	৭.৯২	৫৬১	১৩.৮১	৫৯৫২	৬১.৪৮	১১৩	৮.৫৫			৪১৫৪৯	১৪৫৭.৪১	৭.৭৫
৯৭-৯৮	১৮৬৩০	১১৮১.৪৮			৮৮৩৬	১৫১.৬৬	২৩৩	৩.১১	১১০৬	২৬.৪৩	১১৯৮	১৪.৩৪	১৫৫	১০.৭৯			৩০১৫৮	১৩৮৭.৮১	৫.৮৩
৯৮-৯৯	২০১২৭	১১৬২.২১			৬৩৯৫	১৫৩.৯৬	১৩৭	২.২৩	১২৩২	৩৭.১৮	৪৮৬	৬.৩৯	১৫৪	১৭.৪০			২৮৫৩১	১৩৭৯.৩৭	৫.৪১
৯৯-২০০০	২৮৫১৪	১৬১২.১৫			৯৪৮৪	১৩৭.১৯	২১৫	৩.৬৫	৮০৯	২৫.৯৬	১০৭	১.৪৪	২৬২	৩১.১৭			৩৯৩৯১	১৮১১.৫৬	৬.২৮
২০০০-০১	২৯৭১৩	১৮৮৫.১৫			৭৯৬৫	৯৪.৮৯	১৩৭	২.০২	৮৩৮	২৭.৭৩	১৫৪	২.৩৩	১৮১	২০.৬৩			৩৮৯৮৮	২০৩২.৭৫	৫.৭৭
০১-০২	৩০২০৯	১৪৪৭.৭৬			৯৮৬৪	১৩৭.৩৯	৫১৭	৮.৩২	২৯৩	৯.৫৩	৩৩৬	৭.০৭	২৬৩	২৭.০৭			৪১৪৮২	১৬৩৭.১৪	৪.৭৬
০২-০৩	৩৬৮৬৪	১৭১৯.৮৮			৮৮৪৬	১৫৮.৬৪	৩৩৩	৭.০২	৫২৬	১৯.১২	৬৩০	১৪.৫৮	১৭২	২২.৩৫			৪৭৩৭১	১৯৪১.৫৯	৫.১০
০৩-০৪	৪২৯৪৩	২১৫২.৭৭			১০২২৯	২০২.২৪	৪৭২	৪.১৬	৩৭৭	১.৩৮	১১৬	১.৩৯	৪	১.৫৩			৫৪১৪১	২৩৬৩.৪৭	৫.৭১
০৪-০৫	৪৬৫৩৩	২২৮১.৫৯			১৫৭৬৩	২৫৬.২০	২৭২	৩.৭১	৭৭০	২৮.৯৭	৩৮	০.৮৬	১	০.৩৯			৬৩৩৭৭	২৫৭১.৭২	৫.৯০
০৫-০৬	৪৯৩১৭	২৬৯৮.৩৫	৫৭	০.৪৮	১৭৪২৯	২৯৪.১৪	১৫০	২.১৯	৫৯১	১৯.৮৪	১১০৭	১২.৯৫	৭৮	০.৮০	১০০	১.০৯	৬৮৮২৯	৩০২৯.৮৪	৪.৫৬
০৬-০৭	৫৩৩৬১	২৯৯২.৩৩	৪	০.০৭	১৮৩৭৬	৩২৫.৯০	৭৭	১.৩৪	৪৪১	১২.৮০	১১২৩	১৫.৪৮	২৪৪	৪.১১	৭৮	০.৮৬	৭৩৭০৪	৩৩৫২.৮৯	৪.৯০
০৭-০৮	৪৯৯০৭	২৮৬৩.৯২	১০	০.১৫	২৩৫১৫	৪৯৫.৪৬	২১০	২.৬৭	৬৫৮	২৬.৯৭	৪৩৯	৪.৮৮	২৬৬	১.৮২	২৯৪	০.৪১	৭৫২৯৯	৩৩৯৬.২৮	৪.০৪
০৮-০৯	৫০৩৬৮	২৭৪৪.১২	০.৩	০.০০০৬	১৯২৯৪	৪৫০.৯০	৩৪১	১১.৯৯	৮৪	৩.৯২	১২১৭	১১.৯৮	২৭৬	১.৭৭	১৩০৮	১৮.৭৩	৭২৮৮৮	৩২৪৩.৪১	৩.০০
০৯-১০	৫১৫৯৯	২৮৮৫.২১	১৭৮৩	১৩.২২	২১৪৬৪	৪৫৮.১১	৬২২	২৫.০৬	০	০	৬৯২	১০.৪১	৯৫৫	১২.৬৬	৫২৮	৩.৮৫	৭৭৬৪৩	৩৪০৮.৫২	২.৭০

*চিল্ড ফিস সংযুক্ত

* রপ্তানিকৃত ইলিশ (চিল্ড) ৩১০৭.১৭ মে.টন এবং রপ্তনিকৃত আয় (২০০৯-২০১০)

অর্থবছরভিত্তিক বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদন
১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৯-২০১০ আর্থিক সাল

একক: মে.টন

মৎস্য সেক্টর	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০
ক. অভ্যন্তরীণ জলাশয়	১২৪২৬২০	১৩২৭৫৮৫	১৪০১৫৬০	১৪৭৫০৩৯	১৫৬৬২৮৯	১৬৪৬৮১৯	১৭৪১৩৬০	১৯৫২৫৭৩	১৯৫২৫৭৩	২০৬৫৭২৩	২১৮৬৭২৬	২৩৮১৯১৬
(১) মুক্ত জলাশয়	৬৪৯৪১৮	৬৭০৪৬৫	৬৮৮৯২০	৬৮৮৪৩৫	৭০৯৩৩৩	৭৩২০৬৭	৮৫৯২৬৯	৯৫৬৬৮৬	১০০৬৭৬১	১০৬০১৮১	১১২৩৯২৫	১০২৯৯৩৭
১. নদী ও মোহনা	১৫১৩০৯	১৫৪৩৩৫	১৫০১২৯	১৪৩৫৯২	১৩৭৮৪৮	১৩৭৩৩৭	১৩৯৭৯৮	১৩৭৮৫৯	১৩৬৯৫৮	১৩৬৮১২	১৩৮১৬০	১৫৩৬৯৫
২. সুন্দরবন	১১১৩৪	১১৬৪৮	১২০৩৫	১২৩৪৫	১৩৮৮৪	১৫২৪২	১৫৭২৪	১৬৪২৩	১৭৭৫১	১৮১৫১	১৮৪৬২	৮১০৯
৩. বিল	৬৯৮৫৭	৭২৮২৫	৭৪৫২৭	৭৬১০১	৭৫৪৬০	৭৪৩২৮	৭৪৯২৫	৭৬৩৬৫	৭৫১৩৭	৭৭৫২৪	৭৯২০০	৭০২০৯
৪. কাপ্তাই লেক	৬৬৮৯	৬৮৫২	৭০৫১	৭২৪৭	৭০২৫	৭২৩৮	৭৩৭৯	৭৫৪৮	৮০৮৫	৮২৪৮	৮৫৯০	৭১১৭
৫. পাবনভূমি	৪১০৪৩৬	৪২৪৮০৫	৪৪৫১৭৮	৪৪৯১৫০	৪৭৫১১৬	৪৯৭৯২২	৬২১৪৪৩	৭১৮৪৯১	৭৬৮৮৩০	৮১৯৪৪৬	৮৭৯৫১৩	৭৯০৮০৭
(২) বদ্ধ জলাশয়	৫৯৩২০২	৬৫৭১২০	৭১২৬৪০	৭৮৬৬০৪	৮৫৬৯৫৬	৯১৪৭৫২	৮৮২০৯১	৮৯২০৪৯	৯৪৫৮১২	১০০৫৫৪২	১০৬২৮০১	১৩৫১৯৭৯
১. পুকুর	৪৯৯৫৯০	৫৬১০৫০	৬১৫৮২৫	৬৮৫১০৭	৭৫২০৫৪	৭৯৫৮১০	৭৫৬৯৯৩	৭৫৯৬২৮	৮১১৯৫৪	৮৬৬০৪৯	৯১২১৭৮	১১৪০৮৮৫
২. আধাবদ্ধ জলাশয় (পাবনভূমি)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	৪৬৯০২
৩. বাঁওড়	৩৫৩৬	৩৬২২	৩৮০১	৩৮৯২	৪০৯৮	৪২৮২	৪৩৮৮	৪৪৯৮	৪৬৯৮	৪৭৭৮	৫০৩৮	৮৭২৭
৪. চিংড়ি খামার	৯০০৭৬	৯২৪৪৮	৯৩০১৪	৯৭৬০৫	১০০৮০৪	১১৪৬৬০	১২০৭১০	১২৭৯২৩	১২৯১৬০	১৩৪৭১৫	১৪৫৫৮৫	১৫৫৮৬৬
খ. সামুদ্রিক জলাশয়	৩০৯৭৯৭	৩৩৩৭৯৯	৩৭৯৪৯৭	৪১৫৪২০	৪৩১৯০৮	৪৫৫২০৭	৪৭৪৫৯৭	৪৭৯৮১০	৪৮৭৪৩৮	৪৯৭৫৭৩	৫১৪৬৪৪	৫১৭২৮২
১. ট্রলার	১৫৮১৮	১৬৩০৪	২৩৯০১	২৫১৬৫	২৭৯৫৪	৩২৬০৬	৩৪১১৪	৩৪১৮৪	৩৫৩৯১	৩৪১৫৯	৩৫৪২৯	৩৪১৮২
২. আর্টিসেনাল	২৯৩৯৭৯	৩১৭৪৫৯	৩৫৫৫৯৬	৩৯০২৫৫	৪০৩৯৫৪	৪২২৬০১	৪৪০৪৮৩	৪৪৫৭২৬	৪৫২০৪৭	৪৬৩৪১৪	৪৭৯২১৫	৪৮৩১০০
সর্বমোট	১৫৫২৪১৭	১৬৬১৩৮৪	১৭৮১০৫৭	১৮৯০৪৫৯	১৯৯৮১৯৭	২১০২০২৬	২২১৫৯৫৭	২৩২৮৫৪৫	২৪৪০০১১	২৫৬৩২৯৬	২৭০১৩৭০	২৮৯৯১৯৮
বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার (%)	৬.০৭	৭.০২	৭.২০	৬.১৪	৫.৭০	৫.২০	৫.৪২	৫.০৮	৪.৭৯	৫.০৫	৫.৩৯	৭.৩২

একনজরে বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ (২০০৯-২০১০)

১.	অভ্যন্তরীণ জলায়তন		
	(ক) বদ্ধ জলাশয়	:	৬,২৭,৭৩১ হে.
	■ পুকুর ও ডোবা	:	৩,৫০,৫৯৫ হে.
	■ অক্সবো লেক (বাঁওড়)	:	৮,৫৫৬ হে.
	■ আধাবদ্ধ (প্লাবনভূমি)	:	২২,৩৮২ হে.
	■ চিংড়ি খামার	:	২,৪৬,১৯৮ হে.
	(খ) উন্মুক্ত জলাশয়	:	৪০,২৪,৯৩৪ হে.
	■ নদী ও মোহনা (সুন্দরবনসহ)	:	১০,৩১,৫৬৩ হে.
	■ বিল	:	১,১৪,১৬১ হে.
	■ কাপ্তাই লেক	:	৬৮,৮০০ হে.
	■ প্লাবনভূমি	:	২৮,১০,৪১০ হে.
২.	সামুদ্রিক জলায়তন		
	■ সমুদ্রসীমা (তটরেখা হতে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত)	:	২,৬৪০ বর্গ নটিক্যাল মাইল
	■ একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা (EEZ) (তটরেখা হতে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত)	:	৪১,০৪০ বর্গ নটিক্যাল মাইল
	■ মহীসোপান এলাকা (৪০ ফ্যাদম গভীর পর্যন্ত)	:	২৪,৮০০ বর্গ নটিক্যাল মাইল
	■ উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃতি	:	৭১০ কিলোমিটার
৩.	জেলের সংখ্যা	:	১২.৮০ লক্ষ
	■ অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের জেলে	:	৭.৭০ লক্ষ
	■ সামুদ্রিক জেলে	:	৫.১০ লক্ষ
৪.	মৎস্যচাষি	:	৪২.৩০ লক্ষ
	■ মৎস্যচাষি	:	৩০.৮০ লক্ষ
	■ চিংড়িচাষি	:	১১.৫০ লক্ষ
৫.	মৎস্য উৎপাদন	:	২৮,৯৯,১৯৮ মে.টন
	■ অভ্যন্তরীণ মৎস্য	:	২৩,৮১,৯১৬ মে.টন
	■ উন্মুক্ত জলাশয় (আহরিত)	:	১০,২৯,৯৩৭ মে.টন
	■ বদ্ধ জলাশয় (চাষকৃত)	:	১৩,৫১,৯৭৯ মে.টন
	■ সামুদ্রিক মৎস্য	:	৫,১৭,২৮২ মে.টন
	■ ট্রলার দ্বারা আহরণ	:	৩৪,১৮২ মে.টন
	■ ইঞ্জিন চালিত নৌকা দ্বারা আহরণ	:	৪,৮৩,১০০ মে.টন
৬.	মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি	:	২৮,৯৯,১৯৮ মে.টন

	■ পরিমাণ	:	৭৭,৫৮৪.১২ মে.টন
	■ মূল্য	:	৩,৪০৮.৫১ কোটি টাকা
	■ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট	:	১৬২টি (লাইসেন্সকৃত ৭৫,ই ইউ অনুমোদিত-৭৪)
	■ বৈদেশিক মুদ্রায় অবদান	:	২.৭০%
৭.	জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান		
	■ GNP-তে মাছের মূল্য (বর্তমান বাজার মূল্য)	:	১৯,৫৬৭.৯০ কোটি টাকা
	■ GDP-তে অবদান	:	৩.৭৪%
	■ কৃষিখাতে অবদান	:	২২.২৩%
৮.	মাছ গ্রহণ (Fish Intake) ও চাহিদা		
	■ জনপ্রতি বাৎসরিক মাছ গ্রহণ	:	১৮.৯৪ কেজি
	■ মাছের বাৎসরিক চাহিদা	:	৩২.৭২ লক্ষ মে.টন
	■ জনপ্রতি মাছের বাৎসরিক চাহিদা	:	২০.৪৪ কেজি
	■ প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে অবদান	:	৫৮%
৯.	বেসরকারি মৎস্য হ্যাচারি ও নার্সারি		
	■ মৎস্য হ্যাচারির সংখ্যা	:	৯৩১টি
	■ মৎস্য নার্সারির সংখ্যা	:	৮,৮৮১টি
	■ হ্যাচারির রেণু উৎপাদন	:	৪,৫৯,৮০৪ কেজি
	■ প্রাকৃতিক উৎস হতে রেণু সংগ্রহ	:	২,২০৩ কেজি
	■ নার্সারিতে পোনা মাছ উৎপাদন	:	৯৬,০০১ লক্ষটি
১০.	বেসরকারি চিংড়ি হ্যাচারি		
	■ বাগদা হ্যাচারি	:	৬০টি (সরকারি ২টি)
	■ বাগদার রেণু উৎপাদন (পিএল)	:	৫১.০০০ লক্ষটি
	■ গলদা হ্যাচারি	:	৭০টি (সরকারি ১৭টি)
	■ গলদার রেণু উৎপাদন (পিএল)	:	১০,৮০০ লক্ষটি
	■ প্রাকৃতিক উৎস হতে চিংড়ির রেণু সংগ্রহ	:	১০,০০০ লক্ষটি
১১.	সরকারি অবকাঠামো (সংখ্যা)		
	■ মৎস্য/চিংড়ি প্রশিক্ষণ খামার	:	০৬টি
	■ প্রশিক্ষণ একাডেমি	:	০১টি
	■ মৎস্য হ্যাচারি/মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার	:	১১৯টি (সরকারি হ্যাচারি -৭৭ টি)
	■ হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন	:	৫,৫৯২ কেজি
	■ বাগদা চিংড়ি হ্যাচারি	:	০২টি
	■ গলদা চিংড়ি হ্যাচারি	:	১৭টি

	■ চিংড়ির প্রদর্শনী খামার	:	০২টি
	■ চিংড়ি আহরণ ও সেবা কেন্দ্র	:	২০টি
	■ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র (বিএফডিসি)	:	০৯টি
	■ মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র (উপকেন্দ্র)	:	০৯টি
১২.	সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ইউনিট (সংখ্যা)		
	■ ট্রলার	:	১৬৭টি
	■ ইঞ্জিন চালিত নৌকা	:	২৬৮৫৯টি
	■ ইঞ্জিন বিহীন নৌকা	:	২৩৩২৯টি
	■ সনাতনী নৌকা	:	৪৩,৯৬০টি
	■ জাল ও বড়শি	:	২,১৮,৫৮১টি
১৩.	মৎস্য প্রজাতি (সংখ্যা)		
	■ মিঠা পানির মৎস্য প্রজাতি	:	২৬০টি
	■ বিদেশী মৎস্য প্রজাতি	:	১২টি
	■ মিঠা পানির চিংড়ি প্রজাতি	:	২৪টি
	■ সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি	:	৪৭৫টি
	■ সামুদ্রিক চিংড়ি প্রজাতি	:	৩৬টি
১৪.	মৎস্য সেক্টরের জনবল (২০০৮-২০০৯)		
	■ মৎস্য অধিদপ্তর	:	৪,৭৮০ (১ম শ্রেণী ৯২৬ জন)
	■ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	:	২৪৬ (১ম শ্রেণী ৭৭)
	■ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	:	৭৯১ (১ম শ্রেণী ৯৪ জন)

প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofl.gov.bd

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, এমপি মাননীয় মন্ত্রী	৭১৬২৪৩০ (অ) ৭১৬১৫৫৫ (অ) ৮১১২৩২৬ (সংসদ) ৯৩৫৩৯৪৫ (বা)
জনাব পিয়ার মোহাম্মদ মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব	৭১৬৩৯৩০ (অ) ০১৭১১৯০৩৬০৩
জনাব হিলটন কুমার সাহা মাননীয় মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	৭১৬৪৭০২ (অ)
জনাব আলী হোসেন সিনিয়র তথ্য অফিসার	৭১৬২৫১৬ (অ) ৯৬৬০০০৭ (বা)
জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম মাননীয় মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৭১৬২৪৩০ (অ) ৭১৬১৫৫৫ (অ)
জনাব উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত সচিব	৭১৬৪৭০০ (অ) ৮৩৫৫৫৫২ (বা) ৭১৬১১১৭ (ফ্যা)
জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন সচিবের একান্ত সচিব	৯৫১৫৭৯৯ (অ) ০১৭১৬৮৪৯৮৭৩
জনাব মোঃ আবুল খায়ের সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৭১৬৪৭০০ (অ)
জনাব মোশাররেফ হোসেন যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন/প্রাণিসম্পদ)	৭১৬৬২৬৩ (অ) ৯৩৩১৬২৫ (বা)
জনাব মোহাম্মদ শামসুল কিবরিয়া যুগ্ম-সচিব (মৎস্য)	৯৫১৪২০১ (অ) ৮৬১৩০৭৯ (বা)
যুগ্ম প্রধান	৭১৬৭৯৬৯ (অ)
জনাব এস এম আবু তাহের উপসচিব (প্রশাসন)	৯৫১৫৫২৭ (অ) ৮০৫৫২৪৮ (বা)
জনাব নীলরতন সরকার সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪)	৯৫৫৩৮৪০ (অ) ৯৬৭৭৭১২ (বা)
জনাব মোঃ আশরাফ আলী উপসচিব (প্রাণিসম্পদ)	৭১৬৯৫৬২ (অ) ৮০৫৬১৪৬(বা)
বেগম স্মৃতি কর্মকার সিনিয়র সহকারী সচিব(প্রাণিসম্পদ-১)	৯৫৬৬৯৪৭ (অ) ৯০০১৩৯১ (বা)
বেগম রুম্মান আখতার খান উপসচিব (প্রশাসন-১ অধিশাখা)	৯৫৫১০০৭ (অ) ৯০০২৬৭৩ (বা)
জনাব প্রদীপ কুমার দাস উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা)	৭১৬৪৬৯১ (অ)
বেগম জেবুন্নেছা করিম উপসচিব (প্রশাসন-৩ অধিশাখা)	৭১৬১৪০৭ (অ) ৯৩৫৯৮৪০ (বা)
বেগম আফিয়া খাতুন উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-২ অধিশাখা)	৯৫৬১১১৭ (অ) ৮১৪৪৪৯৭ (বা)
জনাব মোঃ আবদুস ছাত্তার উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-৩ অধিশাখা)	৭১৬২২২১ (অ) ৭১৯৩৪০০ (বা)
জনাব লক্ষণ চন্দ্র দেবনাথ উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-৪ অধিশাখা)	৯৫১৫৬৪৪ (অ) ৯১৩৭২৫৪ (বা)
ড. মোঃ মফিজুর রহমান উপসচিব (মৎস্য-১)	৭১৬৯৫৬৩ (অ) ৮৩৫৪৩৫৮ (বা)
জনাব মোঃ খায়রুল আলম সেখ সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-১)	৭১৭২৫৪৫ (অ) ৯৬৬৩১৮২ (বা)
ড. মোয়াজ্জেম হোসেন উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন)	৭১৬৭৩০৬ (অ) ৮১১৩৭২৪ (বা)
জনাব মোঃ খায়রুল আলম সেখ সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-৩)	৭১৭০০৫২ (অ) ৯৬৬৩১৮২ (বা)
জনাব মোঃ আব্দুল মালেক উপসচিব (মৎস্য-২)	৭১৬২৭৮৩ (অ) ৮৩৩৩১৬৪ (বা)
জনাব মোঃ খায়রুল আলম সেখ সিনিয়র সহকারী সচিব (মৎস্য-৪)	৭১৭২০৩৮ (অ) ৯৬৬৩১৮২ (বা)
জনাব এ কে এম ফজলুল হক উপ সচিব (মৎস্য-৫ অধিশাখা)	৭১৭২১৪১ (অ) ৮০৫১৬৬৬ (বা)
জনাব মোঃ জাকির হোসেন উপপ্রধান	৭১৬৯৫৬৪ (অ) ৮৩১৫০০৩ (বা)
বেগম জোবায়দা বেগম সিনিয়র সহকারী প্রধান (ম. পরি.- ১)	৭১৭০১০৮ (অ) ৯৬৭৩৫৪০ (বা)
জনাব মোঃ উবায়দুল হক সিনিয়র সহকারী প্রধান (ম. পরি.- ২)	৭১৬২১৬৫ (অ) ৯৩৩৫২৫৬ (বা)
জনাব পুলকেশ মণ্ডল সহকারী প্রধান (ম.পরি. - ৩, মনি. -১)	৭১৬২০৭৬ (অ) ৮০৫৭৯৬৫ (বা)
জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মুস্তাসিম বিল্লাহ সহকারী প্রধান (মনিটরিং-২)	৯৫৫০৩৭১ (অ)
জনাব সুব্রত শিকদার সিনিয়র সহকারী প্রধান (প্রা. পরি-১)	৯৫৬১৬৭৭ (অ) ৮৬১৮৫০৮ (বা)
বেগম জোবায়দা বেগম সিনিয়র সহকারী প্রধান (প্রা. পরি-২)	৯৫৬৫৭৭৫ (অ) ৯৬৭৩৫৪০ (বা)
কাজী ফাহমিদা হক সিএও, মপ্রাম, সেগুনবাগিচা, ঢাকা	৮৩৫৬২৭৪ (অ) ৯৩৩৮৪১৮ (বা)
জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৯৫৭০৬৬০ (অ) ৮৬৫২৯০৯ (বা)
জনাব শহীদুল্লাহ পিপিএসইউ	৯৫৬২১৫১ (অ) ০১৭১৭১০২৫০২
জনাব মজিবুল হক মজুমদার প্রটোকল অফিসার	০১৭২৬২১৩০০২

মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা
www.fisheries.gov.bd

নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান খান মহাপরিচালক dg@fisheries.gov.bd	৯৫৬২৮৬১ (অ) ৯১৩২০৮৩ (বা) ৯১৪৩০৪৪ (বা) ৯৫৬৮৩৯৩ (ফ্যা)
সরকার মুহাম্মদ রফিকুল আলম উমক (রিজার্ভ), স্টাফ অফিসার	৯৫৬৯৯৩৪ (অ) sarkeripon@gmail.com
জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান খান পরিচালক (অভ্যন্তরীণ)	৯৫৭১৮১২ (অ)
জনাব মোঃ আব্দুল জলিল প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯৫৬১৩৫৫ (অ) ৮১৯০৮৭০ (বা) ৯৫৬১৩৫৫ (ফ্যা)
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মাননিয়ন্ত্রণ)	৯৫৬৯৯৪৩ (অ)
সৈয়দ আরিফ আজাদ উপপরিচালক (প্রশাসন) s_arif_azad@yahoo.com	৯৫৬৯৩৫৫ (অ) ৯৫৬৭২১৭ (ফ্যা)
শেখ মুস্তাফিজুর রহমান উপপরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা) sumonazma@yahoo.com	৯৫৫৩০৮৮ (অ) ৮৯৩২৪৮৪(বা)
জনাব সুকমল চন্দ্র সূত্রধর উপপরিচালক (চিংড়ি)	৯৫৬১৭১৫ (অ) ৯১৪৫৩৯৩ (বা)
বেগম ফরিদা বেগম উপপরিচালক (মৎস্য চাষ) Bfarida30@yahoo.com	৯৫৬১৫৯২ (অ) ৯৬১৩২১৮ (বা)
জনাব আ ক ম আজিজুল হক মোল্লা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	৯৫৫৪৭১৬ (অ) ৮২৫০৪৩২ (বা)
জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৭১৭০৬৩৬০০ rezaul134@yahoo.com

জনাব বিজয় রঞ্জন সাহা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	৯৫৬৭২১৬ (অ)
জনাব মোঃ আবুল খায়ের জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	৯৫৬০৪৭২ (অ) khair2222@yahoo.com
জনাব মোঃ জাকির হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অ.দা.)	৯৫৬০৪৫৭ (অ) ৮৯১৫২৬১ (বা)
জনাব রমেশ চন্দ্র মণ্ডল উপপ্রধান	৯৫৬৮৯৭১ (অ) ৮৬১৩৮১৭ (বা) mandalrc@gmail.com
বেগম আখতার জাহান চৌধুরী উপপ্রধান (বাস্তবায়ন)	৯৫৬৫০২১ (অ) ৯৬৬২৭৯০ (বা) ajahan57@yahoo.com
ড. মোঃ ফজলুর রহমান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১)	৯৫৬৯৩২০ (অ)
বেগম শামীম আরা বেগম সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-২)	৯৫৬৬১০৩ (অ)
বেগম শামীম আরা নাজনীন সহকারী পরিচালক	৯৫৬৫০২১ (অ)
বেগম রওশন আরা বেগম সহকারী পরিচালক (অর্থ)	৯৫৫৪৯৯২ (অ)
জনাব মোঃ বছিরুজ্জামান সহকারী প্রধান	৯৫৭১৬৯৮ (অ) ৮৭১২৭২৬ (বা)
জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম উপপ্রধান (চ.দা.)	৯৫৬৫০২৩ (অ) ৯১৩৮১০৫ (বা)
জনাব মোঃ আবুল হাশেম সহকারী পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ)	৯৫৬৭২১৯ (অ) ৮১২৪২১৬ (বা)
জনাব মোঃ ইউসুফ খান প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	৯৫৬৭২২০ (অ)
ড. আলী মোহাম্মদ ওমর ফারুক সহকারী পরিচালক (মৎস্যচাষ)	৯৫৬০৫১৭ (অ) faruqamo@yahoo.com
ড. মোহাঃ সাইনার আলম সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	sainardof@yahoo.com sainarnatp@gmail.com
জনাব মোঃ ফজলুল হক সহকারী পরিচালক (কল্যাণ)	০১৭১১৮৭৩৭৩ fazlul_hoque2004@yahoo.com
সৈয়দা শিরিন কুলসুমা খাতুন সহকারী পরিচালক	৯৫৫৫৩৪৯ (অ) syedashirin@yahoo.com
ড. সৈয়দ আলী আজহার সহকারী পরিচালক (জলমহাল)	৯৫৬০৬৫৩ (অ) azherkbd@yahoo.com
জনাব মোঃ মজিবুর রহমান সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৯৫৬১৪৩৭ (অ)
জনাব তপন কুমার পাল সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৯৫৬১৪৩৭ (অ) tapanaddof@yahoo.com
জনাব আবু মাসুম সিদ্দিক সহকারী পরিচালক	৯৫৬৮১১৯ (অ)

জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ছিদ্দিকী সহকারী পরিচালক, অডিট শাখা	mizansiddiquee@yahoo.com
জনাব মোঃ ফিরোজ আহমেদ নির্বাহী প্রকৌশলী	৯৫৬৭২১৮ (অ)
জনাব মোঃ আতিকুর রহমান ভূঁইয়া সহকারী পরিচালক (লিগাল শাখা)	৯৫৫০২৮০ (অ) ৭৪৪২৩৬৩ (বা)
ড. মোঃ মোতাহার হোসেন সহকারী পরিচালক (মাননিয়ন্ত্রণ)	৯৫৭১৬৯৬ (অ) motaher@fisheries.gov.bd
জনাব আবু হেনা মোঃ মোস্তফা কামাল সহকারী পরিচালক(রিজার্ভ)	shohelkamal@yahoo.com
জনাব মোঃ সৈয়দ হোসেন উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (জরিপ)	৯৫৬৯২৯৫ (অ) ৮৩৫৫৩৪৫ (বা)
বেগম ফিরোজা বেগম সহকারী প্রধান	৯৫৬৫০২১ (অ) ৮৭১১৮০২ (বা)
জনাব মোঃ শাহজাহান সহকারী পরিচালক	৭১৬৭২৬৯ (অ) ৮১০০৩১৯ (বা)
বেগম তানমী শাহরীন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)-ডোসিয়ার	৯৫৬৯৩২০ (অ) tanmi_s1998@yahoo.com
বেগম সালমা সাইদ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)- সমন্বয়	০১৭১৭২১১৯৭১ ৮৬২৯৫৬৬ (বা) salmasayeed.40@yahoo.com
জনাব মোঃ কামরুল হাসান গবেষণা কর্মকর্তা	০১৫৫৮৩০৮৫৪৮ khmanju_70@yahoo.com
জনাব কায়সার মুহাম্মদ মঈনুল হাসান উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)	০১৭১২৬২০৮৯০ hasankaisir@yahoo.com
বেগম নাজমা বেগম উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)- মৎস্যচাষ	০১৭১৮৬২২৯১৬ nazma@fisheries.gov.bd
বেগম উম্মে কুলসুম ফেরদৌসী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০১৫৫৬৩৭৮৫১২ fera@fisheries.gov.bd
বেগম আয়েশা সিদ্দিকা গবেষণা কর্মকর্তা	০১৭১৬৫৬১২৯৮ ayesha@fisheries.gov.bd
জনাব মোহাম্মদ শরিফুল আজম উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)-প্রশিক্ষণ	৯৫৬১৪৩৭(অ) sharif@fisheries.gov.bd
জনাব রাজু আহমেদ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)- অডিট	০১৭১২৫০৯২৯৬ rajuahmed.dof@gmail.com
বেগম খালেদা খানম চৌধুরী গবেষণা কর্মকর্তা	৯৫৭০৩৫২ (বা)
ড. মো. আব্দুল আলীম উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)-পরিকল্পনা	০১৭১৮১৫৭৭৩০ mdalim_2003@yahoo.com
বেগম শবনম মোস্তারী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ)-পরিকল্পনা	mostary.shsbnam@yahoo.com
জনাব এম. এম. মাহবুব আলম উমক (রিজার্ভ)-হাওর কর্মসূচি	৯৫৬১৪৩৭ (অ) mhbb_alam@yahoo.com
জনাব মোহাম্মদ কামরুজ্জামান হোসাইন মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	৯৫৬৭২২০ (অ) kjewelufo1977@yahoo.com

মৎস্য অধিদপ্তরের প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ	
বেগম প্রভাতি দেব পিডি, হালদা প্রকল্প	০৩১-২৫৮০৯৮২ (অ) provatideb@gmail.com
জনাব অহিদুজ্জামান পিডি, ক্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প	৯৫৫৮০৭০ (অ) ৯৬৭৫৭৩৮ (বা)
জনাব মোঃ মহসিন উজ জামান এডি, ক্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প	৯৫৫৮০৭০ (অ) mohsinzaman1@gmail.com
জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া এডি, ক্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প	৯৫৫৮০৭০ (অ) kibriagm@yahoo.com
বেগম মেহেরুননেছা ইও, ক্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প	৯৫৫৮০৭০ (অ) meherun_nessa_runy@yahoo.com
জনাব জোয়ারদার মোঃ আনোয়ারুল হক পিডি, ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকল্প anwarulhaque35@yahoo.com	৯৫১৩৫০৭ (অ) ৮১০১৭৮৬ (বা) ৯৫১৩৫০৬ (ফ্যা)
জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান সহকারী পরিচালক, ইউপমস প্রকল্প	৯৫১৩৫০৬ smsrahman_bau@yahoo.com
জনাব এস. এম. রেজাউল করিম সহকারী পরিচালক, ইউপমস প্রকল্প	৯৫১৩৫০৬ (অ) rezaul6950@yahoo.com
জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন পিডি, আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল কম্পোনেন্ট)	০৪৩১-২১৭৬২৯৩-৫ (অ) ০৪৩১-৬১৪৪০ (বা) ০৪৩১-২১৭৬২৯৬ (ফ্যা) monwar.hossain@gmail.com
জনাব এ.কে.এম. লুৎফুর রহমান সিদ্দীক প্রকল্প পরিচালক (অ.দা.) এসআইসিডি প্রকল্প	৯৫৬৯০৪১ (অ) ৯৫৫৪৮৬৭ (ফ্যা) lutfur.dhaka@yahoo.com
জনাব এ বি এম আনোয়ারুল ইসলাম জাতীয় প্রকল্প পরিচালক বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প	৯৫৫৪৫৭৭ (অ) ৮৭১৩৬১৯ (বা) ৭১১১৫৪৪ (ফ্যা) abm.anwarul@yahoo.com
জনাব মোঃ আতিয়ার রহমান এডি, বিএমএফসিবি প্রকল্প	৯৫৫৬৮০৯ (অ) atiar_dof@yahoo.com
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান পিডি, ভবদহ প্রকল্প, যশোর	০৪২১-৬১৪৩৬ (অ) ০৪২১-৬১৪৮৬ (ফ্যা)
জনাব ড. আবদুল কাদির পিডি, বৃহত্তর ফরিদপুর মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	৬৬৮৫৪৫৪ (অ)
জনাব মোঃ গোলজার হোসেন পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রকল্প (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)	৯৫৬১৬৮৫ (অ) ৯৫৬৯৯৮৯ (ফ্যা) natpdof@yahoo.com
জনাব খঃ মাহবুবুল হক এডি, এনএটিপি	৯৫১৩৬১৬ (অ) kmahbubh252@yahoo.com
জনাব মোঃ জর্জিসুর রহমান এডি, এনএটিপি	৯৫১৩৬১৬ (অ)
বেগম মোছাঃ নাসিমা সুলতানা বাজেট ও হিসাব রক্ষণ অফিসার, এনএটিপি	৯৫১৩৬১৬ (অ) nasima_dof63@yahoo.com
জনাব সরকার ফিরোজ আহমেদ মুকুল এডি, এনএটিপি	৯৫৫৫৩৫১ (অ) sarkerferoz@yahoo.com
জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম ডিপিডি, আরএফএলডিসি, নোয়াখালী	০৩২১-৬১৯৭৪ (অ) ০৩২১-৬২৮০৮ (ফ্যা)
জনাব মোঃ আবুল হাশেম পিডি, ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রিহেবিলিটেশন প্রকল্প	৯৫৬৭২১৯ (অ) hashemsumon@yahoo.com
জনাব মোঃ তৌহিদুর রহমান এডি, ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রিহেবিলিটেশন প্রকল্প	৯৫৬৬১০৩ (অ) touhiddof@gmail.com
জনাব কাজী ইকবাল আজম পিডি, চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্প	৯৫৫৩১৩৩ (অ)
জনাব মোঃ সামছুজ্জামান খান এডি, চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন প্রকল্প	৯৫৫৬৬৮৫ (অ)
ড. মোঃ রিয়াজ উদ্দিন সরকার পিডি, মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়ন প্রকল্প	৭১১৯০৪২ (অ) ৯৫৬৮৩৯৩ (ফ্যা)
জনাব.মোঃ মনিরুজ্জামান এডি, মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়ন প্রকল্প	৯৫৬১৮২০ (অ) monitang64@yahoo.com
জনাব মোঃ মুখলেসুর রহমান ডিএডি, মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়ন প্রকল্প	৯৫৬১৮২০ (অ) mmukhlesdof@gmail.com
জনাব ছালেহ আহমদ এনপিডি, BEST প্রকল্প	৭১৬৮৩৮০ (অ) saleh_ahmednpd@yahoo.com
জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান এডি, BEST প্রকল্প	৭১৬৮৩৮০ (অনুঃ)
জনাব এ বি এম সাব্বির এডি, BEST প্রকল্প	৯৫৬২৩৩৪ (অ)
জনাব এ বি এম জাহিদ হাবিব পিডি, জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্প	৯৫১৩৮৫৭ (অ)
ড. নির্মল চন্দ্র রায় এডি, জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্প	৯৫১৩৮৫৮ (অ) nirmalfirst@gmail.com
বেগম মাসুদ আরা মমি ডিএডি, জাটকা সংরক্ষণ প্রকল্প	৯৫১৩৮৫৮ (অ) masudara_momi@yahoo.co.uk
প্রকল্প পরিচালক, বাঁওড় প্রকল্প	০৪২১-৬৩১০৮ (অ)
ড. নিত্যানন্দ দাস পিডি, বাগদা চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প, খুলনা	০৪১-৮৬১০৬৭ (অ)
জনাব মোঃ ওবাইদুল্লাহ পিডি, বৃহত্তর পাবনা প্রকল্প	০৭৩১-৬৬০৬৮ (অ) ০৭৩১-৬৪৫১৫ (ফ্যা)
জনাব মোঃ আবদুল হান্নান মিয়া পিডি, কাপ্তাই লেক প্রকল্প (ডিওএফ অংশ)	০৩৫১-৬২৩২৭ (অ)
ড. মজিবুর রহমান পিডি, হাওর অঞ্চলে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৯৫৫৬২৮৪ ০১৭১২-৫১৭০৪৫
ড. মোঃ আবদুস সবুর এডি, হাওর ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৯৫৫৬২৮৯ a.sabur030856@yahoo.com
ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম এডি, হাওর ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৯৫৫৬২৮৯
ড. মোঃ শামসুল কবির পিডি, মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিন প্রকল্প	০১৭১-৯৭৯২৩০
জনাব মোঃ আরিফুর রহমান তরফদার পিসিডি, আইলা কর্মসূচি	৯৫৫২১৭৯ (অ)
জনাব তপন কুমার পাল পিসিডি, হাওর উন্নয়ন কর্মসূচি	৯৫৬১৪৩৭ (অ) tapanaddof@yahoo.com
ড. আ ন ম আজিজুল ইসলাম খান ফোকাল পয়েন্ট,সাইক্লোন সিডর প্রকল্প	৯৫৬০৬৫৩ (অ) azizuldof@yahoo.com

সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম	
জনাব নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ুন পরিচালক nasir_dof@yahoo.com	০৩১-৭২১৭৩১ (অ) ০৩১-২৫৮১৪৯ (ফ্যা)
উপপরিচালক	০৩১-৮১৬৭৮৪ (অ)
জনাব মোঃ আব্দুর রউফ পিএসও, সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা	০৩১-৭২৪২০৬ (অ) ০২-৭৬৪৭৩৭৭ (বা)
ড. মোঃ শরিফউদ্দিন সহকারী পরিচালক	০৩১-২৫১৭৩৯১ (অ)
জনাব এ. কে. এম. শরীফুল আলম সিদ্দিকী, সহকারী পরিচালক	০৩১-২৫১৭৩৯১ (অ)

মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তরসমূহ	
জনাব নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস উপপরিচালক, ঢাকা	৭১৬০৪৯৪ (অ) brnittya@yahoo.com
জনাব মোঃ মানিক মিয়া এফআইকিউসি অফিসার ঢাকা	৯৫৬২৩৩৪ (অ) miamanik443@yahoo.com
বেগম কাজী হেলেনা আরজু এফআইকিউসি অফিসার ঢাকা	৯৫৬৩৬৭৪ (অ) arju1960@yahoo.com
উপপরিচালক, চট্টগ্রাম	০৩১-৬৮২৬০৩ (অ)
ড. নিত্যানন্দ দাস উপপরিচালক, খুলনা	০৪১-৭৬০৪৯৫ (অ)
জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম সরদার এফআইকিউসি অফিসার খুলনা	০৪১-৭৬২০৭৩ (অ)
জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা এফআইকিউসি অফিসার খুলনা	০৪১-৫৮৫০১৭৯ (অ)

মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ	
জনাব মোঃ নুরতাজুল হক পরিচালক (অ.দা), এফটিএ, সাভার	৭৭১২৫১৮ (অ)
অধ্যক্ষ, এফটিআই, চাঁদপুর	০৮৪১-৬৩৪০২ (অ)
জনাব কাজী মাহবুবুল হক অধ্যক্ষ, এফটিইসি, ফরিদপুর	০৬৩১-৬২৪৫৭ (অ)
জনাব এস. এম. মহিব উল্যাহ এসএসও, এফবিটিসি, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর	০৩৮২২-৫৬০৩৭ (অ) ০৩৮২২-৫৬০৩৯ (ফ্যা)
জনাব তপন কুমার দাস প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, এফবিটিসি, পার্বতীপুর	০৫৩৩৪-৭৪৩২৪ (অ) ০৫৩৩৪-৭৪৪০২ (অ)
জনাব সুবল চন্দ্র পণ্ডিত এফটিসি, কোটচাঁদপুর	০৫৩৩৪-৭৪৩২৪ (অ)

কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারমাড়ি, ঢাকা	
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম পরিচালক	৯১১২২৬০ (অ) ৯৬৭২৭৫৫ (বা)
সৈয়দ খোরশেদ জাফরী প্রধান তথ্য অফিসার	৮১৩০৪৭২ (অ)
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ফার্ম ব্রডকাস্টিং অফিসার	৯১১৪২৬৪ (অ)

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা	
জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান মহাপরিচালক	৯১৪০৮৫০ (অ) ৮৯৫৯০৫২ (বা)
ড. মোঃ আনিস উদ্দিন পরিচালক (সরেজমিন উইং)	৮১২৩১৪৭ (অ)
কৃষিবিদ মোঃ হাসানুল হক পরিচালক (উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং)	৯১৩১২৯৫ (অ) ৯১১৮৫৬১ (বা)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা	
জনাব মোঃ আশ্রাফ আলী মহাপরিচালক	৮১১২৯৮৩ (অ) ৯১০১৯৩২ (অ)
ডা. মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন পরিচালক (প্রাণিস্বাস্থ্য ও প্রশাসন)	৯১১৭৭৩৬ (অ)

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা	
ড. খান শহীদুল হক মহাপরিচালক	৭৭৯১৬৭৬ (অ) ৭৭৯১৬৮৮ (বা)

পরিকল্পনা কমিশন, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা	
ড. শামসুল আলম সদস্য (কৃষি)	৯১৪২৪৫৫(অ) ৮১৫৭০৮১ (বা)
জনাব মুঃ আনোয়ারুল আলম একান্ত সচিব	৯১০০৬৪৮ (অ) ৮০৩২৪২২ (বা)
বিভাগ প্রধান	৯১১১৭২৫ (অ)
বেগম নাসরীন সুলতানা যুগ্ম-প্রধান (বমপ্রা ও সমন্বয়)	৮১১৬২২১ (অ) ৭৩১৮৯৫৩ (বা)
বেগম ইস্‌রাত জাহান তস্‌লিম উপ-প্রধান (মওপ্রা)	৯১১৭৫৪৬ (অ) ৯১৩০১৯৯ (বা)
বেগম শাহিনা সুলতানা সহকারী প্রধান (মওপ্রা)	৯১১৭০৩৯ (অ)

আইএমইডি, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা	
জনাব মোঃ হাবিব উল্লা মজুমদার সচিব	৮১১৫০২৬ (অ) ৮৬৫৩৩৭১ (বা)
বেগম খোদেজা বেগম প্রধান	৮১১২৭১৩ (অ) ৮০৫৮২৩৮ (বা)
জনাব অমুল্য কুমার দেবনাথ মহাপরিচালক, CPTU	৯১৪৪২৫২ (অ) ৮১২৬১৮৭ (বা)
জনাব আবু জাফর মোঃ ফরিদ উদ্দিন চৌধূরী, পরিচালক	৯১৩২৭৫৬ (অ)
জনাব মোহাম্মদ আরিফুল হক সহকারী পরিচালক	৮১১৮১৫৩ (অ)

ইআরডি, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা	
জনাব এম মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া সচিব	৯১১৩৭৪৩ (অ) ৯৮৬০১৫৪ (বা)
জনাব আরাস্তু খান অতিরিক্ত সচিব	৯১৮০৬৭৫ (অ) ৯৮৯০৯৫৫ (বা)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা	
ড. ওয়ায়েস কবির নির্বাহী চেয়ারম্যান	৯১৩৫৫৮৭ (অ) ৯০১৪৯৭৫ (বা)
ড. আহাম্মদ আলী হাসান সদস্য পরিচালক (মৎস্য)	৯১১১৪৩২ (অ)

কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, খামারবাড়ি, ঢাকা	
কৃষিবিদ ড. নীতীশ চন্দ্র দেবনাথ সভাপতি	৯১১৪১০৭ (অ)
কৃষিবিদ আ. ফ. ম. বাহাউদ্দিন নাছিম মহাসচিব	৯১১১৪৩২ (অ)

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মতিঝিল, ঢাকা	
বেগম খুরশিদা খাতুন চেয়ারম্যান	৭১৬২০০১ (অ) ৮৩৬০১৬৬ (বা)
জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন খান পরিচালক (অর্থ)	৭১৬২৮০০ (অ) ৯৩৩১৩৫৭ (বা)
পরিচালক (ক্রয় ও বিপণন)	৯৫৬৪০০৭ (অ)
জনাব তৌহিদা বুলবুল (সচিব)	৯৫৫২৬৮৯ (অ)

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	
ড. মোঃ আব্দুল মান্নান মহাপরিচালক	৯২৫২৭৩৬ (অ) ৯২৫২১৭৬ (বা)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	
ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম মণ্ডল মহাপরিচালক	৯২৫২৭১৫ (অ) ৯১৪৩২৩১ (বা)
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন	
ড. এস. এম. নাজমুল ইসলাম চেয়ারম্যান	৯৫৬৪৩২৮ (অ) ৯১৩৭৩৪৯ (বা)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্যভবন, ঢাকা	
জনাব অশোক কুমার দেবনাথ উপপরিচালক (উপ-সচিব)	৭১৬৯৪৫৪ (অ)
জনাব সাজ্জাদ হোসেন তথ্য অফিসার (মৎস্য)	৭১৬৯৪৫৩ (অ)
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	
ড. মোঃ গোলাম হোসেন মহাপরিচালক dgbfri@fri.gov.bd	০৯১-৬৫৮৭৪ (অ) ০৯১-৬১১১০ (বা) ফ্যাক্স: ০৯১-৬৬৫৫৯
ড. মোঃ নুরুল্লাহ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	০৯১-৬১২৩১ (অ) nurullahbfri@yahoo.com
জনাব মোঃ জাহের সিএসও, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর	০৮৪১-৬৩৪০৭ (অ) zaherbfri@yahoo.com
ড. মোঃ শাহাবউদ্দিন সিএসও, সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার	০৩৪১-৬৩৮৫৫ (অ) ০৩৪১-৬৩২২৭ (বা) shahabuddin10@live.com
মৎস্য বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ	০৯১-৬৭৪০১-০৬ ফ্যাক্স: ৬১৫১০
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা	০৪১-৭২০১৭১-৩ ফ্যাক্স: ৭৩১২৪৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	৯৬৬১৯০০-১৯ ফ্যাক্স: ৮৬১৫৫৮৩
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	৯১৪৪২৭০-৮
বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	৯২০৫৩১০-১৪
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	০৭২১-৭৫০০৪১-৯
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	০৩১-৭১৬৫৫২
মেরিন ফিসারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম	০৩১-৬৩৪৩৭৫
হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর	০৫৩১-৬৫৪২৯
মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল	০৯২১-৫৫৩৯৯
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার	৭৭০৮৪৭৮-৫
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	০৮২১-৭৬০৯৩০
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী	০৪৪২৭-৫৬০১৪
শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ফিসারিজ কলেজ, মেলান্দহ, জামালপুর	০১৭১১৬১৩৩০১

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	
এ্যাটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ	৯৫৬২৮৬৮ (অ)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা	৭৭১০০১০-১৬
বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন	৯১১৭৪৭৬ (সি. স্কেল) ৯১৪৩২০৪ (বিভাগীয়)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা	০৮১-৬৩৬০০
মেরিন ফিসারিজ এসোসিয়েশন, ঢাকা	৯১২০২৩৪
পরিচালক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	৮১৫১৪৯৭
প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস্ এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন	৮৩১৬৮৮২ ৮৩১৭৫৩১
ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক সংস্থা	
বিশ্ব ব্যাংক	৯৬৬৯৩০১-৮
এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	৯৩৩৪০১৭-২২
বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি	৯৫৬৯৩২০
এফ এ ও	৮১১৮০১৫-৮
ইউ এন ডি পি	৮১১৮৬০০-০৬
ওয়ার্ল্ডফিস সেন্টার	৮৮১৩২৫০
ইউরোপীয় ইউনিয়ন	৯৮৬২১৯৯
আই ইউ সি এন	৯৬৬৪৯৩০
জাইকা	৮১২৪৫৫১-৩
আই এম এফ	৯৫৫০২৭৫
ইউনিসেফ	৯৩৩৬৭০১-২০
বিশ্ব খাদ্য সংস্থা	৮১১৮৪০৮
ঢাকা বিভাগ	
জনাব পরিমল চন্দ্র দাস উপপরিচালক parimal.das58@yahoo.com	৯৫৫০৮২২(অ) ৯৫৬৫০২২(ফ্যা)
জনাব ফেরদৌস আহ্মেদ সহকারী পরিচালক	৯৫৬৫০২২(অ) fahmed1959@hotmail.com
জনাব মোঃ আব্দুস সালাম সহকারী পরিচালক, ইউনিয়ন পর্যায় প্রকল্প	asalam_id61@yahoo.com
ঢাকা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfo.dhaka@fisheries.gov.bd	৯৫৫৮৮৮৩(অ) ৯৫৫৮৮৮৩(ফ্যা)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাভার	৭৭৪৭৫৩৪(অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধামরাই	০৬২২২-৭১১৪৭(অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কেরানীগঞ্জ	৭৭৬৬৪৭৭(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দোহার	০৩৮৯৪-৬৮০০২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবাবগঞ্জ	০৬২২৫-৫৬২৪৯(অ)
মানিকগঞ্জ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfo.manikganj@ fisheries.gov.bd	০৬৫১-৬১৩৯১(অ) ০৬৫১-৬১৩৯১(ফ্যা)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৫১-৬১৭৯৩(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবালয়	০৬৫১-৭৫২৪১(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঘিওর	০৬৫২৩-৫৬৩৪১(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাটুরিয়া	০৬৫২৫-৬২০৬৪(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দৌলতপুর	০৬৫২২-৭৪১৬৬(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হরিরামপুর	০৬৫২৪-৫৬০৪৬(অ)

মুন্সিগঞ্জ জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfo.munshiganj@fisheries.gov.bd	০৬৯১-৬২৫৯১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৯১-৬৩৩৭৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীনগর	০৬৯২৫-৮৮০১৯ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিরাজদিখান	০৬৯২৪-৮৮০২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টঙ্গীবাড়ী	০৬৯২৬-৭৪২৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,লৌহজং	০৬৯২৩-৫৬২৭৭ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মুন্সিগঞ্জ সদর	০৬৯১-৬২৫৮৩

গাজীপুর জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfo.gazipur@fisheries.gov.bd	০২-৯২৫২৫২০ (অ) ০২-৯২০৫২৭৯(বা)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	০২-৯২০৫২৪৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীপুর	০৬৮২৫-৫১০৪২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাপাসিয়া	০৬৮২৪-৫১৩৯৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিয়াকৈর	০৬৮২২-৫১১৪৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিগঞ্জ	০৬৮২৩-৫১১০৭ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, টঙ্গী	০২-৯২৯১৩১৭ (অ)

নরসিংদী জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfo.narsingdi@fisheries.gov.bd	০২-৯৪৬২৪১০ (অ) ০২-৯৪৫১৩০০ (বা)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০২-৯৪৬২৪৫২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রায়পুরা	০৬২৫৫-৫৬১৪৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবপুর	০৬২৮-৭৫০৯৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পলাশ	০৬২৮-৭৪৪১৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেলাবো	০৬২৫২-৬৩১০৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মনোহরদী	০৬২৫৩-৫৬১৪৫ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, নরসিংদী সদর	০২-৯৪৬৩০০৬ (অ)

নারায়ণগঞ্জ জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfo.narayangan@fisheries.gov.bd	০২-৭৬৩০৬২৫ (অ) ০২-৭৬৩০৬২৫ (ফ্যা)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০২-৭৬৪৮৩৫৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সোনারগাঁ	০৬৭২৩-৫৬৩০১ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আড়াইহাজার	০৬৭২২-৫৬০৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বন্দর	০২-৭৬৬১১১৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রূপগঞ্জ	০৬৭২৫-৫৬০২৭ (অ)

ফরিদপুর জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfo.faridpur@fisheries.gov.bd	০৬৩১-৬৩২২৩ (অ) ০৬৩১-৬৩২২৩ (ফ্যা)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৩১-৬৬৬১২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বোয়ালমারী	০৬৩২৪-৫৬২৮৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আলফাডাঙ্গা	০৬৩২২-৫৬১২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নগরকান্দা	০৬৩২৭-৫৬৩২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মধুখালী	০৬৩২৬-৫৬১৫২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চরভদ্রাসন	০৬৩২৫-৫৬০৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভাঙ্গা	০৬৩২৩-৫৬৫৪৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ফরিদপুর সদর	০৬৩১-৬৩৯৯০ (অ)

রাজবাড়ী জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfo.rajbari@fisheries.gov.bd	০৬৪১-৬৫৫৮৩ (অ) ০৬৪১-৬৫৫৮৩ (ফ্যা)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৪১-৬৫০৫৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাংশা	০৬৪২৪-৭৫০৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বালিয়াকান্দি	০৬৪২-৫৬০২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোয়ালন্দ	০৬৪২৩-৫৬৩৮০ (অ)

মাদারীপুর জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfo.madaripur@fisheries.gov.bd	০৬৬১-৫৫৪৪২ (অ) ০৬৬১-৫৫৪৪২ (ফ্যা)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬৬১-৫৫৪১৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালকিনি	০৬৬২২-৫৬১৮৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজৈর	০৬৬২৩-৫৬১৪৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবচর	০৬৬২৪ -৫৬১২৯ (অ)

গোপালগঞ্জ জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfo.gopalganj@fisheries.gov.bd	০২-৬৬৮৫৪৫৪ (অ) ০২-৬৬৮৫৪৫৪ (ফ্যা)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০২-৬৬৮৫৬১৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টুঙ্গীপাড়া	০২-৬৬৫৬৩৫৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুকসেদপুর	০৬৬৫৪-৫৬২৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাশিয়ানী	০৬৬৫২-৫৬২০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোটালীপাড়া	০২-৬৬৫১৩১৫ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, গোপালগঞ্জ	০২-৬৬৮৫৯৪২

শরীয়তপুর জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfo.shariatpur@fisheries.gov.bd	০৬০১-৬১৬৫৬ (অ) ০৬০১-৬১৬৫৬ (ফ্যা)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৬০১-৬১৪৮২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জাজিরা	০৬০২৭-৫৬০৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভেদরগঞ্জ	০৬০২২-৫৬২২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোসাইরহাট	০৬০২৪-৭৫৭৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডামুড্যা	০৬০২৩-৫৬৩৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নড়িয়া	০৬০১-৫৯১৪৫ (অ)

ময়মনসিংহ জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfo.mymenising@fisheries.gov.bd	০৯১-৬৬৭৪৮ (অ) ০৯১-৬৬৭৪৮ (ফ্যা)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯১-৬৬১৫০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গৌরীপুর	০৯০২৪-৫৬০৯৭ (অ)

সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নান্দাইল	০৯০২৯ -৬৪৩৬ ০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ত্রিশাল	০৯০৩২ -৫৬০৫৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঈশ্বরগঞ্জ	০৯০২৯ -৫৬০৫৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুক্তাগাছা	০৯০২৮ -৭৫৩৫১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ীয়া	০৯০২৩ -৭৩০৪৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভালুকা	০৯০২২ -৫৬০৫০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গফরগাঁও	০৮০২৫ -৫৬২২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হালুয়াঘাট	০৯০২৬ -৫৬১৩৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধোবাউড়া	০৯০৩৪ -৫৬০৮৪ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, গৌরীপুর	০৯০২৪ -৫৬০১৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মাসকান্দা	০৯ ১-৬৬ ১৫৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, শম্ভুগঞ্জ	০৯১-৬৬৩৩৯
কিশোরগঞ্জ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfo.kishoreganj@fisheries.gov.bd	০৯৪১ -৬১৯২৭ (অ) ০৯৪১ -৬১৯২৭ (ফ্যা)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯৪১ -৬১৭১২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, করিমগঞ্জ	০৯৪২৭ -৫৬০১৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভৈরব	০৯৪২৪ -৭১৭১৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাজিতপুর	০৯৪২৩ -৬৪২৯১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কটিয়াদী	০৯৪২৮ -৫৬১৫২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মিঠামইন	০৯৪৩৫ -৫৬০২৩ (অ)
উপ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তাড়াইল	০৯৪৩৪ -৭৫১৮১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ইটনা	০৯৪২৬ -৫৬০৫৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, অষ্টগ্রাম	০৯৪২২ -৫৬০৫৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হোসেনপুর	০৯৪২৫ -৫৬০২৮ (অ)
নেত্রকোণা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfo.netrokana@fisheries.gov.bd	০৯৫১ -৬১৪০৪ (অ) ০৯৫১ -৬১৪০৪ (ফ্যা)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা , সদর	০৯৫১ -৬১৩৫৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোহনগঞ্জ	০৯৫২৪ -৫৬০৪৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বারহাট্টা	০৯৫২৩ -৫৬০৮৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কেন্দুয়া	০৯৫২৮ -৫৬০০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আটপাড়া	০৯৫২২ -৭৪০৫৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পূর্বধলা	০৯৫৩২ -৫৬১২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মদন	০৯৫২৯ -৫৬১৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কলমাকান্দা	০৯৫২৭ -৫৬১৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খালিয়াজুরী	০৯৫২৬ -৫৬০৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দুর্গাপুর	০৯৫২৫ -৫৬৩৪৪ (অ)
জামালপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfo.jamalpur@fisheries.gov.bd	০৯৮১ -৬৩৬২০ (অ) ০৯৮১ -৬৩৬২০ (ফ্যা)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯৮১ -৬৩২০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ইসলামপুর	০৯৮২৪ -৭৪১৭১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেওয়ানগঞ্জ	০৯৮২৩ -৭৫১২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মাদারগঞ্জ	০৯৮২৫ -৫৬১০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সরিষাবাড়ী	০৯৮২৭ -৫৬২৬১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বকসীগঞ্জ	০৯৮২২ -৫৬১৮৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মেলান্দহ	০৯৮২৬ -৫৬১৮০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, জামালপুর সদর	০৯৮১ -৬৩৩৫১ (অ)

শেরপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfo.sherpur@fisheries.gov.bd	০৯৩১ -৬১৪৪৭ (অ) ০৯৩১ -৬১৪৪৭ (ফ্যা)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	০৯৩১ -৬২৪৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নকলা	০৯৩২৩ -৭৫০৬০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নালিতাবাড়ী	০৯৩২৪ -৭৩৩০৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঝিনাইগাতী	০৯৩২২ -৭৪০৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীবর্দী	০৯৩২৫ -৫৬০৭৯ (অ)
টাঙ্গাইল জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা dfo.tangail@fisheries.gov.bd	০৯২১ -৫৩৬৭৮ (অ) ০৯২১ -৫৩৬৭৮ (ফ্যা)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৯২১ -৫৪০৭১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা , মির্জাপুর	০৯২২৯ -৫৬২২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাগরপুর	০৯২৩৩ -৭৩০৫০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোপালপুর	০৯২২৬ -৭৫১৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভূয়াপুর	০৯২২৩ -৫৬১৮৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিহাতী	০৯২২৭ -৭৪০৭০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাসাইল	০৯২২২ -৫৬১২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সফিপুর	০৯২৩২ -৫৬১৮৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঘাটাইল	০৯২২৫ -৫৬০১০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মধুপুর	০৯২২৮ -৫৬০৮৫ (অ)
খুলনা বিভাগ	
জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার উপপরিচালক mdabdussattar 1953@ yahoo. com	০৪১ -৭৬২৬৩৫ (অ) ০৪১ -৮৬১২৮৯ (অ) ০৪১ -৮৬০০১৫ (ফ্যা)
জনাব মোঃ নাজমুল হুদা সহকারী পরিচালক (অ.দা.)	০৪১ -৮৬০৫৮৩ (অ)
খুলনা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪১ -৭৬৩০১৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলতলা	০৪১ -৭০১৪৫২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তেরখাদা	০৪০২৯ -৫৬০২১ (অ)
সি. উপে জলা মৎস্য কর্মকর্তা, বটিয়াখাটা	০৪০২২ -৫৬০২৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডুমুরিয়া	০৪০২৫ -৫৬০২৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দাকোপ	০৪০২৩ -৫৬০৭৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাইকগাছা	০৪০২৭ -৫৬২৬২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রূপসা	০৪১ -৮০০১২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কয়রা	০৪০২৬ -৫৬০৩৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দিঘলিয়া	০৪১ -৮৯০০১২ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ডুমুরিয়া	০৪০২৫ -৫৬১১৭ (অ)
সাতক্ষীরা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৭১ -৬৩৩১৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৭১ -৬৩৮৪০ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কলারোয়া	০৪৭২৪ -৭৫৩২৪ (অ)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তালা	০৪৭২৩ -৫৬১২২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আশাশুনী	০৪৭২২ -৫৬০২০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০৪৭২৫ -৫৬০৫৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্যামনগর	০৪৭২৬ -৭৪০২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেবহাটা	০৪৭৩২ -৭২০৫৫ (অ)

বাগেরহাট জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৬৮ -৬২৪৪৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৬৮ -৬২৪৪৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামপাল	০৪৬৫৭ -৫৬০২৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোড়েলগঞ্জ	০৪৬৫৬ -৫৬২০৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোংলা	০৪৬৫৮ -৭৩২১৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কচুয়া	০৪৬৫৪ -৫৬০০৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চিতলমারী	০৪৬৫২ -৫৬০২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোলাহাট	০৪৬৫৫ -৫৬০২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফকিরহাট	০৪৬৫৩ -৫৬২৪৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শরণখোলা	০৪৬৫৯ -৫৬০৪৭ (অ)

যশোর জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪২১ -৬৫৭৫২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪২১ -৬৮৯৮১ (অ)
	০৪২২২ -৭১১২৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঝিকরগাছা	০৪২২৫ -৭১৫২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মনিরামপুর	০৪২২৭ -৭৮৪২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কেশবপুর	০৪২২৬ -৫৬৩৭২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঘারপাড়া	০৪২২৩ -৫৬০২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শার্শা	০৪২২৮ -৭৫৪০১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চৌগাছা	০৪২২৪ -৫৬৩৬৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, যশোর সদর	০৪২১ -৬৪০৪৬ (অ)

ঝিনাইদহ জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৫১ -৬২৮৫৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৫১ -৬১৩৮১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০৪৫২৩ -৫৬১০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোটচাঁদপুর	০৪৫২৪ -৬৫০৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহেশপুর	০৪৫২৫ -৫৬২৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শৈলকুপা	০৪৫২৬ -৫৬০৬০ (অ)
ম্যানেজার, কেন্দ্রীয় হ্যাচারি, কোটচাঁদপুর	০৫৩৩৪ -৭৪৩২৪ (অ)

নড়াইল জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৮১ -৬২০৩৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৮১ -৬২০৪২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লোহাগড়া	০৪৮২৩ -৫৬৩৫৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিয়া	০৪৮২২ -৫৬০৫৪ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, সদর	০৪৮১ -৬২০৬৬ (অ)

মাগুরা জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৮৮ -৬২৩৪১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৮৮ -৬২৩১১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শালিখা	০৪৮৫৩ -৫৬১০৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুহম্মদপুর	০৪৮৫২ -৭৫১৫৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীপুর	০৪৮৫৪ -৫৬১৫২ (অ)

কুষ্টিয়া জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭১ -৬২১৮৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭১ -৭১১৫৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুমারখালী	০৭০২৫ -৭৬৪৬৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খোকসা	০৭০২৪ -৫৬৩৭৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মিরপুর	০৭০২৬ -৫৬৪৫৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভেড়ামারা	০৭০২২ -৭১৫৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দৌলতপুর	০৭০২৩ -৭৫২৬২ (অ)

মেহেরপুর জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৯১ -৬২৫৪৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৯১ -৬২৬৪৩ (অ)

চুয়াডাঙ্গা জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৬১ -৬২৩৮৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৬১ -৬৩১২৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জীবননগর	০৭৬২৪ -৭৫০৫৬ (অ)

রাজশাহী বিভাগ

জনাব এম আই গোলদার উপপরিচালক golder4@gmail.com	০৭২১ -৭৬০১৮৪ (অ) ০৭২১ -৭৭৩১৫০ (বা) ০৭২১ -৭৬০১৮৪(ফ্যা)
জনাব মোঃ সাইদুর রহমান, সহকারী পরিচালক	০৭২১ -৮৬০০০২ (অ)
জনাব সুভাষ চন্দ্র সাহা সহকারী পরিচালক, ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকল্প	০৭২১ -৮৬০৫৯০ (অ)
বেগম মঞ্জুয়ারা বেগম বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য সম্পদ জরিপ	০৭২১ -৮৬১৫০১ (অ)

রাজশাহী জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭২১ -৭৬০২৪৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পবা	০৭২১ -৭৬০৮২৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পুঠিয়া	০৭২২৮ -৫৬৩২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চারঘাট	০৭২২৩ -৫৬১১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঘা	০৭২৩৩ -৫৬১০৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগমারা	০৭২২২ -৫৬০৫১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মোহনপুর	০৭২২৬ -৫৬০২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তানোর	০৭২২৯ -৫৬০২৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী	০৭২২৫ -৫৬১৮১ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, রাজশাহী সদর	০৭২১ -৮৬১৪৪০ (অ)

নাটোর জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৭১ -৬২৫৯০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৭১ -৬২৬৪১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বড়াইগ্রাম	০৭৭২৩ -৫৬০৪৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গুরুদাসপুর	০৭৭২৪ -৭৪৪০৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিংড়া	০৭৭২৬ -৬৩১২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগাতিপাড়া	০৭৭২২ -৭২০৩৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালপুর	০৭৭২৫ -৭৫০৬০ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, নাটোর সদর	০৭৭১ -৬২৯১৮ (অ)

নওগাঁ জেলা

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৪১ -৬২৫৮৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৪১ -৬২৮২৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মান্দা	০৭৪২৫ -৬২০৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাপাহার	০৭৪৩২ -৭৪০৭৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহাদেবপুর	০৭৪২৬ -৫৭১২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নিয়ামতপুর	০৭৪২৭ -৫৬০৬৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাণীনগর	০৭৪৩৩ -৫৬০৪৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আত্রাই	০৭৪২২ -৭১০০৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বদলগাছী	০৭৪২৩ -৫৬০২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধামুইরহাট	০৭৪২৪ -৫৬০৮৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পত্নীতলা	০৭৪২৮ -৬৩০৯৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পোরশা	০৭৪২৯ -৫৬০১৩ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, নওগাঁ সদর	০৭৪১ -৬১৭৬১ (অ)

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৮১-৫৫৪৮২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৮১-৫৫৮৩৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাচোল	০৭৮২৪-৫৬০৩২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোমস্তাপুর	০৭৮২৩-৭৪১১২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবগঞ্জ	০৭৮২৫-৭৫২৩৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভোলাহাট	০৭৮২২-৫৬০৪৯ (অ)
পাবনা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৩১-৬৬০৬৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৩১-৬৪৯৩১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঈশ্বরদী	০৭৩২৬-৬৩৯১০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফরিদপুর	০৭৩২৫-৬৪০২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আটঘড়িয়া	০৭৩২২-৫৬০২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাটমোহর	০৭৩২৪-৬৫৩২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভাঙ্গুড়া	০৭৩২৮-৫৬১০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেড়া	০৭৩২৩-৭৫১২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাথিয়া	০৭৩২৭-৫৬১৫৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সুজানগর	০৭৩২৯-৫৬১৬৮ (অ)
সিরাজগঞ্জ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৭৫১-৬২১৩৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৭৫১-৬২৯৩৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উল্লাপাড়া	০৭৫২৯-৫৬১৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাজীপুর	০৭৫২৫-৫৬২০৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শাহজাদপুর	০৭৫২৭-৬৪৫৩৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কামারখন্দ	০৭৫২৪-৫৬০২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তাড়াশ	০৭৫২৮-৪৬১০৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রায়গঞ্জ	০৭৫২৬-৫৬১২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেলকুচি	০৭৫২২-৫৬৫০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চৌহালি	০৭৫১-৬৩৮২৩ (অ)
প্রকল্প মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উল্লাপাড়া	০৭৫২৯-৫৬২১৫ (অ)
জয়পুরহাট জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৭১-৬২২২৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৭১-৬২২৭৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাঁচবিবি	০৫৭১-৭৫২৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালাই	০৫৭২৬-৫৬০৮৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আক্কেলপুর	০৫৭২২-৬৪০১৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ক্ষেতলাল	০৫৭২৩-৫৬০৪৫ (অ)
বগুড়া জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫১-৬০৫৭০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫১-৬৪৩৮৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শেরপুর	০৫০২৯-৭৭৪১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আদমদীঘি	০৭৪১-৬৯২২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাহালু	০৫০২৬-৫৬০৩০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নন্দীগ্রাম	০৫০২৭-৭৬০১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শিবগঞ্জ	০৫০৩৩-৬৯০৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সারিয়াকান্দী	০৫১-৫৬২৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দুপচাঁচিয়া	০৫০২৪-৮৮০৯২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধুনট	০৫০২৩-৫৬২৪১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাবতলী	০৫০২৫-৭৫০৮৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সোনাতলা	০৫০৩২-৭৯১১৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাহজাহানপুর	০৫১৮২২৫৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মালতিনগর	০৫১-৬৫৩৩৮ (অ)

রংপুর বিভাগ	
জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান চৌধুরী উপপরিচালক	০৫২১-৬৪৭৭০ (অ) ০৫২১-৫৫০৪৬ (বা)
সহকারী পরিচালক	০৫২১-৫৫০৪৫ (অ)
রংপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫২১-৬২৯২৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫২১-৬২২৩০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পীরগঞ্জ	০৫২২৭-৫৬০৯৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মিঠাপুকুর	০৫২২৫-৮৭০৮১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বদরগঞ্জ	০৫২২২-৫৬২৭৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাউনিয়া	০৫২২৪-৫৬০৩৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গঙ্গাচড়া	০৫২২৩-৫৬০০৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পীরগাছা	০৫২২৬-৫৬০৬৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তারাগঞ্জ	০৫২২৮-৫৬০৩৪ (অ)
কুড়িগ্রাম জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৮১-৬১৫০১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৮১-৬১৮৫৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	০৫৮২-৫৫৬০১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজিবপুর	০৫৮২৩-৫৬২১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাগেশ্বরী	০৫৮২৬-৫৬৩২১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উলিপুর	০৫৮২৯-৫৬২৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চিলমারী	০৫৮২৪-৫৬০৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রৌমারী	০৫৮২৫-৫৬০৫১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজারহাট	০৫৮২৭-৫৬০০৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভুরুঙ্গামারী	০৫৮২২-৫৬০৭৪ (অ)
নীলফামারী জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৫১-৬১৫৭০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৫১-৬১৭৭০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডিমলা	০৫৫২২-৫৬২৩৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সৈয়দপুর	০৫৫২৬-৭২৯৪৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ	০৫৫২৫-৫৬০১৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ডোমার	০৫৫২৩-৭৫১৮২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জলঢাকা	০৫৫২৪-৬৪০৮৩ (অ)
ঠাকুরগাঁও জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৬১-৫৩৪৬৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৬১-৫২৫২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাণীসংকৈল	০৫৬২৫-৫৬১১৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বালিয়াডাঙ্গী	০৫৬২২-৫৬০৫৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হরিপুর	০৫৬২৩-৫৬০১৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পীরগঞ্জ	০৫৬২৪-৫৬৩৮৯ (অ)
দিনাজপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৩১-৬৪৪৮৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৩১-৬৩৩১৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বীরগঞ্জ	০৫৩২৩-৭২৫১১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাহারোল	০৫৩৩৫-৫৬০৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিরল	০৫৩২৪-৫৬০১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চিরিরবন্দর	০৫৩২৬-৫৬১৯৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	০৫৩২৭-৫৬৩২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিরামপুর	০৫৩২২-৫৬০২৭ (অ)

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাকিমপুর	০৫৩২৯-৭৫১০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খানসামা	০৫৩৩২-৫৬০১০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঘোরাঘাট	০৫৩২৮-৫৬০২৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পার্বতীপুর	০৫৩৩৪-৭৪২২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবাবগঞ্জ	০৫৩৩৩-৫৬০২৮ (অ)
লালমনিরহাট জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৯১-৬১৩৪৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৯১-৬১০২৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আদিতমারী	০২৯২২৫৬১৬৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ	০৫৯২৪-৫৬১৮৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাতীবান্ধা	০৫৯২৩-৫৬২৭৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাটগ্রাম	০৫৯২৫-৫৬০৮৮ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, লালমনিরহাট সদর	০৫৯১-৬১০৭১ (অ)
গাইবান্ধা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৪১-৬১৬৪৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৪১-৬১৯২০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পলাশবাড়ী	০৫৪২৪-৫৬০৫৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাঘাটা	০৫৪২৬-৫৬১২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোবিন্দগঞ্জ	০৫৪২৩-৭৫০৬৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাদুল্লাপুর	০৫৪১-৬১৩৪৯৩১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলছড়ি	০৫৪২২-৬২০৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সুন্দরগঞ্জ	০৫৪২৭-৬৪০৭২ (অ)
পঞ্চগড় জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৫৬৮-৬১৩৬৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৫৬৮-৬১৯৬৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আটোয়ারী	০৫৬৫২-৫৬০২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বোদা	০৫৬৫৩-৫৬১৯৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেবীগঞ্জ	০৫৬৫৪-৫৬০৬০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তেঁতুলিয়া	০৫৬৫৫-৭৫০৬৩ (অ)
চট্টগ্রাম বিভাগ	
জনাব মোঃ ছেরাজ উদ্দিন উপপরিচালক	০৮১-৭৬১২৭ (অ)
বেগম মাসুদা খানম সহকারী পরিচালক	০৮১-৭৬৫১১ (অ)
চট্টগ্রাম জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩১-২৫৮০৯৮২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পটিয়া	০৩০৩৫-৫৬৩২৯ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মিরসরাই	০৩০২৪-৫৬২৪৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আনোয়ারা	০৩০২৯-৫৬০৪৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সীতাকুণ্ডু	০৩০২৮-৫৬০৫৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঁশখালী	০৩০২৭-৫৬১৩৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাউজান	০৩০২৬-৫৬২৫৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চন্দনাইশ	০৩০৩৩-৫৬২৪৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা লোহাগাড়া	০৩০৩৪-৫৬৫১৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফটিকছড়ি	০৩০২২-৫৬২৪৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সাতকানিয়া	০৩০৩৬-৫৬৪৭৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাটহাজারী	০৩১-২৬০১৮৯৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাঙ্গুনিয়া	০৩০২৫-৫৬২০১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বোয়ালখালী	০৩০৩২-৫৬১৭৫ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, পটিয়া	০৩০৩৫-৫৬৩৪৮ (অ)

কক্সবাজার জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৪১-৬৩২৬৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৪১-৬৪২৮৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মহেশখালী	০৩৪২৪-৭৪২৮২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, টেকনাফ	০৩৪২৬-৭৫০০৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চকরিয়া	০৩৪২২-৫৬৫৩৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামু	০৩৪২৫-৫৬২৯৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উখিয়া	০৩৪২৭-৫৬১২০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পেকুয়া	০৩৪২৮-৫৬১৭৫ (অ)
ফেনী জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৩১-৭৪০৪৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৩১-৭৪০৭৩ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ছাগলনাইয়া	০৩৩২২-৭৮৪৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পরশুরাম	০৩৩২৪-৫৬০০৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলগাজী	০৩৩২৬-৭৭১৭৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দাগনভূঞা	০৩৩২৩-৭৯১৫৩ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, ফেনী সদর	০৩৩১-৭৪২৩২ (অ)
চাঁদপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৪১-৬৩১৬৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৪১-৬৫৯৮০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কচুয়া	০৮৪২৫-৫৬১৮০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শাহরাস্তি	০৮৪২৭-৫৬২০৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মতলব (দঃ)	০৮৪২৬-৫৬৩৯০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মতলব (উঃ)	০৮৪২৮-৫১০২৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাইমচর	০৪৪২৩-৫২২০১(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাজীগঞ্জ	০৮৪২৪-৭৫০৫৮(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফরিদগঞ্জ	০৮৪২২-৬৪৩৭৬(অ)
খামার ব্যবস্থাপক, কচুয়া	০৮৪২৫-৫৬১৮০ (অ)
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৫১-৫৮৫০১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৫১-৫৯০১৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবীনগর	০৮৫২৫-৭৫২৭৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঞ্ছারামপুর	০৮৫২৩-৫৬১০১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাসিরনগর	০৮৫২৬-৫৬০৫৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সরাইল	০৮৫২৭-৫৬১৫৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কসবা	০৮৫২৪-৭৩২০২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আশুগঞ্জ	০৮৫২৮-৭৪১০১ (অ)
কুমিল্লা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮১-৭৬১৫১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮১-৭৬৬০৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বুড়িচং	০৮০২৯-৫৬১৬৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লাকসাম	০৮৩২-৫১৩৩৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চৌদ্দগ্রাম	০৮০২০-৫৬২১১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চান্দিনা	০৮০২২৫৬৪১৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দেবিদ্বার	০৮২৪-৫৩২৪৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুরাদনগর	০৮০২৬-৫৬০৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দাউদকান্দি	০৮০২৩-৫৫৩৩১ (অ)

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাঙ্গলকোট	০৮০৩৩-৬৬২২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বরুড়া	০৮০২৭-৫২০৫৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর দক্ষিণ	০৮০৪২-৫৭০৩০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মেঘনা	০৮০৩৫-৫১১৯২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তিতাস	০৮০২৩-৫৫৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হোমনা	০৮০২৫-৫৪২৭২ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, জাঙ্গালিয়া খামার	০৮১-৭৬৫৪২ (অ)
রাঙামাটি জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৫১-৬২৩২৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৫১-৬৩৬০৪ (অ)
বান্দরবান জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৬১-৬২৩৩৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৬১-৬৩০০৫ (অ)
খাগড়াছড়ি জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৭১-৬১৭২৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৭১-৬২০৯৫ (অ)
লক্ষ্মীপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩৮১-৫৫৪৬৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৩৮১-৬২২৬৪ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামগতি	০৩৮২৩-৫৬২৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রায়পুর	০৩৮২২-৫৬৪৯১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রামগঞ্জ	০৩৮২৪-৭৫৪৯৫ (অ)
নোয়াখালী জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৩২১-৬১৬৮১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	০৩২১-৬১৬৪৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেগমগঞ্জ	০৩২১-৫২৩২৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোম্পানীগঞ্জ	০৩২২৩-৫৬৩৮৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সেনবাগ	০৩২২৫-৫৬১৯৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হাতিয়া	০৩২২৪-৫৬০৪৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাটখিল	০৩২২২-৭৫০৫৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সুবর্ণচর	০৩২২৮-৫২১৫৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কবিরহাট	০৩২৩২-৫৩২৭৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সোনাইমুড়ি	০৩২২৭-৫১০১৩ (অ)
সিলেট বিভাগ	
উপপরিচালক	০৮২১-৮১০৫৩৩ (অ) ০৮২১-৭২৩০২৭ (বা)
জনাব শঙ্কর রঞ্জন দাশ সহকারী পরিচালক (অ.দা)	০৮২১-৭২৩২৫৭ (অ)
সিলেট জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮২১-৭১৬২৪১ (অ) ০৮২১-৭২১৯৭৮ (বা)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮২১-২৮৭০০৩৫ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বালাগঞ্জ	০৮২২২-৫৬১২২ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোলাপগঞ্জ	০৮২২৭-৫৬৪২৩ (অ)
সি.উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিশ্বনাথ	০৮২২৪-৫৬০৭০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জৈন্তাপুর	০৮২২৯-৫৬০৫৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোয়াইনঘাট	০৮২২৮-৫৬০৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জকিগঞ্জ	০৮২৩২-৫৬০২২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দক্ষিণ সুরমা	০৮২১-২৮৭৮২১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফেঞ্চুগঞ্জ	০৮২২৬-৫৬২৪৩ (অ)

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কানাইঘাট	০৮২৩৩-৫৬১১৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিয়ানীবাজার	০৮২২৩-৫৬০৩৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কোম্পানীগঞ্জ	০৮২২৫-৫৬০৯৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, খাদিমনগর	০৮২১-২৮৭০২২৫ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, গোলাপগঞ্জ	০৮২২৭-৫৬৪২৪ (অ)
সুনামগঞ্জ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৭১-৫৫৪৯০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৭১-৬১৬৬২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দিরাই	০৮৭২৪-৫৬৪৭৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তাহিরপুর	০৮৭৩২-৫৬০১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দোয়ারাবাজার	০৮৭২৬-৫৬০৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শাল্লা	০৮৭২৯-৫৬০৭২ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বিশ্বম্ভরপুর	০৮৭২২-৫৬১২৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জামালগঞ্জ	০৮৭২৮-৫৬১৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ধর্মপাশা	০৮৭২৫-৭৫০৫১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দঃ সুনামগঞ্জ	০৮৭১-৬২৪৭১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ছাতক	০৮৭২৩-৫৬০০৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জগন্নাথপুর	০৮৭২৭-৫৬০৪২ (অ)
হবিগঞ্জ জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৩১-৫২৫৪০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৩১-৬২৩১৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নবীগঞ্জ	০৮৩২৮-৫৬৩০২ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বানিয়াচং	০৮৩২৪-৫৬২১০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আজমিরীগঞ্জ	০৮৩২২-৫৬১১৬(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাহুবল	০৮৩২৩-৫৬০৯০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চুনারুঘাট	০৮৩২৮-৫৬১৯০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মাধবপুর	০৮৩২৭-৫৬১৮১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লাখাই	০৮৩২৬-৫৬০৩৪ (অ)
মৌলভীবাজার জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৮৬১-৫২৮১৩ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৮৬১-৬২৯০৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীমঙ্গল	০৮৬২৬-৭১৪৮০ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজনগর	০৮৬২৫-৭৫৪৯৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুলাউড়া	০৮৬২৪-৫৬৬৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কমলগঞ্জ	০৮৬২৩-৫৬১৪৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জুড়ী	০৮৬২৭-৫৭১৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বড়লেখা	০৮৬২২-৫৬৬১৭ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মৌলভীবাজার সদর	০৯৬১-৫২২৯২ (অ)
বরিশাল বিভাগ	
উপপরিচালক dd.barisal@fisheries.gov.bd	০৪৩১-৬৪৬২৭ (অ) ০৪৩১-২১৭৫২৭৭ (ফ্যা)
জনাব বঙ্কিম চন্দ্র বিশ্বাস সহকারী পরিচালক	০৪৩১-৬৩৪৫২ (অ)
বরিশাল জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৩১-৬৪০১৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৩১-৬২৬০৫ (অ) azizul.haque69@yahoo.com
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আগৈলঝড়া	০৪৩২৩-৫৬২৯৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাকেরগঞ্জ	০৪৩২৮-৭৪২৬৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উজিরপুর	০৪৩২৯-৫৬১৫৩ (অ)

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাবুগঞ্জ	০৪৩২৭-৭৩০৪৩ (অ) sanjibufo@gmail.com
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গৌরনদী	০৪৩২২-৫৬৫৩৬ (অ) ufopronab@yahoo.com
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বানারীপাড়া	০৪৩৩২-৫৬৩৯১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মেহেন্দিগঞ্জ	০৪৩২৫-৫৬১৬৪ (অ) pksdof@yahoo.com
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মুলাদী	০৪৩২৬-৭৫২৩৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হিজলা	০৪৩২৪-৫৬০৪১ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, মেহেন্দিগঞ্জ	০৪৩২৫-৫৬১৬৫ (অ)
ভোলা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৯১-৬২৪০৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৯১-৬২৮৬৭ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চরফ্যাশান	০৪৯২৩-৭৪০৯০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তজুমদ্দীন	০৪৯২৭-৫৬০৪৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দৌলতখান	০৪৯২৪-৫৬১৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বোরহানউদ্দিন	০৪৯২২-৫৬১৫৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, লালমোহন	০৪৯২৫-৭৫৬১৭(অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মনপুরা	০৪৯২৬-৫৬০২১ (অ)
ঝালকাঠি জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৯৮-৬৩২৫৮ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৯৮-৬৩২৫৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাঠালিয়া	০৪৯৫২-৫৬০৬৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, রাজাপুর	০৪৯৫৪-৬৫৩৪০ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নলছিটি	০৪৯৫৩-৭৪০৩৪ (অ)
বরগুনা জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৪৮-৬২৩৯৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৪৮-৬২৩৮১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, আমতলী	০৪৪৫২-৫৬১৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাথরঘাটা	০৪৪৫৫-৭৫২২৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বামনা	০৪৪৫৩-৫৬০৭৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বেতাগী	০৪৪৫৪-৫৬১৪৬ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, বরগুনা সদর	০৪৪৮-৬২৬৮১ (অ)
পটুয়াখালী জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৪১-৬২৫০১ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সদর	০৪৪১-৬২০৯৬ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কলাপাড়া	০৪৪২৫-৫৬৩৬১ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাউফল	০৪৪২২-৫৬১১৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দশমিনা	০৪৪২৩-৫৬১৬৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গলাচিপা	০৪৪২৪-৫৬১৩৩ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মির্জাগঞ্জ	০৪৪২৬-৭৫২৮৫ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, পটুয়াখালী সদর	০৪৪১-৬২৮০৫ (অ)

পিরোজপুর জেলা	
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৬১-৬২৫৯৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সদর	০৪৬১-৬২৬৯৭ (অ)
সি. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মঠবাড়িয়া	০৪৬২৫-৭৫১৮৬ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাজিরপুর	০৪৬২৬-৭৪০৫৮ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাউখালী	০৪৬২৪-৫৬২৪৫ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নেছারাবাদ	০৪৬২৭-৫৬০৪৯ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জিয়ানগর	০৪৬২২-৫৬১৪৪ (অ)
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ভাণ্ডারিয়া	০৪৬২৩-৩৯৭ (অ)
খামার ব্যবস্থাপক, পিরোজপুর সদর	০৪৬১-৬২০৬৩ (অ)
মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	
ড. মোঃ আবদুল ওহাব ডীন, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ	০৯১-৬৭৪২২৬ (অ) wahabma_bau@yahoo.com
ড. জাকির হোসেন প্রধান, ফিসারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ	০৯১-৬৭৪০১-৬ এক্স. ২৯১০ (অ)
ড. মোঃ আলী রেজা ফারুক প্রধান, অ্যাকোয়াকালচার বিভাগ	০৯১-৬৭৪০১-৬ এক্স. ২৯২০ (অ)
ড. শাহরোজ মাহেন হক প্রধান, ফিসারিজ ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	০৯১-৬৭৪০১-৬ এক্স. ২৯৩০ (অ)
ড. মোঃ আবুল মনসুর প্রধান, ফিসারিজ টেকনোলজি বিভাগ	০৯১-৬৭৪০১-৬ এক্স. ২৯৪০ (অ)
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা	
প্রফেসর ড. মোঃ সাইফুদ্দীন শাহ্ ভাইস-চ্যান্সেলর	০৪১-৭২১৩৯৩ (অ) ০৪১-২৮৩০১১১ (বা) prof.m.s.shah@gmail.com
প্রফেসর ড. মোঃ নাজমুল আহসান প্রধান এফএমআরটি ডিসিপ্লিন	০৪১-৭৩২১৫৭ (অ) nazmul_ku@yahoo.com
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী	
ড. সুলতান মাহমুদ সহযোগী অধ্যাপক ও কোর্স কোঅর্ডিনেটর, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ	০৪৪২৭-৫৬০১৪ Ex২৬৭ sultanmahmud77@yahoo.com
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	
ড. মোঃ আখতার হোসেন সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ফিসারিজ বিভাগ	০৭২১-৭৬০৫৪১ (বা) mahfaa@yahoo.com
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	
অধ্যাপক ড. দেওয়ান আলী আহসান চেয়ারম্যান, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ	৯৬৬১৯২০- ৫০ (অ) daahsan@yahoo.com
ড. এম. নিয়ামুল নাসের অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ	৯৬৬১৯২০-৫০ এক্স. ৭৫৯৮ (অ)

সংকলনে

মোহাম্মদ রেজাউল করিম , এ.কে.এম. লুৎফুর রহমান সিদ্দীক

কায়সার মুহাম্মদ মঈনুল হাসান, মোহাম্মদ শরিফুল আজম